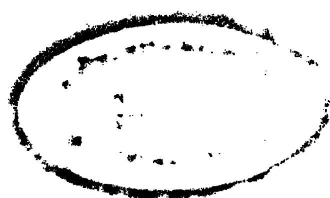


অর্চ্চনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্থ বর্ষ।



সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল্।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।



কলিকাতা

অর্চ্চনা কার্য্যালয়

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন অর্চ্চনা পোষ্ট, হইতে

বঙ্গীয়-সাধনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৫১।২ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহেমচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

[সন ১৩১৪ সাল।]

বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

অর্চ্চনা সম্বন্ধে অভিমত।

ARCHANA—This monthly magazine is always interesting reading and has a large circle of readers. It deals with the topics of the day, and contains articles on various subjects. &c. &c.—*The Indian Daily News.*

ARCHANA—The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. &c. &c.—*Statesman & Friend of India.*

ARCHANA—We are glad to find that the Bengali monthly *Archana* has, within a very short time, been able to secure an assured place among the vernacular periodicals of the country and among the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful and well written. It is interesting reading and bears ample evidence of judicious editing. (Summary of Opinions)—*The Bengalee*

ARCHANA—The get up is very taking and it contains many valuable and interesting articles * * The magazine can be recommended highly to the reading public.—*The Telegraph.*

"অর্চ্চনা সর্ব্বাংশে ভাল হইতেছে"—বঙ্গবাসী।

অর্চ্চনা। এই মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। * * * আমরা এই মাসিকপত্রের উন্নতি কামনা করি।—বসুমতী।

অর্চ্চনা। অর্চ্চনার আলোচনা করিতে আমাদের আনন্দ হয়। অল্প দিনের মধ্যে মাসিক পত্রিকাখানি সাধারণের আদরণীয় হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। * * * আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অর্চ্চনার উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করি। —চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অর্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৩। [১ম সংখ্যা।

শিল্পাগারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

যখন বলি আধুনিক পাশ্চাত্যের অধিবাসিবৃন্দ আপনাদিগের সমুদায় পার্থিব অনুষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে, তখন আমি প্রাচ্যের নিন্দা করি না। প্রাণতত্ত্ব সামান্য পরিমাণে অধ্যয়ন করিলেই ভগবানের সৃষ্টি-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এবং বুদ্ধিমান নর তাহা হইতে আপনাপন ইষ্ট সাধন করিবার নানা উপকরণ আহরণ করিতে পারে। জীব মাত্রেই সাবয়ব; কিন্তু কোনও একটি অবয়ব বা ইন্দ্রিয় জীব নহে বা কেবল সেই একটি অবয়বের কার্য্যের দ্বারাই জীব প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। প্রত্যেক অবয়বেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে এবং একটি ইন্দ্রিয়েরা কার্য্য অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হওয়া দুরূহ। প্রাণী যতই উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করে তাহার অবয়বের বিশেষত্ব ততই পরিলক্ষিত হয়। আবার এই সকল বিভিন্নতা হইতে একটা একতা উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া সমগ্র দেহ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে। একটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি ক্ষীণ হইলেই দেহের পীড়া হয়। সুতরাং সুস্থ দেহের পক্ষে প্রধান আবশ্যক বিভিন্ন যন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং কর্ত্তব্য সাধন।

বলিতেছিলাম আধুনিক পাশ্চাত্যে সকল বিষয়েই এই শিক্ষার সুফল

ফলিয়াছে দেখিতে পাই। কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজনীতি ক্ষেত্রে, কি শিল্প-জগতে, যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য সর্ব্বোত্তম সাধিত হয়, পাশ্চাত্যে সেই অঙ্গের উপর সেই ভার ন্যস্ত হইয়াছে; এবং এই সকল সামাজিক অবয়ব আপনাপন কর্ত্তব্য সাধন করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে জাতীয় দেহ সবল ও কার্য্যক্ষম দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল পাশ্চাত্যে কেন, যখনই যে জাতি মানব সমাজে আধিপত্য করিয়াছে, তখনই সেই জাতির অনুষ্ঠানে প্রাণিতত্ত্বের শিক্ষার সদ্ব্যবহার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যেমন শ্রম বিভাগ ছিল সেরূপ একদিন কোনও দেশে ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণের দ্বারা বাণিজ্য এবং বণিকের দ্বারা সময়ে সময়ে দেবসেবা হইতেছে বলিয়া জাতীয় জীবন ব্যাধিগ্রস্থ দেহ মধ্যে অবস্থিত। আর তাহা না হইবেই বা কেন—কেবল দর্শনেন্দ্রিয়কে যদি দর্শন, স্পর্শণ এবং শ্রবণ কার্য্য করিতে হয়, সমগ্র জাতিই যদি কেবল ওকালতি, চিকিৎসা, কেরাণীগিরি এবং কৃষি কার্য্য করে, তাহা হইলে আর জাতীয় দেহের শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিলম্ব হইবে কেমন করিয়া ?

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রত্যেক বিভাগেই এইরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে উন্নতির আশা দেখি না। শিল্প বিভাগে কিরূপে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিতে হইবে, কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন্ কার্য্যটি সাধিত করিয়া লইতে হইবে, এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে অর্থনীতি বিষয়ক লেখকগণ বলিতেন, মানবের আবশ্যক দ্রব্য উৎপাদন করিবার তিনটি উপকরণ—প্রকৃতি, শ্রম এবং মূল ধন *। কিন্তু প্রকৃতি বদান্য হইলেও বা শ্রমজীবিগণ দক্ষ হইলেও অথবা প্রচুর মূলধন থাকিলেও শিল্পখানার বন্দোবস্ত না থাকিলে সর্ব্বাধিক ধনোৎপত্তির সম্ভাবনা অল্প। তজ্জন্য মারস্যাল্ প্রমুখ অর্থনীতিজ্ঞেরা উপরোক্ত তিনটি অনুকরণ ব্যতীত Industrial organisation বা শিল্পাগারকে সাবয়ব করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার উপকারিতা পুরাতন অর্থনীতিজ্ঞেরা শ্রম, এবং মূল ধনের উন্নতির অধ্যায়ে দেখাইয়াছিলেন। মারস্যাল্ সাহেব সেগুলিকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন মাত্র।

---

* অর্চ্চনা ১ম বর্ষ ১৬৩ পৃঃ।

শ্রম বিভাগ।

যাঁহারা শিল্পজাত বস্তু প্রণয়ন করেন তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য শ্রম বিভাগ করা, অর্থাৎ যে শ্রেণীর শ্রমজীবির হস্তে শিল্পের যে অংশটি ন্যস্ত করা অধিক সুবিধাজনক তাহার দ্বারা সেই কার্য্যটি সাধিত করিয়া লওয়া উচিত। যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কোন্ কোন্ অংশ একজন শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া শিল্পীদিগকে সেইরূপে বিভক্ত করা উচিত। এমন কোনও শিল্পকার্য্য নাই যাহাতে পূর্ব্বাপর দক্ষ কারিগরের আবশ্যক হয়। সুতরাং অধিক বেতনভোগী দক্ষ কারিগরের দ্বারা যদি সমস্ত কার্য্যটি সম্পাদিত করাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। শিল্প-জগতে শ্রম বিভাগের মূল্য অসীম। ইংরাজ অর্থনীতি-গুরু আদম স্মিথ্ সাহেব ইহার নিম্নলিখিত উপকারিতা দেখাইয়াছিলেন—

(ক) প্রত্যেক কারিগরের দক্ষতার বৃদ্ধি।

(খ) ইহাতে এক শ্রেণীর কার্য্য সমাধা করিয়া অপর শ্রেণীর কার্য্য আরম্ভ করিতে শিল্পীগণ সময়ের অপব্যবহার করিতে পারে না।

(গ) ইহা দ্বারা শ্রমলাঘবোপযোগী অনেক কল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত উপকারিতার মধ্যে প্রথমটী অবশ্যম্ভাবী। একই লোক একই কার্য্য উত্তরোত্তর সম্পাদন করিলে তাহার ইন্দ্রিয় সকল সেই কার্য্যে অত্যন্ত অভ্যস্থ হইয়া যায়, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যদি একটি স্বর্ণকারকে সোণা গলাইতে, গলিত ধাতুকে সূক্ষ্ম সূত্রাকারে গঠিত করিতে এবং তাহার বহু রূপান্তর ঘটাইয়া শেষে ইচ্ছিত আকারে অলঙ্কার গঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কার্য্যের পর সে এক একবার বিশ্রাম করিবে, একবার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়কে বিশ্রাম দিবার জন্য ধূমপান করিয়া লইবে বা একবার পরিক্রমণ করিয়া লইয়া তবে আবার দ্বিতীয় কার্য্যটি করিতে বসিবে; একথা বুঝিতে অধিক মেধার আবশ্যক হয় না। অথচ সামান্য সুবর্ণ গলাইবার কার্য্যটি যদি একটি শিক্ষানবিশের দ্বারা করাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দক্ষ শিল্পীর পরিশ্রম অপর শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং শিক্ষানবিশও স্বর্ণ গলাইবার যন্ত্রাদি পরিত্যাগ

করিয়া অপর কার্য্য করিবার যন্ত্রাদি লইবার মধ্যে একবার অবসর লইয়া সময় নষ্ট করিবার সুবিধা পাইতে পারিবে না।

তৃতীয় উপকারিতাটি অবশ্য আংশিক ভাবে সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিলাতের অনেক কারিগর মহা মহা আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন বলিয়া সকল কারিগরই যে এক প্রকারের কার্য্য করিতে করিতে যন্ত্র আবিষ্কার করিবে তাহা নহে। বলা বাহুল্য, শিল্পী ব্যতীত অপর ব্যক্তিও যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া শিল্প-জগতে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন।

উপরোক্তরূপ ব্যতীত শ্রম বিভাগের অপর একটি উপকারিতা আছে। যে সকল ব্যক্তি চক্ষুপীড়াগ্রস্থ, খঞ্জ বা অন্যথা দুর্ব্বলদেহ, তাহারা অনেক শিল্পের অল্প শ্রমসাধ্য সামান্য অংশে নিযুক্ত থকিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বিলাতের সকল কারখানায় প্যাক করিবার জন্য বা ঐরূপ সামান্য কার্য্যের জন্য অল্প বেতনে অনেক ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। অল্পবয়স্ক বালকগণও ইহাতে শিল্পাগারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

শ্রম বিভাগের উপকারিতা সম্বন্ধে আদম স্মিথ সাহেব পিন নির্ম্মাণের শিল্পের উদাহরণ দিয়াছেন। যদি সমস্ত আলপিনটি একটি লোককে নির্ম্মাণ করিতে হইত তাহা হইলে সে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন ২০টি পিন নির্ম্মাণ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই শিল্পটি ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে, তবে ইহার মধ্যে কোনও কোনও কারিগর দুইটি কার্য্য একেলা করে। এক ব্যক্তি তার নির্ম্মাণ করে, অপর একজন তাহাকে সমান করে, তৃতীয় ব্যক্তি সেই তারকে পিনের আকারে কাটে, একজন তারের প্রান্তভাগটি ঘসিয়া সূক্ষ্মাকার করে। পঞ্চম ব্যক্তি অপর প্রান্তটি ঘসিয়া রাখে, মাথার গোল অংশ ২।৩ জন বিভিন্ন কর্ম্মচারীর দ্বারা সৃষ্ট হয়, একজন ইহা পিনের উপর সংযুক্ত করে, তাহার পর পালিস করা, কাগজে গাঁথা প্রভৃতি কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্মিথ সাহেব বলেন, একটি কারখানায় দশজন কারিগরে উপরোক্ত কার্য্যগুলি ভাগ করিয়া লইয়া এক দিনে ৪৮,০০০ এর উপর পিন তৈয়ারি করিতে পারে। অর্থাৎ ঐরূপ সম্মিলিত কার্য্য দ্বারা লোক প্রতি ৪৮০০ পিন প্রত্যহ নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রমবিভাগ করিয়া না লইলে ১০ জন শ্রমজীবি দুই শতের অধিক পিন নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত না।

এইরূপে একটি শিল্পকে যদি নানা অংশে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং প্রত্যেক অংশটি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে এই এক একটি অংশ নির্ম্মাণ করিবার কার্য্য ক্রমে অত্যন্ত সরল হয়। তখন সেই অংশটি সম্পন্ন করিবার জন্য

যন্ত্র ব্যবহার

করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পারিশ্রমিক ব্যয় অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায় এবং অত্যন্ত অল্প মূল্যে দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া জাতীয় ধন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

যন্ত্র অর্থেই বাষ্পীয় যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র নহে। যন্ত্রকে ব্যবহার করিবার জন্য বাষ্প, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, কোন কোন স্থলে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর জল-প্রবাহ বা বায়ুপ্রবাহের সাহায্য লইতে হয়। যে স্থলে মনুষ্যের শারীরিক বলের দ্বারা কল বা যন্ত্র চালাইতে পারা যায় না, তথায় বাষ্প প্রভৃতির প্রয়োজন। যে সকল শিল্পাগারে অধিক পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সে সব স্থলে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

যন্ত্রের সাহায্যে মানবের আবশ্যক বস্তু নির্ম্মাণ করিবার প্রথা কতদূর হিতকর তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পাশ্চাত্যের অজস্র ধনের প্রধান সহায় শিল্প যন্ত্রাদি। যে সকল নরসুহৃৎ পরিশ্রমক্লিষ্ট ক্ষুৎপিপাসাতুর শ্রমজীবিদিগের যন্ত্রণায় অভিভূত হয়েন, তাঁহারাও সন্তুষ্ট চিত্তে দেখিতে পারেন কলের সাহায্য লইয়া কার্য্য করিলে আর মানবকে তাদৃশ শারীরিক যাতনা ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মকারদিগকে বৃহদায়তন মুদ্গর লইয়া নিদাঘের মধ্যাহ্নে অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া কার্য্য করিতে দেখিলে কে না দুঃখ অনুভব করে? পাশ্চাত্যে কিন্তু বড় বড় বাষ্পীয় মুদ্গরে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর রূপে কার্য্য চলিয়াছে। তাই ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছেন, কারখানায় যন্ত্র ব্যবহার বশতঃ শ্রমজীবির দেহ অনেক পরিমাণে শান্তি উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

তাহার পর, যে সকল পদার্থ এক মাপের এক আকারের না হইলে আবশ্যক কার্য্য সম্পাদিত হইবে না, সে সকল পদার্থ নির্ম্মাণে কল ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত সুদক্ষ কর্ম্মকারও সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া একই আয়তনের একই আকারের ঠিক একটির পরিবর্ত্তে

অপরটি ব্যবহার হইতে পারে এমন দুইটি স্ক্রু (Screw) নির্ম্মাণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক অভিন্ন আকারের স্ক্রু দিনের মধ্যে রাশি রাশি নির্ম্মিত হইতেছে। ঘড়ির একটি সূক্ষ্ম অংশ নষ্ট হইয়া গেলে, এখন আমরা অক্লেশে সামান্য ব্যয়ে তাহা সংশোধিত করিয়া লইতে পারি। ইহার কারণ, ঘড়ির প্রত্যেক বিভিন্ন অংশটি একই উপায়ে, একই কলে বহুসংখ্যক নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল সূক্ষ্ম অংশ নির্ম্মাণ যখন কোনও দক্ষ শিল্পির নির্ম্মাণ-কুশলতার উপর নির্ভর করিত তখন সেগুলি কতদূর দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা কল্পনা করা সহজ। পূর্ব্বে সুইজার-লাণ্ডের অধিবাসিগণ ঘড়ি নির্ম্মাণে বড় সুপণ্ডিত ছিল। তাহাদের এবিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতা ছিল। এখন কিন্তু আমেরিকায় কলে ঘড়ি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া এই ব্যবসায় সুইস্‌দিগের হস্ত হইতে আমেরি-কানদিগের হস্তে চলিয়া যাইতেছে। যাহারাই অল্প ব্যয়ে বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, তাহারাই অল্প মূল্যে বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবে এবং শিল্পজাত বস্তুর মূল্য যত স্বল্প হইবে, তাহার বিক্রয়ও সেই পরিমাণে বাড়িবে।

কারিকরদিগের পক্ষ হইতে দেখিলে যন্ত্র ব্যবহারের অপর একটি সুবিধা, অপর একটি উপকারিতা আছে। যে সকল শ্রমজীবি কেবল শিল্পকার্য্যের জন্ত আপনার শারীরিক দক্ষতার উপর নির্ভর করে তাহারা এক কার্য্য ছাড়িয়া অপর কার্য্য করিতে পারে না। যদি কোনও ঘটনা বিপাকে তাহার শিক্ষিত শিল্পের আদর কমিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে অপর ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইয়া উঠে। আমা-দিগের সমাজের কর্ম্মকারকে যদি বস্ত্র বয়ন করিতে হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে কিরূপ বিপদ ঘটে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যদি কর্ম্মকারের কারখানা এবং বস্ত্র-বয়নাগার উভয় স্থলেই কলের ব্যবহার থাকিত তাহা হইলে এক ব্যবসায়ের কর্ম্মচারীকে অপর ব্যবসায় গ্রহণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। সকল বিষয়েরই কল চালিত করা প্রায় একই রকম। বিভিন্ন শিল্পের কলের বিভিন্নতা আছে মাত্র।

বলা বাহুল্য, যে সকল শ্রমজীবি কল কারখানায় কার্য্য করে, অপর শ্রেণীর শ্রমজীবি অপেক্ষা তাহাদের বুদ্ধি প্রখর হয়। কায়িক পরিশ্রম নীরস ও একঘেয়ে, কিন্তু কলে কার্য্য করিলে কার্য্যের কঠোরতাটা কিয়দ্ পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে।

শিল্পকার্য্যে যন্ত্রাদির ব্যবহার কিন্তু সকল শিল্পীই করিতে পারে না। যে সকল শ্রমজীবি একাধারে কায়িক শ্রম করিয়া সামান্য পরিমাণে মূলধন ব্যবহার করিয়া, স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহাদের পক্ষে মূল্যবান যন্ত্রাদি খরিদ বা ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, অস্মদ্দেশের শিল্পিদিগের অবস্থা উক্তরূপ। মূলধনের অভাব আমাদিগের শিল্পী সমাজের উন্নতির সর্ব্ব প্রধান অন্তরায়। যাহার কায়িক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি আছে, তাহার মূলধন নাই এবং যে শ্রেণী ইচ্ছা করিলে ব্যবসায় বাণিজ্যে মূলধন খাটাইতে পারে, সে শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আপনাদিগের পিতৃ সঞ্চিত ধন শিল্প ব্যবসায়ে ব্যবহার করিতে নারাজ। সুতরাং আমাদের শিল্পের আজ এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ অবস্থা এবং আমাদের সমাজের প্রতি কমলার সুদৃষ্টির অভাব।

সে যাহাই হউক, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে প্রবলের হস্তে দুর্ব্বলের বিনাশ। পার্থিব জীবন সংগ্রামে যে জাতি আপনার পরিবেষ্টনীর সাহায্য লইতে সক্ষম হয়, সেই জাতিই প্রাণ ধারণ করিতে পারে। শিল্পজগতেও এই নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে শিল্পী অপর শিল্পী অপেক্ষা অল্প আয়াসে শিল্প-দ্রব্য প্রণয়ন করিতে সক্ষম হয়, সেই শিল্পী অল্প মূল্যে আপন পণ্য বিক্রয় করিয়া অপর শিল্পী অপেক্ষা লাভবান হয়। যদি প্রতিযোগিতা পূর্ণমাত্রায় চলিতে পারে, তাহা হইলে অদক্ষ শিল্পীর উচ্ছেদ অবধি সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যন্ত্র সাহায্যে বস্তু নির্ম্মাণ করিলে, তাহা অত্যন্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করা সম্ভবপর। সুতরাং একই বাজারে যদি কলে প্রস্তুত এবং হস্তনির্ম্মিত একই দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহা হইলে যে হস্তনির্ম্মিত বস্তুর সেস্থলে বিক্রয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প, তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান বাণিজ্য জগতের অবস্থাটা একবার স্থূলভাবে দেখিয়া লইলেও প্রতীয়মান হইবে যে, আধুনিক প্রথা অনুসারে আবশ্যক বস্তু নির্ম্মাণ করিতে না শিখিলে আমাদের শিল্প উচ্ছেদিত হইবে। আর আমাদিগের দীর্ঘকালব্যাপী সুনিদ্রার অবসরে বিদেশী বাণিজ্যের কি এদেশে অত্যধিক প্রাধান্য হইয়া উঠে নাই? অবাধ বাণিজ্যের আশীর্ব্বাদে আমাদিগের বাজারে বিদেশী দ্রব্যেরই অধিক বিক্রয় হইতেছিল। ইহার কারণ বিদেশী পণ্য অল্প মূল্য সুতরাং সাধারণ নীতি অনুসারে ইহার বিক্রয়ও

অধিক হইবার কথা। আজ দুই বৎসর কাল কেবল মনের জোরে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার বাহুল্য ঘটাইয়াছি মাত্র। কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল থাকিতে পারে না, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর অভিমানের বেগটা থাকিতে থাকিতে যদি আমরা বিলাতি উপায়ে সুলভ বস্ত্র উৎপাদন করিতে না পারি, তাহা হইলেই সাধারণ নিয়মানুসারে আবার আমাদের অধোগতির চরম দশা উপস্থিত হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি।

(স্বপ্নাধ্যায়।)

প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর থাকিয়াই আপনাদের সাহিত্যিক জীবন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন। এই জন্যই বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে ধর্ম্মকথার এত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত হওয়াতে অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ও লোকের চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম হইত। এরূপ নীতি সর্ব্বাংশে সুফলপ্রদ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে না। ইহার ফলে বাঙ্গালী কবি যশঃপ্রার্থিগণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের বহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপে সাহসী না হইয়া সকলেই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া চলিয়াছেন। ধর্ম্মকথা গুলিও চর্ব্বিত প্রতিচর্ব্বিত হইতে হইতে অবশেষে একবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন পথে বিচরণের ভাব কাহারো মনে উদিতও হইতে পারে নাই। সাহিত্য জাতীয় জীবনের নিখুঁৎ ফটো। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে বাঙ্গালীর তৎকালীন জাতীয় ভাবের সুস্পষ্ট ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে। চিরদিনের পরাধীনতায় বাঙ্গালীগণের হৃদয় হইতে স্বাধীনতার ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে স্বাধীনতা উদ্দীপক কোন ভাব দৃষ্টিগোচর হইবে কিনা সন্দেহ। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে চক্ষু ফুটিবার অগ্রবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্বাধীনতার বাতাস বহে নাই। দাসত্ব এমনই মারাত্মক ও শোষক পদার্থ!

শারীরিক ও মানসিক বলের অভাব হইলেই মানুষ অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। শারীরিক বলে তেমন না হউক, এক সময়ে বাঙ্গালীরা মানসিক বলে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। হনুমান চরিত্র, কাকের বচন, স্বপ্ন-বিবরণ, ব্রতকথা ইত্যাদি অসংখ্য প্রাচীন প্রসঙ্গ বাঙ্গালীর মানসিক দুর্ব্বলতা হইতেই প্রসূত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'পুরুষ-কারের' পদে পদেই লাঞ্ছনা দেখা যায়। নানা দেবদেবীর স্তব স্তুতিতেই প্রাচীন সাহিত্য একবারে ভরপূর। তাহাতে বাঙ্গালী আত্মনির্ভরতা হারাইয়া ঘোর অদৃষ্টবাদী এবং তাহার ফলে জড়ভরত রূপে পরিণত হইয়াছিল। স্বাবলম্বন-ক্ষমতার অভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক নানা কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন। প্রাচীন কবিগণই প্রধানতঃ এই সকলের জন্য দায়ী। তাঁহারা যেরূপ আদর্শ সাধারণের চক্ষে ধরিয়াছেন, সেরূপ আদর্শেই যে লোক-হৃদয় গঠিত হইবে, বিচিত্র কি?

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পুরুষকারের কিছুমাত্র প্রভাব নাই, তাহা আগেই বলিয়াছি। কুসংস্কার-রূপ-লূতাতন্তুতে বিজড়িত হইয়া মানুষ কত রূপেই অদৃষ্টের দায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে! এক সময়ে আমাদের বাঙ্গালীরও সেই দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনেই বাঙ্গালী হৃদয়ের বল হারাইয়া নানা কুসংস্কারের ও কল্পিত দেবদেবীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারই ফলে 'স্বপ্নের' মত অলীক ঘটনা লইয়াও বাঙ্গালীরা মাথা ঘামাইতে আলস্য বোধ করে নাই। 'স্বপ্নবৃত্তান্তে' সারবত্তা থাকুক বা না থাকুক, এক সময়ে প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু তদ্বিষয়ক বহুল পুস্তক পুস্তিকা প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছিল, দেখা যায়। অদ্য আমরা তদ্রূপ একখানি গ্রন্থেরই পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমাদের কথিত পুঁথিখানির নাম 'স্বপ্নাধ্যায় পুস্তিকা।' ইহাতে স্বপ্নদর্শনের যাবতীয় ফলাফল বিবৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি 'শ্লোক ভাঙ্গিয়া পয়ারে' রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ; সুতরাং উহা যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে বিরচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে নানা জাতির নানারূপ সংস্কার রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে এখানে কোন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

পুঁথিখানি বলরাম দেব নামক জনৈক কবির রচিত। নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্রে তাঁহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়:—

"কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার কৈল বসতি নবগ্রাম।"

কবির বাসস্থান 'নবগ্রাম' চট্টগ্রাম—আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ও তথা হইতে ১ মাইল পশ্চিমবর্ত্তী আধুনিক 'খিলপাড়া' নামক গ্রামের নামান্তর। গ্রাম পত্তন করিবার সময়ে সম্ভবতঃ উহার নাম 'নবগ্রাম' রাখা হইয়াছিল, কিন্তু লোকের নিকট উহা আদৃত না হইয়া 'খিলপাড়া' নামই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সময়ে এই পুঁথিখানি বিরচিত হয়, সম্ভবতঃ সেই কালে গ্রামখানি কাগজে পত্রে 'নবগ্রাম' এবং লোকমুখে 'খিলপাড়া' নামে পরিচিত ছিল। 'খিলা' বা পতিত জমির উপর বসতি স্থাপিত হওয়াতেই উহার নাম 'খিলপাড়া' হইয়া থাকিবে। লোকে বাস্তব ছাড়িয়া কল্পিত স্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হওয়াতেই 'নবগ্রাম' নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রামটি শিক্ষায় দীক্ষায় এখনো নিতান্ত অনুন্নত।

এই কবির বংশ আজও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের বাড়ী অদ্যাপি 'কমলাপাতার বাড়ী' নামে কথিত হইয়া থাকে। উঁহারা এখন 'দে' আখ্যাধারী ও শূদ্র জাতীয়। আমরা শুনিয়াছি, কবি বলরাম তেমন শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং কিছু অধিকারও ছিল। তাহার ফলেই এই পুঁথিখানি বিরচিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে অপরাপর কথা আমরা আজও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১১৭৩ মঘী সনে বা ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে পুঁথিখানি প্রতিলিখিত হইয়াছে; কিন্তু উহা আরো কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনা, সন্দেহ নাই। প্রাচীন তুলট (বাঙ্গালা) কাগজে (৭ × ১৯ অঙ্গুলি পরিমাণ) উহা লিখিত হইয়াছে। ৯টি পত্রে উহা সমাপ্ত ও কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। পুঁথিতে মোট ১৪৫টি পদ বর্ত্তমান।

বিষয়টি অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার পক্ষে এই পুঁথিখানি খুব প্রয়োজনীয় হইবে। ইহার ভাষা ও বিভক্তি প্রভৃতির প্রয়োগ-পদ্ধতি আলোচনার একান্ত যোগ্য। এই জন্য আমরা প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া সমগ্র পুঁথিখানি 'অর্চ্চনায়' প্রকাশিত ও সংরক্ষিত করিলাম। ইহার প্রচার দ্বারা 'সাহিত্য-পরিষদের' উদ্দেশ্য সিদ্ধিরও যে কতকটা সুবিধা হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পুঁথিখানি এই—

(স্বপ্নাধ্যায় পুস্তিকা ।)

নমো গণেশায় । অভেদ শিব রাম দুর্গা ।

তোহ্মা হোতে অমৃত বাণী শুনিএ শ্রবণে ।
স্বপনের অথেক কথা শুনি তোহ্মার স্থানে ॥
তোহ্মা হোতে লোক সব হএ অভ্যাহতি ।
স্বপনে উদ্ধারিআ মোরে বোল পশুপতি ॥
কৈলাশের নাথে বোলে শুনহ ভবানি ।
কহিমু স্বপ্নের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
মন দিআ শুন কহি স্বপন বিবরণ ।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীবন মরণ ॥
গৌরবর্ণ বিপ্র যদি শাণ্ডিল্য গোত্র হএ ।
গুরুর সমীপে স্বপন কহিব নিশ্চএ ॥
মোহ হই দুই জন দণ্ডেক রহিব ।
উর্দ্ধমুখী হইআ তবে বীজ উচ্চারিব ॥
রাত্রিতে না কৈব স্বপন হস্ত না নাড়িব ।
প্রভাতে কহিলে স্বপন সত্বরে ভাবিব ॥
প্রথম যামিনী যদি দেখএ স্বপন ।
বৎসরেত ফল হএ শুন বিবরণ ॥
এক প্রহর থাকিতে যদি দেখএ স্বপন ।
দশ দিনে ফল হএ শুন দিআ মন ॥
তপন উদয়ে যদি দেখএ স্বপন ।
দশ দিনে ফল হএ শুন দিআ মন ॥
হিমালয়-নন্দিনী বোলে অখিলের নাথ ।
অপূর্ব্ব কাহিনী কথা শুনিলাম তোহ্মাত ॥
তোহ্মার সৃজন প্রভু সকল সংসার ।
তোহ্মার বাক্য মিথ্যা নহে চারি বেদ সার ॥
ভালো উপদেশ প্রভু কৈলা মোর তরে ।
হেন বাক্য না শুনিছি সংসার ভিতরে ॥

অরণ্যের মধ্যে যদি জাএ কোন জন।
সেই ঘন মধ্যে যদি দেখএ স্বপন ॥
গুরু ব্রাহ্মণ যদি না মিলে সেই স্থানে।
স্বপন কথা নিবেদিব কাহার জে বিদ্যমান ॥
স্বপন দেখিআ যদি না কহে কার ঠাই।
সেই স্বপন বিফল হএ কহিছেন গোসাঞি ॥
জেই জনে বীজ উচ্চারিতে নহি পারে।
তাহার উপায় প্রভু কহর্ত আহ্মারে ॥
হেন যদি জিজ্ঞাসিলা দেবী মহামায়া।
শিবে বোলে শুন কহি দেবি স্বয়ঁ। (?) ॥
স্বপন বিবরণ কথা শুন আহ্মা স্থানে।
হরি ২ স্মরি কৈব অশ্বথ বিদ্যমানে ॥
অশ্বথ জে বিষ্ণু´ (বৃক্ষ) জান সাক্ষাতে নারায়ণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জান অশ্বথ বৈসন ॥
তুলসী জে অমলকী অশ্বথ শ্রীফল।
এই চারি বিষ্ণু´ জান সাক্ষাতে দামোদর ॥
এই চারি বিষ্ণু´ সেবা করে জেই জন।
কদাচিত তাহারে আপদে না লংঘিব (?) ॥
এই চারি বিষ্ণু´ যদি করে নমস্কার।
সূর্য্য'সুত সনে দায় নাহিক তাহার ॥
এই চারি বিষ্ণু´ জান সাক্ষাতে নারায়ণ।
এক মনে সেবিলে জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
এই চারি বিষ্ণু´ পাইলে স্বপ্ন সমর্পিব।
বিষ্ণু স্থানে কৈল হেন মনেতে ভাবিব ॥
এই চারি বিষ্ণু´ যদি না পাএ দরশন।
জলে সমর্পিব স্বপন বোলি নারায়ণ ॥
বীজ উচ্চারিতে না পারে জেই জন।
স্বপন দেখি করিবেক হরির কীর্ত্তন ॥
কুস্বপন দেখিলে তবে স্বপন হইব।
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব ॥

হর গৌরীর পদেতে করিআ নমস্কার।
শোলক ভাঙ্গি বলরাম রচিল পআর॥

জরাযুক্ত দন্ত হীন হএ জেই জন।
শ্লেষ পড়ে মুক্ত কেশ ব্যাধিযুক্ত জন॥
স্বপন দেখি নিদ্রা জাএ হইআ বিবসন।
সেই স্বপন ফল নাহি শুন দিআ মন॥
কামাতুর হইআ যদি করে রস কেলি।
দিবাতে জে স্বপন দেখে তাহা নহি গণি॥
তবে পঞ্চ শত বীজ উচ্চারিতে পারে।
তবে কিছু ফল হৈব কহিল তোহ্মারে॥
কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ যদি স্বপনে দেখা জাএ।
মাসেকে মরণ তার কহিল তোহ্মাএ॥
সুবর্ণের ছত্র যদি মাথে দিআ জাএ।
নৃপতি হইব সেই কহিল তোহ্মাএ॥
রজতের ছত্র ধরিআ জাএ শিরে।
রাজপুত্র হইআ সেই বঞ্চে চিরকাল॥
পুষ্পছত্র ধরিলে হএ গ্রাম অধিকার।
স্ত্রীএ দেখিলে পৈরে বস্ত্র অলঙ্কার॥
রাজপক্ষী কুহরে স্বপ্নে যদি পড়ে।
কিবা মাতা কিবা পিতা কিবা ভ্রাতি * মরে॥
ভগ্ন শিব লিঙ্গ যদি স্বপনে দেখা পাএ।
নিজ দেহ ছাড়ি কিবা পুত্র মরি জাএ॥
পুষ্পযুক্ত পুনিমা (প্রতিমা ?) যদি দেখে বিদ্যাধর।
গুরু পিতা আলিঙ্গিল রাজপুত্র বর॥
মৃদঙ্গ বীণা বাঁশী পূরে জেই জন।
সুখে বঞ্চে ভবে কীর্ত্তি না জাএ খণ্ডন॥
অশ্ব গজ নিশাচর সঙ্গে দেখা পাএ।
বৃষ শিবা সঙ্গে দেখা শত্রু হানি হএ॥

---

* ভ্রাতি—ভ্রাতা।

শুকে কাকে হানাহানি বাসা ছাড়ি জাএ।
এই স্বপন দেখিলে পুত্র হইবো নিশ্চএ ॥
বন অগ্নি দহিতে জে গৃহ দহি জাএ।
মিত্র সঙ্গে অরিভাব হইবো নিশ্চএ ॥
গৃহ দ্বারে পর্ব্বতেতে দেখে হুতাশন।
রাজবিঘ্ন পাএ কিবা বিদেশে গমন ॥
মাণিক্য রতন যদি স্বপনেতে দেখএ।
বহুল সম্পদ তার অচিরাত্‌ হএ ॥
আপনার অঙ্গ দহে ছিন্ন হএ কেশ।
ওষ্ঠ (উষ্ট্র ?) পৃষ্ঠে আরোহণ যম পরবেশ (?) ॥
সূর্য্য উদয়ে যদি ওষ্ঠে (উষ্ট্রে ?) আরোহণ।
তিন মাসে মরিব সেই না জাএ খণ্ডন ॥
শুক্ল আঁখি শুক্ল বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন।
সুন্দর যুবতী যদি করে আলিঙ্গন ॥
নারীএ দেখিলে হএ লক্ষ্মীর সমান।
পুরুষে দেখিলে পাএ রাজ সম্মান ॥

ক্রমশঃ।

সেখ আবদুল করিম।

খালি বাড়ী।

(১)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গদেশে কয়েকখানি গ্রাম দুর্ভিক্ষের কবলে ও কলেরার করাল গ্রাসে জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল। লোকের পেটে অন্ন ছিল না, অর্থ দিয়াও আহার্য্য সঞ্চয় দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ধনী নির্ধন সকলেই প্রায় সমদশাপন্ন হইয়াছিল। ক্ষুন্নিবারণার্থ অনেকে গাছের পাতা, ঘাস প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াছিল, অসমর্থগণ উদ্বন্ধনে, বিষপানে তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটাইয়াছিল। যাহারা মনুষ্যের অখাদ্য খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবার একটু আশাও রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলেরার করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে শ্রীনগরের অবস্থা ভীষণতম হইয়া উঠিয়াছিল। শ্মশানের সহিত তুলনা করিলে মনে হইত শ্রীনগর অপেক্ষা শ্মশানের শ্রী আছে। মুমূর্ষুর কাতরোক্তি প্রতি গৃহ হইতে শ্রুত হইত। মৃতের সৎকার করিবার লোক ছিল না, প্রতি গৃহ শবে পূর্ণ ছিল। প্রায় প্রতি গৃহে শকুনী গৃধিনী কাক অবাধে গতায়াত করিত। শৃগাল কুকুরে মৃত দেহের অংশ লইয়া প্রকাশ্য পথে গমনাগমন করিত। মুমূর্ষুর ও মৃতের চক্ষু উৎপাটন—মৃত দেহ ভক্ষণ প্রভৃতি অতি ভয়াবহ কার্য্য দিবারাত্র সংঘটিত হইত। গ্রামখানি প্রায় মনুষ্য বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

গ্রামের অবশিষ্ট জন সাধারণ যাহারা দুর্ভিক্ষ ও কলেরার হস্ত হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারা তাহাদের কঙ্কালসার জীর্ণ দেহটী লইয়া গ্রামান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

শ্রীনগরের জমিদারগণ বহুদিনের পুরাতন বংশ। ঐ বংশের বরদাকান্ত রায় অতি লোকপ্রিয় জমিদার ছিলেন। যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকিলে মনুষ্য পদবাচ্য হওয়া যায়—বরদাকান্তের তাহার মধ্যে কোনটীরই অভাব ছিল না। দেশের দুরবস্থায় কোন প্রকার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হওয়া বিধেয় বিবেচনা করিলেন এবং দেশের অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কাছে রিলিফের (Relief)এর জন্য আবেদন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। ৫০০ পাঁচ শত মণ চাউল অবিলম্বে শ্রীনগরে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং তৎকালীন বিখ্যাত ডাক্তার বীরেন্দ্রবাবুকে শ্রীনগরে পাঠাইলেন।

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চাউল আসিতেছে, এই কথা নিমেষ মধ্যে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক শ্রীনগরাভিমুখে আসিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে কঙ্কালসার শত সহস্র ব্যক্তি শ্রীনগরে আসিয়া পড়িলে যেন শ্রীনগরের কতকটা শ্রী ফিরিয়া আসিল!

(২)

প্রাতঃকালে বরদাকান্তবাবু উঠিয়া চাউল ও পয়সা বিতরণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখে একখানি পাল্কী আসিয়া দাঁড়াইল এবং তন্মধ্য হইতে একটী ভদ্রলোক অবতরণ করিয়া বরদাকান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় বল্‌তে পারেন কি এখানকার জমিদার বরদাকান্তবাবুর বাটী কোথা?"

বরদাবাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বসাইলেন এবং নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি কে, কি উদ্দেশে এবং কোথা হইতে আসিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোকটী একখানি পত্র বরদাকান্ত বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রে লেখা ছিল, "শ্রীনগরে বড়ই কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র পাঠ তথায় গমন করিবেন। আপনার গমন করার বিষয় তত্রত্য জমিদার বরদাকান্ত বাবুকে জ্ঞাপন করা হইল।" এবং বিনম্রস্বরে বরদাকান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন পত্র পান নাই?" অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বরদাকান্তবাবু কহিলেন, গবর্ণমেণ্টের পত্র আমার নিকট কিরূপে আসিবে। এখানকার পোষ্ট মাষ্টার কলেরার কবলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, পোষ্ট পিওন পেটের জ্বালায় দেশ ছাড়া হইয়াছে—পত্র লিখিলেই বা কেমন করিয়া পাইব। "আমার নিজের সংসারও ছারখার হইয়াছে—জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত, কনিষ্ঠ পুত্র ও পরিবারকে আমার শ্বশুর বাটীতে প্রেরণ করিয়াছি।

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আপনিও দিন কতকের জন্য গ্রামান্তরে যান নাই কেন?" বরদাকান্তবাবু বলিলেন, "আমার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া গিয়াছে। আমি গ্রামান্তরে গিয়া কি করিব! এখন ইহারাই আমার পুত্র।" এই বলিয়া সমস্ত দরিদ্র প্রজাবর্গের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন এবং কথায় কথায় ঐ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিলেন; "ডাক্তারবাবু আপনি পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, চলুন বিশ্রাম করিবেন, পরে, অবসর মত আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—তা বেশ, আমার জন্য একটা বাড়ী দেখে দিন। আমার জিনিষ পত্র সমস্তই আমার চাকরে লইয়া যাইবে। বরদাকান্তবাবু উৎকণ্ঠায় কহিলেন, "সে কি মশাই, আপনি যখন দয়া করে এসেছেন আপনি আমার বাড়ীতেই অবস্থিতি করুন।"

ডাক্তার বাবু কহিলেন—"মহাশয় ঐটা মাপ করুন। আমরা গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ী এখানে এসেছি, এখানে আগমনের দরুণ গবর্ণমেণ্ট হইতে একটা ভাতা (Allowance) পাইব—" জমিদার বাবু বলিলেন, "সে কি হয় মশাই; এখানে ভদ্রলোকের বাস উপযোগী বাড়ী কই, আপনি আমার বাড়ীতেই অবস্থিতি করুন।" ডাক্তার বাবু অনন্যোপায় হইয়া

কহিলেন, "আমি আপনার বাড়ী থাকিলে হয়ত আমার চাকুরীটীও যেতে পারে।" সুতরাং বরদাকান্তবাবু আর জেদাজেদি না করিয়া বলিলেন "যখন নিতান্তই আপনার থাকিবার উপায় নাই তখন আর কি বল্‌ব বলুন—চলুন আমি আপনার জন্য একটী বাড়ী দেখে দিই।"

গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সহিত বরদাকান্তবাবু ডাক্তার বাবুকে বাড়ী দেখাইতে চলিলেন। সারি সারি খড়ের ঘর কোথাও একটী ভাঙ্গা মন্দির, কোনস্থানে একটা অতিজীর্ণ প্রাচীর, কোথাও বা একটী ছোট ডোবা—এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গ্রামের দক্ষিণপ্রান্ত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পাঠক পাঠিকা! আপনারা কল্পনায় একটী পল্লীগ্রামের কথা মনে করুন তাহা হইলে গ্রামখানির চিত্র সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

(৩)

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তভাগে তিনখানি বাটী আছে। বরদাকান্তবাবু বলিলেন "সুবিধা মত বাড়ী ত দেখ্‌তে পাই না; আপনি আমার বাড়ীতেই থাকেন সেইটাই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। ঐ তিনখানি বাড়ী খালি আছে বটে কিন্তু শুনা যায় উহার শেষের খানিতে ভূতের ভয় আছে—সেই জন্য উহার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী দুইটীতেও যে আপনি থাকেন তাহা আমাদের আদৌ অভিপ্রেত নহে।" ডাক্তার বাবু বিলাত প্রত্যাগত। ভূতের অস্তিত্বে তাহার আদৌ বিশ্বাস নাই। তাঁহার বিশ্বাস ও সব কিছুই নহে, মাত্র মনের ভ্রান্তি, অথবা দুষ্ট লোকের দুষ্টামি। তাঁহার ভূত দেখিবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইল এবং তিনি ত্রস্তে বলিলেন "আমি ঐ শেষের ভূতের বাড়ীতেই বাস করিব।" অমনি পাঁচ ছয় জন সমস্বরে তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন "সে কি মহাশয়! বিদেশে এসে কি প্রাণ খোয়াবেন, ও বাড়ীতে কেহ তিষ্ঠুতে পারে না ও বাড়ীতে থাকা হতেই পারে না।" ইত্যাদি। সকলে যতই প্রতিবাদ করিতে লাগিল, ডাক্তার বাবুর জেদ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের লোকের কথায় তাঁহার মত বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তি কি করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, পরন্তু ভূতের অস্তিত্বে তাঁহার আদৌ আস্থা নাই। তিনি ভূত দেখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে, বরদাকান্তবাবু বলিলেন "মহাশয়, আমি বৃদ্ধ, আমার কথা শুনুন, আপনি ও বাড়ীতে যাবেন না, ও বাড়ীতে যে গিয়েছে সে আর জীবন্তে ফেরে নাই—এমন কি ঐ বাটীর ভূতের দৌরাত্ম্যে পার্শ্ববর্ত্তী

দুইটী বাটীর অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র রহিয়াছে।” ডাক্তার বাবু কহিলেন—“আপনি শিক্ষিত লোক, আপনিও ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে আমার যথেষ্ট সম্মান করা উচিত তাহা বুঝি, কিন্তু মহাশয় আমি এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি যে কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।”

অনুরোধ বৃথা দেখিয়া সকলেই নিরস্ত হইলেন, এবং পর দিন প্রাতে ডাক্তার বাবুর মৃতদেহ দেখিতে হইবে বলিয়া বিমর্ষ হইলেন। বরদাকান্তবাবু অনন্যোপায় হইয়া তিন জন ভৃত্যকে ডাক্তার বাবুর দুইটী ভৃত্যের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া ডাক্তার বাবুকে স্নানাহার করিবার জন্য সমভিব্যহারে লইয়া গেলেন।

(৪)

আহারাদি ও বিশ্রামের পর ডাক্তারবাবু ও গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটী প্রাচীন হইলেও আধুনিকের মত। বাড়ীটি দ্বিতল। প্রবেশ করিবার ফটক পার হইলেই দক্ষিণ পার্শ্ব ও বামপার্শ্ব দুই ধারে দুইখানি বড় বড় ঘর। সেই দুইখানি ঘরের উপরে একটী হল্। এই হল ও দুইখানি ঘর লইয়াই বৈঠকখানা বাড়ী। বৈঠকখানা বাড়ী হইতে অন্দরের মধ্যে যাইতে হইলে মধ্যে একটী প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই প্রাঙ্গনে নানাপ্রকার ফুলের গাছ ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এখন জঙ্গলে পূর্ণ। অন্দরটীও দ্বিতল বাড়ী; নিম্নে চারি খানি ঘর, ইহার মধ্যে বোধ হয় একখানি রন্ধনগৃহ, একখানি ভোজনাগার, একখানি ভাণ্ডার গৃহ ও অপরখানি দাসীদিগের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই চারিখানি ঘরের পার্শ্বেই খিড়কীর দরজা। খিড়কীর দরজা সংলগ্ন একটী প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ছিল। বাগানের মধ্যস্থলের ডোবা পানা ও জঙ্গলে পূর্ণ এবং একটী ভগ্নপ্রায় বাঁধান ঘাট ছিল এবং বাগানের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল কদলী, লিচু প্রভৃতি নানাপ্রকার গাছ তখনও বর্ত্তমান থাকিয়া নিজের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

ডাক্তার বাবু ভৃত্যদিগকে ঐ গৃহদ্বয় ও তাহার উপরের হলটী পরিস্কৃত ও সুসজ্জিত করিতে বলিলেন। ডাক্তার মহাশয় নিম্নের ঘর দুইটীর মধ্যে

একখানিতে রোগী দেখিবার ও অন্য খানিতে ভৃত্যগণের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং স্বয়ং উপরের হলঘরখানি অধিকার করিবেন বাসনা করিলেন।

বরদাকান্তবাবু ডাক্তার বাবুর ব্যবহারের জন্য দুইখানি টেবিল, ছয়খানি চেয়ার, দুইটা আলমারি প্রভৃতি কয়েক প্রকার আসবাব প্রেরণ করিলেন, বলা বাহুল্য, সেগুলি হলঘরে এবং নিম্নে দেখিবার ঘরে যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ডাক্তারবাবু, বরদাকান্তবাবু প্রভৃতি সকলে সেই বাটীতে গমন করিলেন। দেখিলেন উপরের হলঘরটী বেশ সুসজ্জিত রহিয়াছে। ঘরের মেজেয় সুন্দর কারপেট বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর একধারে সারি সারি ছয়টী বালিস, একটী আলবোলা ও দুইটী বাঁধা হুকা, অন্যধারে জমিদার বাবু প্রেরিত টেবিলটী, দুইখানি চেয়ার ও দুইটী আলমারি। আলমারির উপরের দুইটী সেল্‌ফে খানকয়েক ডাক্তারি পুস্তক ও নিম্নস্তরে ঔষধাদি। এত অল্প সময়ের মধ্যে গৃহটী এরূপ সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছে দেখিয়া ডাক্তার বাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বরদাকান্তবাবুকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে বরদাকান্তবাবু বলিলেন, "আমি এ সমস্ত আসবাবের মধ্যে কেবলমাত্র একটী আলমারি আমার দেখিতেছি— এই কার্পেট, চেয়ার, ইজি চেয়ার, টেবিল, হুঁকা প্রভৃতি কিছুই ত আমার নহে! এগুলো কোথা হ'তে এল!" ডাক্তারবাবু কহিলেন,—"মহাশয় আপনারা বড়ই স্নায়বিক দুর্ব্বল, আপনাদের আদৌ মানসিক বল নাই; অগ্রে ব্যাপারটা ভাল করে দেখুন তারপর যা হউক একটা অভিমত ব্যক্ত করবেন। এই আসবাবগুলি আপনার না হইলে কোথা হইতে আসিবে? আমার বিশ্বাস আপনার ভৃত্যেরা আপনার অজ্ঞাতে আপনার বাটী হইতেই ঐগুলি নিয়ে এসেছে।"

বরদাকান্তবাবু বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া স্বীয় ভৃত্যগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার বাটী হইতে কোন আসবাব আনিয়াছে কি না! ভৃত্যগণ সকলেই বলিল যে তিনি যে সমস্ত জিনিষ লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কেহ অপর কোন জিনিষ আনে নাই।

ডাক্তারবাবু কিন্তু কোন প্রকারেই বরদাকান্ত বাবুর ও তাঁহার ভৃত্যগণের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন আমাকে ভয় প্রদর্শন করাই

জমিদার বাবুর উদ্দেশ্য। এই ভাবিয়া ডাক্তারবাবু সন্তুষ্ট না হইয়া স্বীয় ভৃত্য "জগুয়া" ও "কিষণ"কে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারাও যাহা বলিল তাহা কেবল জমিদার বাবুর ভৃত্যগণের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। ডাক্তারবাবু মনে মনে বরদাকান্তবাবু ও ভৃত্যগণের উপর বিরক্ত হইলেন।

এত প্রমাণের উপরও ডাক্তারবাবুকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বরদাকান্তবাবু প্রভৃতি কেহ আর অন্য কোন অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না এবং বিদায় লইবার সময় ডাক্তারবাবুকে বলিলেন—"আপনার যখন আমাদের কথায় আদৌ বিশ্বাস হইল না তখন আর আপনাকে বৃথা অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি না; আমাদের দৃঢ় ধারণা, এ বাটীতে উপদ্রব আছে। কিন্তু আমাদেরই যদি ভুল হইয়া থাকে, আপনার বিশ্বাসমত ইহা বাস্তবিকই যদি ও সব কিছু না হইয়া বদমায়েসের কৌশল হয়—তা' হলে আপনি আত্মরক্ষার্থ এই Revolverটী নিতে রাজী আছেন কি?" ডাক্তারবাবু এই যুক্তিপূর্ণ কথায় স্বীকৃত হইলেন। বরদাকান্তবাবু তাঁহার সাতনলা রিভলভর Revolverটী ডাক্তার বাবুর হাতে দিলেন ও বলিলেন, যদি রাত্রে আপনি বিপদ উপস্থিত মনে করেন তবে ঘরের উত্তরের জানালা খুলিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুকের তিনটী আওয়াজ করিবেন। আমরা লোকজন ঠিক করিয়া রাখিব, ঐ শব্দ শুনিলে তাহারা সকলে আপনার সাহায্যার্থ আসিবে।"

ডাক্তারবাবু তথাস্তু বলিয়া নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

শিল্পিজাতিদিগের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

অস্মদ্দেশে জাতীয় অবনতির সহিত শিল্পজীবি জাতিদিগের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে, স্থিরচিত্তে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে ভাবুক মাত্রেরই হৃদয় শোকাভিভূত হয়। একটা উদাহরণ লইলেই আমাদের অধঃপতনের মাত্রাটা পরিমাণ করা যায়। ইংলণ্ডে নিউক্যাস্‌ল নামে একটি বিখ্যাত স্থান আছে। সেখানে বিস্তর কয়লার খনি আছে। সেই সকল খনি

হইতে প্রতি বৎসর কোটী কোটী মণ কয়লা বাহির করা হয়। সেই কারণে নিউক্যাস্‌লে কয়লা আমদানি করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। ইংরাজি ভাষায়, "নিউক্যাস্‌লে কয়লা লইয়া যাওয়া" বলিলে সকলেই বুঝেন যে, যেস্থানে কোন একটী বিষয়ের অভাব নাই সেই স্থানে সেই বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কেহ ভাষাতত্ত্ববিদকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে যায় তাহা হইলে ইংরাজিতে বলিবে, "কার্য্যটি যেন নিউক্যাস্‌লে কয়লা লইয়া যাওয়ার মত হইল"। ইংরাজিতে "নিউক্যাস্‌লে কয়লা লইয়া যাওয়া," যেমন একটি প্রবাদ বাক্য, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুরূপ একটি প্রবাদ বাক্য বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। বঙ্গভাষায় এই প্রবাদ বাক্যটি কর্ম্মকার জাতির শিল্প প্রাধান্য জ্ঞাপক। যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই প্রবাদ বাক্যটি বাঙ্গালির মুখে মুখে উচ্চারিত হইবে। এই প্রবাদ বাক্যটি শুদ্ধ ভাষায় বলিতে গেলে, "কর্ম্মকারের বাটিতে সূচিকা বিক্রয়" ও চলিত ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, "কামার বাড়ী ছুঁচ বেচা"।

বাস্তবিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কর্ম্মকারগণ এককালে শিল্পবিদ্যায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে পুরাতন গ্রন্থসমূহে রাজশিল্পি ও দেবশিল্পি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। লৌহ ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে এদেশে কর্ম্মকারদিগের সমকক্ষ কেহ ছিল না। যে কোন ধাতুর উপর স্থূল ও সূক্ষ্ম শিল্পের গুণপনা অঙ্কিত করিয়া এক সময়ে কর্ম্মকারগণ এদেশে স্বজাতির ও স্বশ্রেণীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেন। নিত্য ব্যবহার্য্য ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য সকলকেই কর্ম্মকারদিগের শরণাপন্ন হইতে হইত। সেই কারণে সকল কর্ম্মকারই জাতীয় শিল্প শিক্ষা করিতেন এবং তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখে ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সেই সামান্য সূচিকার জন্য শিল্পরাজ্যের রাজা কর্ম্মকারকে বিদেশীর নিকট যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইতে হইতেছে। তন্তুবায় প্রভৃতি অন্যান্য জাতির ন্যায় কর্ম্মকারগণ শিল্পজগতে যে হীন হইয়া পড়িয়াছেন তাহার আর সংশয় নাই। তাঁহাদিগের জাতিগত প্রবাদ বাক্যটি যাহা এক সময়ে তাঁহাদিগের প্রশংসার পরিচায়ক ছিল, আজ তাহা জনসমাজে তাঁহাদিগের ললাটে কলঙ্কের ছাপ দিয়া স্বজাতির অবনতির ঘোষণা করিতেছে। যাহা এককালে

কর্ম্মকারদিগের যশোগীতি ছিল তাহা এক্ষণে তাঁহাদিগের পক্ষে বিদ্রূপোক্তি হইয়াছে।

কর্ম্মকার, তন্তুবায়, কাংসবণিক প্রভৃতি শিল্পিজাতিদিগের স্ব স্ব জাতিগত শিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতি। ইংলণ্ড, ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বাষ্পীয় কলের সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি অতি অল্প সময়ে ও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। সেই সকল দ্রব্য এদেশে আমদানি হইয়া হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া এদেশের শিল্পজাতের উচ্ছেদ করিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতিই যদি আমাদিগের স্বদেশীয় শিল্পের অবনতির কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদিগের শিল্পিশ্রেণী সমূহের মধ্যে যদি বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি করা যায় তদ্দ্বারা এদেশের মৃত শিল্প পুনরায় সজীব হইবে কি না। নিশ্চয়ই হইবে। আমরা এতদিন গল্পে, মুদ্রিত-চক্ষু পথিকের ন্যায় পথপার্শ্বে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রার প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া জাতীয় জীবনের দুর্গম পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আজ স্বদেশী আন্দোলনে আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের দুন্দুভিধ্বনি আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আহ্বান করিতেছে। এ মহেন্দ্র সুযোগ যদি আমরা পরিত্যাগ করি তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লোপ হইবার বহু পূর্ব্বেই বঙ্গীয় শিল্পিগণের ক্ষীণ জীবনের অবসান হইবে।

প্রস্তাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে হয়ত কেহ বলিবেন যে বঙ্গদেশীয় শিল্পিজাতিদিগের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইবে, একথা বলিলে সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সমগ্র বাঙ্গালি জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা হউক কিন্তু বাঙ্গালী শিল্পিজাতিদিগের মধ্যে বংশগত শিল্পনৈপুণ্য থাকাতে তাঁহাদিগের দ্বারা যত সহজে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইবে তত সহজে অপরাপর শ্রেণীর দ্বারা হইবে না। বর্ত্তমান শিল্পযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যযুবকগণ জাপান, আমেরিকা, জারমানি ও ইংলণ্ডে যাইয়া বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা বড় বেশী যে উপকার হইবে তাহা বোধ হয় না। বিলাতী বস্ত্র পরিহার করিয়া দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞায় স্বদেশহিতৈষিগণ আবদ্ধ হওয়া অবধি তন্তুবায় শ্রেণীর দ্বারা আমরা যেরূপ

অল্প সময়ের মধ্যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি অন্যান্য শ্রেণীর সখের বস্ত্রবয়নকারীদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলে আমরা আমাদিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কিছুতেই সক্ষম হইতাম না। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জাতীয় অভ্যুত্থান কালে যে কোন দিকে জাতীয় অভাব দৃষ্ট হয় সেই দিকে সকল শ্রেণীর উৎসাহ, উদ্যম, যত্ন, শিক্ষা ও সাহায্য বিস্তার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন আমরা দেখিতেছি যে, আমাদিগের মধ্যে লক্ষ লক্ষ আজন্ম শিল্পী রহিয়াছেন তখন তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলে প্রস্তুত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রন্ধন আরম্ভ করার মত কার্য্য করা হইবে। যদি আমরা বিদেশে কয়েকজন নিপুণ শিল্পী প্রেরণ করি তাহা হইলে তাঁহারা অল্পায়াসে অনেক অধিক শিল্পজ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে পারেন। রুষ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বাহির হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে, প্রখ্যাতনামা অনেক জাপানী বীর আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ছদ্মবেশে গমন করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের রণকৌশল, ব্যূহরচনা, দুর্গ, যুদ্ধের জাহাজের কল ও কামান নির্ম্মাণের গূঢ়তত্ত্ব সকল গোপনে শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। একজন জাপানী এড্‌মিরাল্ সামান্য ভৃত্যের কার্য্যে কোন মার্কিন যুদ্ধের জাহাজে কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন প্রকাশ পাওয়াতে, মার্কিন জাহাজে অতঃপর কোন জাপানী ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, এই নিয়ম মার্কিনেরা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষানবিশদিগকে এখান হইতে বিদেশে প্রেরণ করিলে যৎসামান্য ফল পাওয়া যাইবে। তাঁহারা যদি বিদেশে গমন করিবার পূর্ব্বে স্বদেশে অবস্থান করিয়া স্বজাতির শিল্পশিক্ষকদিগের নিকট শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন ও তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করেন তাহা হইলে উভয়েরই বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ হইবে।

বঙ্গদেশের শিল্পিজাতিদিগের এক বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। গত ১৯০০ সালের লোক গণনার সময়াবধি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীই স্ব স্ব শ্রেণীর গৌরব বৃদ্ধির জন্যই হউক কিম্বা অপরাপর শ্রেণীকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিবার উদ্দেশ্যেই হউক ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া অনেকে সময়, অর্থ ও উদ্যম

নষ্ট করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এবিষয়ে বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণীর কার্য্যকলাপ অনেকগুলি শিল্পিজাতির মধ্যে অনুকরণীয় বলিয়া গৃহ হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, জাতীয় উৎসাহ এরূপ সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া বড়ই আক্ষেপের বিষয়। "লোকে যারে বড় বলে সেই বড় হয়"। এই অমূল্য বাক্যটি আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের হিন্দুদিগের নিকট বাঙ্গালীরা অপদার্থ বলিয়া বিদিত। আমাদিগের এক্ষণে কর্ত্তব্য যে যাহাতে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় লাভ করিয়া জনসমাজে সম্মানার্হ হইতে পারি। বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গবাসীরা যে সুমহৎ দৃষ্টান্ত ভারতের সকল জাতির সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন সে দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। এখন যদি আমরা পুনরায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ি তাহা হইলে আর আমরা কোনকালে মস্তকোত্তোলন করিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন, "রাজনীতি শিল্পের পরিচারিকা"। কথাটি খুব মূল্যবান। যে ইংলণ্ড আজ সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলবিক্রমশালী, সেই ইংলণ্ডের উন্নতির হেতু শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা। রাজনীতির বাকবিতণ্ডা কিছুদিনের জন্য এখন আমাদের স্থগিত রাখিয়া অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জাতিতত্ত্বের শুষ্ক বীজ এদেশের আপাততঃ অনুর্ব্বর শিল্পক্ষেত্রে রোপন করিলে আমাদিগকে শেষে বায়ুভক্ষণ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

বঙ্গীয় শিল্পিদিগের একটি বিষয়ে সংযম অভ্যাস করা উচিত। অযথা ও অনাবশ্যক আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁহারা যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন সেই অর্থ স্বশ্রেণীর বা স্বপরিবারের উন্নতি ও হিতার্থ ব্যয় করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। ইংলণ্ডে কারিগরদিগের সভা সমিতি আছে এবং সেই সকল পরিচালনার নিমিত্ত আপনাদিগের মাহিনা বা মজুরি হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা আছে। বিলাতী কারিগরেরা নিজেদের সভায় রাজনীতির আলোচনা করে এবং পার্লামেণ্ট মহাসভায় আপনাদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি [illegible] করে। আমাদিগের শিল্পগণের যেরূপ বুদ্ধি, একাগ্রতা ও সামর্থ্য আছে যদি সেই সকল শিক্ষার সাহায্যে মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা স্বদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিতে সক্ষম হন তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয়

শিল্পিজাতিদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষা বিস্তার না হইলে তাঁহাদিগের চরিত্র গঠন হইবে না। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে। বিজ্ঞানের আলোচনা হইলে শিল্পের উন্নতি হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে দেশমধ্যে এখন যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা কেবল অন্তঃসারশূন্য কোলাহল মাত্র। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সন্দেহ দূর করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য জাতির মধ্যে সমাজ বিশেষের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনের সহিত জাতিগত জীবনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদিগের যেমন শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা আছে, জাতি বিশেষেরও সেইরূপ আছে। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তৎপরে, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি পুনর্জ্জন্ম মানিতে হয় তাহা হইলে ইতিহাসের যুক্তি অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে মৃত বাঙ্গালী জাতির পুনর্জ্জীবন সম্ভব। এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে আমাদিগের জাতীয় জীবনে যে একটি প্রবাহ আসিয়া পড়িয়াছে তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। এই বিশাল বিশ্বজগতে কোন কালে কোন স্থানে এমন একটি ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম ঘটনা হইতে পারে না যাহা উদ্দেশ্য বিহীন। সেই অচিন্ত্য বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য অন্ধ বা বাতুলের কার্য্যের ন্যায় হইতে পারে না। যে উদ্দেশ্যে,যে হিতের জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্প ও তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত, মারীভয়ে আক্রান্ত ভারতবাসী এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে পাশ্চাত্যদিগের নিকট কি শিখিবার আছে। স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতি-প্রেম, স্বার্থত্যাগ, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি জাতীয় গুণরাশির জ্বলন্ত ও সজীব দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যেরা আমাদিগের সমক্ষে স্থাপন করিয়া আমাদিগকে স্বাবলম্বন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কার্য্য এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য বণিকেরা, প্রতিযোগিতার সংগ্রামে পড়িয়া দিন দিন ধর্ম্মনীতির পতি অনুসরণ করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন। দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর অদৃষ্টে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে আর পাশ্চাত্য বণিকেরা আপনাদিগের সুবিধার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত কি উপায়ে তাঁহাকে

স্বল্প মূল্যের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। চাকচিক্যময় কাচ খণ্ডের বিনিময়ে আমরা বৎসর বৎসর সুবর্ণ ও হীরক রাশি যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের গৃহে পাঠাইয়া দিতেছি। পাশ্চাত্য বণিকেরা আমাদিগের শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কিরূপে অর্থলোভে অন্ধ হইয়া আমাদিগের অপকার সাধন করিতেছেন তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে দিলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, পাশ্চাত্য বাণিজ্যের তরণী পাপের পণ্য দ্রব্যে পূর্ণ হইয়াছে। স্বাস্থ্যের হানিকর কত প্রকার মাদক দ্রব্যই যে তাঁহারা এদেশে আনয়ন করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। দরিদ্র ভারতবাসীর একমুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই কিন্তু দেহ মন ও আত্মার ধ্বংসকারী মাদকতার প্রশ্রয় দিতে তাহারা বিরত নহে। উপকথায় লিখিত মধুকরের ক্ষণিক সুখ-লিপ্সা চরিতার্থ করিতে গিয়া আমরা অমূল্য মনিব চরিত্র হারাইয়াছি। পাশ্চাত্য বাণিজ্যের পাপ-পঙ্কিল স্রোতে আমরা গা ভাসাইয়া দিয়াছি। যে দেশে প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরা, আদর্শ-চরিত্র নরপতি-গণ, রমণীকুলের কোহিনুর সতী ললনারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের এই ভীষণ চিত্র ন্যায়বান জগদীশ্বর আর যেন দেখিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য বহু বৎসরের চেষ্টায় আমাদের নেতাগণ যাহা করিতে পারেন নাই তাহা যেন মন্ত্রবলে এক মুহূর্ত্তে ফলবান হইয়াছে। আজ যে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশ আলোড়িত হইতেছে তাহার মুখ্য কারণ হয়ত বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তাহার গৌণ কারণ উহা নহে। যুগে যুগে ভগবান মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যখনই মেদিনী পাপে পূর্ণ হয় তখনই সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া সমাজের অহিতকর অবস্থায় পরিবর্ত্তন করাইয়া দেন। শাস্ত্রে আছে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ভারতবাসীর অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছে, পাশ্চাত্য বাণিজ্যের গতি এতই ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল্।

কবিতা-কুঞ্জ।

হে মম নিখিলপতি!

হে মম নিখিলপতি!
আকাঙ্ক্ষা অনলে দহিয়ে দহিয়ে,
নির্ব্বাণে দিলে মতি!
কত ঝঞ্ঝাসনে বায়ু—
দিবস রজনী প্রলয় তুফানে
আসিল এ পরমায়ু!
কত সন্দ মন্দ ভয়—
মরম ছেদিয়া তীখন দশনে
করিল বেদনাময়!
মঙ্গল নাশ কত!
পলকে পাইয়ে পলকে হারায়ে
করিলাম অবিরত!
যেতেছিলে তুমি সরি
তিল তিল করি সঞ্চিত সে পাপে
আঁধারে হৃদয় ভরি!
পুণ্য এ পুণ্যালোক—
তোমারি কথায় তব বাসনায়—
পূর্ণিল দিকলোক!
আমি দেখিব ও জ্যোতি
চির নিশিদিন আলোকে পুলকে
আমারি জীবন গতি!
হে মোর নিখিলপতি
আকাঙ্ক্ষা অনলে দহিয়ে দহিয়ে
নির্ব্বাণে দিলে মতি!

শ্রীউমাচরণ ধর।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

আন চক্ষে সে মহান্ দৃশ্য বিমোহন,
হে বিশাল ভগ্নস্তূপ পর্ব্বত প্রমাণ!
লয়ে কি এসেছি হেথা তৃষিত নয়ান,
হেরিতে কঙ্কালসার শুধু এ শ্মশান?
জ্বলিছে স্মৃতির চিতা ধীকি ধীকি করি,
সে জ্বলন্ত রশ্মি কোথা নির্ব্বাণ মরমে?
মদির উচ্ছ্বাসময়ী কোথা সে শর্ব্বরী!
কি ঘোর রক্তিম ভানু উদিত সরমে!
আছে কি শোণিত বক্ষে আর্য্য বীর্য্যবল!
কোথা সে উদার হৃদি—দৃষ্টি তীক্ষ্ণতম!
আছে বাঙ্গালীর স্বার্থ—ঘৃণিত সম্বল—
নিবারিতে কৌতূহল বিলাসীর সম!
ইন্দ্রপুরী ইন্দ্রপ্রস্থ মহাপুণ্য স্থল—
হেরিব সাধক হ'য়ে—কি সাধনা মম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কেরাণীর খেদ।

১

বড় আশা বড়দিনে,
কেক্ রুটী লেবু সনে
হইবে আলাপ কত প্রিয় বন্ধু নি'য়ে;
প্রবাসী আসিবে কত
বড়দিন মহাব্রত—
বাঙ্গালীর ঘরে হয় সাহেবের চেয়ে।

২

অবশ্য স্বদেশী ভাবে
ক্ষতি কিছু নাহি তবে
কেরাণীর "বড়দিন" আমোদের দিন—
পূজায় পায় না ছুটী,
এতে আছে বেলা দুটী
ইহার অধিক মান কোথা পায় হীন?

৩

আশা ছিল আশা গে'ল
এলো "দিন" চ'লে গেল
মিটিল না যত আশা প্রাণের পিপাসা।
স্বাধীনতা নাহি যার
আশা করা বৃথা তার
মেঘ হেরি মে'টে কি গো চাতকের তৃষা!

৪

সাহেব রাগের জাত,
রাঙ্গা আঁখি রাঙ্গা বাত
কেরাণীর বিশেষতঃ জাগ্রত দেবতা—
ভয়ে হয় হাড়কালি,
দিনরাত খায় গালি
তথাপি কেরাণী যাচে তাদের মমতা।

৫

কেরাণী-চাকরি রাজা
তায় আছে বড় মজা
ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে নাই;
ধার কর পাবে কত,
মাস গেলে বড় গুত,
খাতা হাতে ডাকে মুদী ভাই।

৬

নেই নেই কথা বই,
অন্য কথা জানা নেই
(বড় দুঃখ) মাসান্তে বারেক মাহিনা
রোজ রোজ দিত যদি
বহিত সুখের নদী
ঘুচিত কতক ভাবনা।

৭

মুদী ব্যাটা বড় ঠ্যাটা
বুদ্ধি নাই বোকা পাঁটা
নইলে পরে' বোঝে না কথা।
বাড়ীওলা সোণার বেণে
দিনরাত টাকা গণে—
অভাব দুঃখ যায় না সেথা॥

৮

পিদে নাই খেতে হয়
ব্যাধি চির সঙ্গে রয়
খেটে খুটে রাত্রে এলে বাড়ী।
ছেলের হয়েছে জ্বর
মেয়েটাকে ধর ধর
সে নাকি দিয়েছে ভেঙ্গে হাঁড়ি।

৯

সারাদিন খেটে খেটে
পেট্ জ্বলে ছিল বটে
গিন্নীর কথায় ধ'রে সেটে।
ঘরেতে নাইক আলো,
বিছানা নাইক ভালো
রুটীগুলো যেন পোড়া ঘু'টে॥

১০

এর উপর ছেলেগুলো,
বাপে (র) পাছে ফেউ এলো
কি খাই, কি খাই, সদা বুলি।
গিন্নীর নাইক্ মানা
সদাই যে তার বায়না
আমি ব্যাটা যেন নগদা কুলী॥

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শোক সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিগত ২০শে মাঘ রবিবার অর্চ্চনা-সমিতির অন্যতম সভ্য রজনীকান্ত ঘোষ মহোদয় বসন্তরোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার অমায়িকতায় সকলেই অতিশয় মুগ্ধ ছিল। তাঁহার বিয়োগে আমরা অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে শান্তি প্রদান করুন।

শিল্পাগারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গেলে, অল্প মাত্রায় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিলে ব্যবসাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কারণ কলে অল্প পরিমাণে বস্তু নির্ম্মাণ করিতে গেলে কলের জন্য যে ব্যয় হয়, অধিক মাত্রায় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গেলেও কলের ব্যয় তাহাই হয়। সুতরাং

অধিক মাত্রায় দ্রব্য নির্ম্মাণ

আবশ্যক। একেবারে অধিক মাত্রায় কোনও একটি দ্রব্য নির্ম্মাণ করিলে তাহা যে অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পাগারের মূলধন অল্প, তথায় কারিগরের সংখ্যা অল্প, সুতরাং তথায় শ্রমবিভাগ পূর্ণমাত্রায় করা যাইতে পারে না। ইহাতে কিরূপ লোকসান হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পর ক্ষুদ্র কারখানার তত্ত্বাবধারককে একাকী সকল কার্য্য দেখিতে হয়। শিল্পাগারে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইবে সেই সকল দ্রব্য খরিদ হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহা বিভিন্ন কারিগরের মধ্যে বণ্টন, তাহারা যাহাতে অলস ভাবে সময় নষ্ট না করে তাহার পর্য্যবেক্ষণ, তাহার পর আপন শিল্পাগারে প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় অবধি সকল কার্য্যই তাহাকে তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। বড় কারখানায় কিন্তু এই সকল বিভিন্ন কার্য্য বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। ছোট কারবারে এত অধিক তত্ত্বাবধারক রাখিলে ব্যয় সঙ্কুলান করা যাইতে পারে না। সুতরাং কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষ যখন নির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দালালদিগের সহিত দর কষাকষি করিতে থাকেন, সেই সময় শিল্পিগণ বিশ্রাম করিলে তাহাদিগকে কেহ তিরস্কার করিবার লোক নাই। বৃহৎ শিল্পাগারে এ বিষয়ও শ্রমবিভাগ হইতে পারে বলিয়া তথায় লাভের মাত্রা অধিক।

বৃহৎ শিল্পাগারের জন্য একেবারে অনেক দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তজ্জন্য সে সকল দ্রব্য সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পর একেবারে অনেক দ্রব্য বহন করিবার জন্য যেরূপ ব্যয় হয়, অল্পে অল্পে সেই পরিমাণ দ্রব্য বহন করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক খরচ হয়। বড় বড় মহাজন একেবারে

নৌকা বা গাড়ী যোগে অধিক পরিমাণে আবশ্যক দ্রব্য লইয়া আপন কারখানা বোঝাই করিয়া রাখিতে পারে। যে সকল বস্তুর মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হয় সে সকল বস্তুর মূল্য হ্রাসের সময় এককালে অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া রাখিলে ব্যবসায়ী লাভবান হইতে পারেন।

বৃহদায়তন কারখানা নির্ম্মাণ করিলে অপর একটি সুবিধা পাওয়া যায়। আজ কাল প্রায় ব্যবসায় মাত্রেই মহাজনের হস্তে প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব যত মূলধন থাকে তাহা অপেক্ষা অধিক মূলধন ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ যে ব্যবসায়ীর পশার প্রতিপত্তি আছে সে সকল বিষয়েই ধারে কারবার করিতে পারে। ব্যবসায়ের খ্যাতি ও আয়তনের উপর ধার করিবার ক্ষমতা (credit) নির্ভর করে। সুতরাং বৃহৎ শিল্পাগার-স্বামী ধারে অনেক দ্রব্য পাইতে পারে, ইহাতে তাহার একটা উপরন্তু লাভ হয়। যদি একটি কাপড়ের কলের লাভের হার শতকরা ১০৲ টাকা হয় এবং অর্থ কর্জ্জ লইবার সুদের হার শতকরা ৫৲ টাকা হয় তাহা হইলে বিনা মূলধনে ব্যবসায়ী শতকরা ৫৲ টাকা লাভ করিতে পারে।

অনেক সময় পরীক্ষা (experiment) দ্বারা শিল্পের নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়। বৃহৎ ব্যবসায়ী কিছু অর্থ পরীক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারে এবং ফলে তাহা হইতে তাহার প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়। বিলাতের শিল্পোন্নতির ইহা একটি প্রধান কারণ। অস্মদ্দেশে অনেক স্থলে বৈদিক আমলের যন্ত্রাদি বা প্রথাদি লইয়া কার্য্য করি বলিয়া আমরা অল্প ব্যয়ে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি না। আমাদিগের অভিনব কারখানা গুলিতেও এতাদৃশ দূরদৃষ্টির বিশেষ অভাব। শুনিতে পাওয়া যায় যে সকল সুদক্ষ ছাত্র বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে তাহা-দিগকে ব্যবসায়ীরা আপনাদের কারখানায় দ্রব্য নির্ম্মাণের নূতন প্রথাদি আবিষ্কার করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

বৃহৎ কারখানায় অধিক বেতন দিয়া দক্ষ শিল্পিদিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমের পারদর্শিতা বৃদ্ধি হয় এবং শিল্পের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। ইহা ব্যতীত উপযুক্ত যন্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা ব্যবসাদার অধিকতর লাভবান হয়।

অনেক ব্যবসায়ের আবশ্যকীয় উপকরণ প্রভৃতিও একই কারখানায় নির্ম্মাণ করিলে অত্যধিক লাভ হয়। এইরূপে একই কারখানায় দুই

ব্যবসায়ের লাভ পাওয়া যাইতে পারে। এবং বৃহৎ কারখানা মাত্রেই এরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ের উদাহরণের জন্য আমরা বিস্কুট ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিব। বিস্কুট প্রস্তুত করিতে হইলে প্রধান আবশ্যক ময়দা। তাহার পর বিস্কুট প্রস্তুত হইবার পর টিনের বাক্সেরও প্রধান আবশ্যক। সুতরাং বিস্কুট নির্ম্মাতাকে যদি বাজার হইতে ময়দা ক্রয় করিতে এবং অপরের দ্বারা টিনের বাক্স নির্ম্মাণ করাইতে হয় তাহা হইলে এতদুভয় ব্যবসাদারের প্রত্যেকের লাভের উপর বিস্কুট নির্ম্মাতার লাভ সংযুক্ত হইয়া তবে বিস্কুট সাধারণের নিকট বিক্রীত হইতে পারে। মনে করুন ময়দার লাভের হার শতকরা ৪৲ টাকা, টিনওয়ালার লাভের হার ৫৲ টাকা এবং বিস্কুট নির্ম্মাতার লাভের হার ৫৲ টাকা। যদি বিস্কুটের কারখানায় এই তিনটি দ্রব্যই উৎপাদিত হয় তাহা হইলে বিস্কুটওয়ালা স্বয়ং শতকরা ১৪৲ টাকা লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া সে যদি শতকরা ১২৲ টাকা লাভে আপনার নির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রচুর পরিমাণে লাভবানও হইতে পারে। এবং তাহার দ্রব্যের মূল্য শতকরা অন্ততঃ দুই টাকা কমিতে পারে। বলা বাহুল্য ইহাতে অচিরাৎ তাহার দ্রব্য বাজারে একাধিপত্য লাভ করিবে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্থ করিবে। এইরূপে কাপড়ের কলে সুতা নির্ম্মাণ করা লাভের কার্য্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বৃহদায়তনের শিল্পখানা নির্ম্মাণ করিতে গেলে যেরূপ অত্যধিক মূল ধনের আবশ্যক হয় তাহা সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ। ভারতবর্ষের মত দারিদ্র প্রপীড়িত দেশে হাজার হাজার টাকা একত্রিত করিয়া কারখানা প্রতিষ্ঠা করা এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য। মূল ধনের অভাবই এদেশের কাল শত্রু, সুতরাং অধিক মূলধন লইয়া কার্য্য করার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

দেশে ব্যক্তিগত মূলধনের অভাব আছে তাহা আমি অস্বীকার করি না। মূলধনের অভাবে অনেক ব্যবসাদারকে যে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে তাহার উদাহরণ বহুল মাত্রায় দেখিয়াছি কিন্তু তাহা বলিয়া এই ব্যক্তিগত অভাবের প্রতিকার নাই একথা বিশ্বাস করিয়া অর্থনীতির শিক্ষা ভুলিয়া ছোট ছোট দোকান খুলিয়া বা এক একখানি তাঁত লইয়া বা হাতে নিব নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসাদার হইলে দেশের শিল্পোন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

যৌথ ব্যবসায়।

যেসকল প্রদেশ অধুনা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকরিয়া অপরাপর দেশ হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অর্থশালী হইয়াছে এবং হইতেছে,তাহাদের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যৌথ কারবারই তাহাদিগের উন্নতির প্রধান কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাপন সঞ্চিত ধন লইয়া, নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া এবং আপন পরিশ্রমে এক একটি ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অর্থবান হয়ত সে অলস বা নির্ব্বুদ্ধি এবং হয়ত কর্ম্মঠ এবং চতুর লোক কমলা কৃপাবঞ্চিত। তাহার পর উপরে যাহা বিবৃত করিয়াছি সেই প্রণালীতে বড় কারখানা খুলিবার মত অর্থ সমাজে কয়জনের থাকিতে পারে। সুতরাং ব্যবসায়ী মাত্রেরই কর্ত্তব্য অপরাপর ব্যবসায়ীর সহিত একত্রিত হইয়া সকলের সম্মিলিত মূলধন শ্রম এবং বুদ্ধি লইয়া কারখানা প্রতিষ্ঠা করা।

বখ্‌রাদারী কারবার যৌথ কারবারের সর্ব্বাপেক্ষা সরল উপায়। এরূপ ব্যবসায়ের প্রথা অস্মদ্দেশে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দুই জন, তিন জন সময়ে সময়ে ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া সকলে কিছু কিছু মূলধন দিয়া এবং সবাই কায়িক পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসায় জগতের যাহারই সামান্য জ্ঞান আছে সেই জানে এরূপ যৌথ ব্যবসায় অধিক দিন চলে না। ইহার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। অংশীদারের প্রতি হিংসা, তাহা অপেক্ষা আপনার অধিক লাভের বাসনা, অল্প পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য নানা কারণ বশতঃ পরস্পরের মনোমালিন্যের ফলে বখ্‌রাদারী কারবার প্রায়ই লোপ পাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইহাদ্বারা অধিক মূলধন একত্রিত হইতে পারে না। যাহারা অংশীদার হইয়া ব্যবসায় করে তাহারা কেহই প্রকৃত ধনী নহে। সুতরাং এরূপ যৌথ কারবারে বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বলা বাহুল্য ক্ষুদ্র কারবার করা অপেক্ষা এ প্রণালীতে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করা বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে সমাজের বা ব্যবসায়ীর প্রকৃত উপকার হইতে পারে না।

শূন্য বখ্‌রাদার লইয়া উপরোক্ত প্রকারের কারবার খুলা ইহা অপেক্ষা উপকারী প্রথা। কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ইহা অপেক্ষা অল্প হইবার

সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, এই প্রথায় ধনী কেবল ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করে এবং এক জন দক্ষ ব্যবসায়ী কারবার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ঐ দক্ষ ব্যবসায়ী কিছু মূলধন সরবরাহ করে না বলিয়া তাহাকে শূন্য বখ্রাদার বলা হইয়া থাকে।

শূন্য বখ্রাদারী কারবারে দক্ষতা এবং অর্থ সম্মিলিত হইতে পারে এবং শূন্য বখ্রাদার যদি সৎ প্রকৃতির লোক হয় তাহা হইলে ব্যবসায় উন্নতি হইতে পারে। বিশেষ ব্যবসা-বুদ্ধি-বিহীন কোনও ধনী যদি অর্থব্যয় করিয়া একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে কার্য্য চালাইবার জন্য তাহাকে একটি দক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ যতই কেন দক্ষ হউক না সে জানে ব্যবসায়ে প্রভুকে কিয়দ্ পরিমাণে লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে আপনার লভ্য বেতন পাইবে এবং চাকুরিও বজায় থাকিবে, মিছামিছি ক্লেশ করিয়া অসাধারণ পরিশ্রম দ্বারা ব্যবসার উন্নতি করিবার প্রবৃত্তি তাহার না হইবারই সম্ভাবনা। কারখানার উন্নতি হইলে লাভের সমস্ত অংশই ত' তাহার প্রভু পাইবে, তাহার যৎসামান্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবে মাত্র। শূন্য বখ্রাদারের স্বার্থ কিন্তু অন্যরূপ। সে জানে অধিক উদ্যমে অধিক পরিশ্রমে কারখানা চালাইতে পারিলে তাহার আপনার লাভের হার বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ব্যবসায়ে তাহার যতদূর স্বার্থ তাহার ধনীরও স্বার্থ তদনুরূপ।

এই প্রথায় কিন্তু সচরাচর একটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। জগত স্বার্থ পূর্ণ এবং ব্যবসায় জগত স্বার্থান্ধ। স্বুবর্ণ লালসটা অত্যন্ত কুফল প্রসূ। এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অর্থোপার্জ্জন যত অধিক মাত্রায় হইতে থাকে, ধনাকাঙ্ক্ষাটাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শূন্য ব্যবসাদার প্রথমে সাধু প্রকৃতির লোক হইলেও ক্রমশঃ তাহার লোভের মাত্রা এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে ধনীর সমস্ত লাভ উদরসাৎ করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিবার প্রবৃত্তি আসিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করে। এই জন্যই দেখিতে পাই, এ প্রথায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

তাহার পর যদি শূন্য বখ্রাদার প্রকৃতপক্ষে সচ্চরিত্র হয় তাহা হইলেও ব্যবসার লাভালাভ একজনের পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং শূন্য বখ্রাদার অকর্ম্মণ্য হইলেই কারখানার জীবনও শেষ হইয়া যায়।

তাহার পর বৃহদায়তন শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রকৃত সমস্যা ইহা দ্বারা পূর্ণ হয় না। ইহাতেই মূলধন সরবরাহ করিবার ভার একজন বা দুই জন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহাতে অধিক মূলধন ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

খালি বাড়ী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৫)

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বরদাকান্তবাবু প্রভৃতি সকলে গমন করিলে ডাক্তার বাবু ইজিচেয়ারখানির উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চিন্তার বিষয় বরদাকান্তবাবু ও তাঁহার কার্য্যকলাপ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—বরদাকান্তবাবুর তাহার সহিত ঈদৃশ ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি! তাঁহার বাড়ীতে অবস্থিতি করিলে তাহার যে বিশেষ কি উপকার সাধন করা হইত তাহাত বোধগম্য হয় না। হইতে পারে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভে বিশেষ ইচ্ছুক, তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া নিজের খানিকটা প্রতিপত্তি বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু যদি ইহাই সত্য হয় তবে গ্রামের অপরাপর সাধারণ কেন ঐ একই কথার সমর্থন করিল। ডাক্তারবাবু এইরূপে কূট চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্যদ্বয়—"জগুয়া" ও "কিষণ" তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল "বাবু"।

ডাক্তারবাবু।—কি খবর ?

জগুয়া।—হুজুর হামলোক্‌কো বড়া ডর্ লাগ্‌তা—হামলোক্‌কো দোস্‌রা ডেরামে রহেনেকো হুকুম—

ডাক্তারবাবু।—ডর্ লাগতা—কাহে ?

জগুয়া।—সব আদমীলোক বোল্‌তা ইঁয়াপর ভূতকো আস্তানা হ্যায়।

ডাক্তারবাবু।—আরে হাম্‌কো বি সব কৈ ঐ বাৎ বিশ্‌, পঁচাশ্‌ দফে বোলাথা।

জগুয়া।—হুজুর—

ডাক্তারবাবু।—বহুৎ আচ্ছা, হামরা কামরামে রও।

কিষণ।—হুজুর কসুর মাফ্ কি জিয়ে! হিঁয়াপর রহেনেসে জান্ ছুট্‌জায়েঙ্গে। পহেলা ত জান বাচানা চাইয়ে তবতো নোকড়ী বাবু!

নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত বেশী তর্ক বিতর্ক করিতে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। সুতরাং তিনি ভৃত্যগণকে তাঁহার আবশ্যক দ্রব্যাদি যথাযথ স্থানে সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এইবার ডাক্তার বাবুর হৃদয় যেন ঈষৎ কম্পিত হইল! তাহা কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তাঁহার ভূত দেখিবার বাসনা এখনও পূর্ব্ববৎ প্রবল।

(৬)

তখন জগুয়া ও কিষণ দুইজনে মিলিয়া কতকগুলি কলিকায় তাম্রকূট রচনা করিয়া,—হ্যারিকেন্ (Hurricane) এবং জুয়েল ল্যাম্পে তৈল পূর্ণ করিয়া ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্থান করিল।

ভৃত্যদ্বয় প্রস্থান করিলে ডাক্তারবাবুর পাচক ব্রাহ্মণটী আসিয়া রাত্রের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিল।

ডাক্তারবাবু ব্রাহ্মণের কথায় কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকেও গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

সকলকে বিদায় দান করিয়া ডাক্তারবাবু বুকের উপর একখানি ডাক্তারি পুস্তক পাঠ করিবার জন্য রাখিলেন। পাঠে কিন্তু তিনি আদৌ মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। সেক্ষপীয়র (Shakespeare) বর্ণিত ভূতদিগের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সেক্ষপীয়র (Shakespeare) একজন এত বড় কবি হইয়া ম্যাকবেথে, টেম্পেষ্টে কয়েকটা ভূতের অবতারণা করিলেন কেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি অবশেষে একটা অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি ভাবিলেন, কবি কাল্পনিক জগতেই বিচরণ করে, বাস্তব জগতের সহিত তাহার আবার সম্পর্ক কি। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। কিন্তু আর একটা চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ মাত্রেই তাঁহার তন্দ্রা কাটিয়া আসিল, তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, ভাবিলেন এই বাড়ীর বিষয় যাহা শুনিয়াছি তাহার মূলে কিছু না কিছু রহস্য লুক্কায়িত থাকিতে

পারে। যদি ইহা কোন বদমায়েসের ষড়যন্ত্র হয়, এই ভাবিয়া তিনি কক্ষের দ্বার জানালা ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া রহস্যোদ্ঘাটন করিতে হইবে এই ভাবিয়া স্পিরিট ল্যাম্পটি প্রজ্বলিত করিয়া কফি (Coffee) প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

(৭)

রাত্রি ১২ বারটা বাজিল। ডাক্তারবাবু ভাবিতেছেন যদি তিনি রাত্রে বদমায়েসকে ধৃত করিতে না পারেন—যদি ঈদৃশ পল্লীগ্রামে কোন বদমায়েসের হস্তে তাঁহার ন্যায় একজন সর্ব্বজন বিদিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন অনিষ্টই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইবে। তিনি অবশেষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, বদমায়েস হউক, ভূত হউক বা যে কেহই হউক না কেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই তাহার সহিত একটু বিশিষ্টভাবে বুঝিয়া পড়িয়া লইতে হইবে।

* * * * *

সম্মুখে একটী টাইম্‌পিস্ ঘড়ি "টুক্" "টুক্" করিয়া সময় নির্দ্দেশ করিতেছিল। তিনি ঘড়ির ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ঘড়ি কয়টা বাজিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা তিনি প্রত্যেক আওয়াজে ঠিক্ করিতেছিলেন। কখনও রোষকষায়িত নেত্রে, কখনও ভাবনায়, কখনও বা উৎকণ্ঠায়—তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ক্রমে যখন রাত্রি দেড় ঘটিকা হইল তখন ডাক্তারবাবু কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি ভূতের গল্পে শুনিয়াছিলেন যে, রাত্রি দুপুরের সময়েই ভূতের উপদ্রব হয়। এখন তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল ভূতের অস্তিত্ব নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে তিনি রাত্রি দুপুরের সময় তাহা দেখিতে শুনিতে বা বুঝিতে পারিতেন।

ডাক্তারবাবু সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিৎ আহারান্তে শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পাচকটি পূর্ব্বাহ্ণেই ঘরের ভিতর আহারীয় দ্রব্যাদি রাখিয়া গিয়াছিল। তিনি আহার করিবার জন্য পাত্র তুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, লুচি. তরকারী প্রভৃতি কিছুই সেখানে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে একটী চড়াই পাখী রহিয়াছে। পাত্র উন্মোচন মাত্র পাখীটা উড়িয়া ঘরের কড়ির উপর গিয়া বসিল। ডাক্তারবাবু ভাবিলেন ইহা পাচকের চতুরতা। তিনি অগত্যা নিরুপায় হইয়া পাচকের মুণ্ডপাত করিতে করিতে একটু জলপান

করিতে গেলেন এবং গেলাসের ঢাকনি খুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি আরও বিস্মিত হইলেন; দেখিলেন উহাতে জলের পরিবর্ত্তে একগ্লাস পরিপূর্ণ সদ্যঃকর্ত্তিত নরদেহের রক্ত রহিয়াছে। তিনি অগত্যা ভাবিতে ভাবিতে একটী কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া আলবোলার নলটী বাম হস্তে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব কথিতরূপে চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিলেন।

(৮)

ডাক্তারবাবু আলবোলার নলটী মুখে দিয়া মৃদু মৃদু টানিতে টানিতে একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন মাত্র, এমন সময় খট্ করিয়া একটী শব্দ হইল এবং সেই শব্দে তিনি চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন তাঁহার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহার পর যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তাঁহারই ঘরের ভিতর টেবিলের উপর দুইটী কুকুরে একটু সদ্যঃ কর্ত্তিত নরমুণ্ড লইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতেছে। তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভীত হয়েন নাই। তিনি কফি পান করিয়াছিলেন, সেই শূন্য পেয়ালাটী তাঁহার সম্মুখেই ছিল, তিনি সেইটাই কুকুরের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, কুকুরদ্বয় বিকট চীৎকার করিয়া নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইল। আলোকটা নিভিয়া গেল। তিনি পুনরায় আলোটা প্রজ্বলিত করিয়া ঘরের দ্বারটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং উহা যথা সম্ভব সতর্কতার সহিত রুদ্ধ করিয়া ঘরটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই সন্দেহজনক দেখিতে পাইলেন না; অগত্যা তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিলেন, এবং রিভলভরটী (Revolver) ও ছোরাখানি ঠিক করিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে গেলাসের জল রক্তে পরিণত হইল,—কি উপায়ে কুকুর দুটী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইল!

তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একটা শব্দে ফিরিয়া দেখিলেন যে, একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক একখানি চেয়ারে বসিয়া মনঃসংযোগে চা পানে নিরত আছেন। ডাক্তারবাবু অতুল সাহস ভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? কি জন্য এখানে এত রাত্রে এসেছেন? আপনার কি প্রয়োজন?"

ভদ্রলোকটী নিরুত্তর থাকিয়া স্বীয় কপালে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটী

প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। কিন্তু সে চপেটাঘাতে কোন শব্দ উত্থিত হইল না!

ডাঃ বাবু।—আপনি দেখছি ভদ্রলোক, আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধ হয় আপনার কর্ত্তব্য।

ভদ্রলোকটী পুনরায় স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করিল।

ডাঃ বাবু।—আপনিত আমার কোন কথারই উত্তর দিতেছেন না,—আচ্ছা আপনি ঘরে কি প্রকারে আসিলেন বলুন।

ভদ্রলোকটী পূর্ব্ববৎ স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করিল।

ডাঃ বাবু।—আপনি যখন কোন কথারই উত্তর দিতেছেন না, তখন আপনাকে আর কোন প্রকারেই মিত্রভাবে বা ভদ্রভাবে সম্ভাষণ করিতে পারি না, যদি এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমার কোন প্রশ্নের উত্তর না দেন, তাহা হইলে আমার হস্তে আপনার মৃত্যু অনিবার্য্য।

ভদ্রলোকটী আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু সে ক্রন্দনের কোন শব্দই শুনিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন ভদ্রলোকটীর চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

ভদ্রলোকটী ডাক্তারবাবুর প্রায় পাঁচ হাত অন্তরে বসিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহার ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু কোন ক্রমেই সেই ভদ্রলোকটীর নিকট পৌঁছিতে পারিলেন না। তিনি যতই তাঁহার নিকট যাইবার প্রয়াস পান, ভদ্রলোকটীও ঠিক সেই সময়েই তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ হাত অন্তরে অবস্থান করেন! ইহাতে ডাক্তারবাবুর অন্তঃকরণে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি আর কোন কথা না বলিয়া বন্দুকের একটী আওয়াজ করিলেন। বন্দুকের গুলিটা সন্ সন্ শব্দ করিতে করিতে একটা জানালা ভেদ করিয়া গেল। আলোটা নিভিয়া গেল।

(৯)

ডাক্তারবাবু পুনর্ব্বার আলো জ্বালিলেন এবং ঘরটা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন রাত্রি তিনটা।

ঘড়ির দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে না ফিরাইতে দেখিতে পাইলেন, ঘরের দ্বারের নিকট একটা দ্বারবান ও একটা বাঙ্গালী রমণী একটী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ডাক্তারবাবুর হৃদয়ে যেন কতকটা ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু তবু তিনি সে ভাব গোপন রাখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে?"

তাহারা নিরুত্তর থাকিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ডাক্তার বাবুকে একটা সেলাম করিল।

ডাঃ বাবু।—তোমরা কে, কি জন্য এখানে এসেছ বল!

তাহারা পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে সেলাম করিল। ডাক্তারবাবু পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী বাবুটীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও একটু ভীত হইয়াছিলেন সুতরাং অধিক কথা কহিতে না পারিয়া বলিলেন—তোমরা যদি কোন কথা না কও তাহা হইলে এখনই আমি গুলি করিব।

এই বলিয়া ডাক্তারবাবু তাহাদের দিকে রিভলভরটী (Revolver) ফিরাইলেন। তখন সেই দরোয়ানটী অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাক্তার বাবুকে ডাকিলেন।

ডাঃ বাবু।—হামকো কাহে ডাক্‌তে হ্যায়, হাম্‌কো কাঁহা যানে হোগা? সে পূর্ব্ববৎ অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিল।

ডাঃ বাবু।—তোম্ লোককো কোন আদমিকো বিমার হুয়া?

সে পূর্ব্ববৎ সঙ্কেতে ডাকিল। ডাক্তার বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল, "চলো হাম্ যাতা হ্যায়"। ডাক্তার বাবুর মনে এইবার একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি হ্যারিকেনএর (Hurricane) আলোটী জ্বালিয়া বাম হস্তে লইলেন ও দক্ষিণ হস্তে রিভলভরটী (Revolver) দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদানুবর্ত্তী হইলেন। তাহাদের ও ডাক্তার বাবুর মধ্যে প্রায় দশ হাত ভূমি ব্যবধান রহিল। ডাক্তার বাবু এবারেও শত চেষ্টা করিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। ডাক্তার বাবু যেমন একটু দ্রুত গমনে সেই দশ হাত ব্যবধানের এক হাত কমাইতে চেষ্টা করিলেন তাহারাও তৎক্ষণাৎ চকিতের মধ্যে পূর্ব্ব দশহাত ব্যবধান বজায় রাখিল।

তাহারা হল ঘর হইতে নীচে নামিল, পরে অন্দরে প্রবেশ করিল এবং খিড়কীর দরজা অতিক্রম করিয়া বাগান বাটীতে প্রবেশ করিল। শেষে একটী আম্র বৃক্ষের তলায় আসিয়া যেন গাছের সহিত মিশিয়া গেল। ডাক্তার বাবু ইহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন এবং অতি কষ্টে হল ঘরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কপালে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া পড়িলেন!

বিপদের উপর আবার বিপদ! একজন সাহেব আসিয়া টুপী খুলিয়া

ডাক্তারবাবুকে অভিবাদন করিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিতে ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিলেন "Hallo Mr. Lindsay! Is it true you are still alive!" সাহেব কথার প্রত্যুত্তর না করিয়া সঙ্কেত করিয়া ডাক্তারবাবুকে বুঝাইয়া বলিল, "তুমি বাড়ী ছাড়, নচেৎ তুমি মরিবে।" ডাক্তারবাবু ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

(১০)

যখন তাঁহার চৈতন্ত হইল, তিনি দেখিলেন বরদাকান্ত বাবু, তাঁহার ভৃত্যগণ ও অন্যান্য অনেক লোকে তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। একজন ভদ্রলোক কি মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কোথায়! এত লোক কেন, ব্যাপার কি! এরা সব রোগী নাকি?"

বরদাবাবু।—আপনি আমার বাড়ীতেই আছেন, ভোর বেলায় আপনার খবর লইতে গিয়া দেখি আপনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছেন—আমরা তখনই আপনাকে একখানি পাল্কী করে এখানে আনি। আপনার অদৃষ্ট ক্রমে এ যাত্রা আপনি খুব প্রাণে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। ঐ বাবুটী মন্ত্র তন্ত্র জানেন—উনি একজন বিখ্যাত ওঝা, উনিই বল্‌ছিলেন আপনার কোন বন্ধু আপনাকে উদ্ধার করেছে। আপনার সঙ্গে আপনার কোন বন্ধু ছিলেন নাকি?

ডাঃ বাবু।—না মশাই, আমার সহিত আমার কোন বন্ধুই ছিল না, তবে আমি যখন বিলাতে যাই তখন Lindsay নামক একটী সাহেবের সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হয়। মাঝে শুনেছিলুম তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কাল স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখেছি, আর তাঁকে দেখেই কি একটা কথা বলে আমি ঘুমিয়ে বা অচৈতন্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এই কথা শুনিয়া যে ভদ্রলোকটী মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন তিনি বলিলেন,—হয়েছে, মশাই হয়েছে, আমি যে বন্ধুর কথা বলেছিলাম তাহা এই সাহেব ভূতেরই কথা। ইনি জীবিত অবস্থায় ডাক্তারবাবুর বন্ধু ছিলেন, মৃত্যুর পরেও বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। অনেক ভূতে অনিষ্ট করে এবং অনেকে হিতসাধনও করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ক্রমে আপনি এ যাত্রা দৈব অনুগ্রহে পরিত্রাণ ও প্রাণ রক্ষা পাইয়াছেন।

* * * * *

ডাক্তারবাবু পরে খবর লইয়া জানিতে পারিলেন, যে বাঙ্গালীটী প্রথমে আসিয়া চা পান করিয়া শেষে ক্রন্দন করিয়াছিল, সেই সে খালি বাটীর অধিকারী। তাহার পত্নীর সহিত বাটীর ভৃত্যের অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হয় এবং তাহারই ঔরসে একটী সন্তান জন্মে। এই সংবাদে তিনি, ভৃত্য পত্নী ও শিশুটীকে হত্যা করিয়া বাটীর খিড়কীর দরজা সংলগ্ন বাগানে একটী আম্র বৃক্ষের তলায় পুঁতিয়া ফেলেন এবং স্বয়ং আত্মহত্যা করেন। ইহারাই ভূত হইয়া ডাক্তার বাবুকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

* * * * *

গ্রামের লোকের পরামর্শে ডাক্তারবাবু স্বীয় ব্যয়ে গয়ায় তাহাদিগের সকলের পিণ্ড প্রদান করাইয়াছিলেন, সেই অবধি খালি বাটীতে আর ভূতের উপদ্রব শুনা যায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

শিল্পিজাতিদিগের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিজ্ঞানের সহিত পাপময় পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অবৈধ সংযোগে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। আমরা বহুদিবসাবধি বিদেশী নিত্য ব্যবহার্য্য লৌহ পাত্রাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই সকল পাত্রাদির অধিকাংশ বিজ্ঞানসম্ভূত এনামেল মিশ্রণে আবৃত। কিন্তু বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, কি প্রকার উপাদানে এই এনামেল প্রস্তুত হয়। আমি আমার নিজের মত প্রকাশ করিতেছি না। বিলাতের দুইজন বিখ্যাত রাসায়নিক বিশ্লেষণকারী বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তারের অভিমত কি তাহা শ্রবণ করুন। ডাক্তার এইচ্, সি, বারট্‌লেট্, পি, এইচ্, ডি; এফ, সি, এস্ বলেন যে তিনি নীল ও শ্বেতবর্ণের এনামেলের অনেকগুলি বাসন রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে শিসা ও শঙ্খ বিষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ই, ডবলিউ, টি জোন্স বিলাতের ষ্টাফোর্ড জেলার সরকারী রাসায়নিক বিশ্লেষণকারী একখানি এনামেল করা কটাহের এনামেল অংশ ও অন্য একখানি খাদ্যদ্রব্য

সিদ্ধ করিবার হাঁড়ির ভিতর দিকের এনামেল অংশ রাসায়নিক সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে শতকরা ৬৩·৮০ ভাগ শিসা, ৩০·০৫ ভাগ টিন, ৫·২৮ ভাগ লৌহ, ও অতি সামান্য তাম্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দুইখানি রন্ধনের পাত্র তিনি একজন বিশিষ্ট ইংরাজের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পাত্র দুইটি লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডের একজন বিখ্যাত দোকানদারের নিকট হইতে বহুমূল্যে খরিদ করা হইয়াছিল। যদ্যপি লণ্ডনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এনামেল পাত্রে শিসার ভাগ এত অধিক থাকে তাহা হইলে জারমানি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতবর্ষে যে সকল অল্প মুল্যের এনামেল করা দ্রব্যাদি আমদানি হয় তাহাতে শিসার ভাগ কত অধিক থাকা সম্ভব? এ সম্বন্ধে আমি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাই যে, এদেশে আমদানি করা এনামেল পাত্রাদিতে শিসা ও শঙ্খবিষের ভাগ অত্যন্ত অধিক। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, শিসা ও শঙ্খ বিষ ভয়ানক বিষাক্ত দ্রব্য। যদিও এই দুই বিষাক্ত দ্রব্য এনামেলে ব্যবহৃত হওয়ায় তদ্দ্বারা শরীরের আকস্মিক ক্ষতি হয় না, কিন্তু তাহাদের প্রাণান্তকারী ক্ষমতা অল্পে অল্পে আমাদিগের শরীরকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই দুই পদার্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া পাক করিবার পাত্রাদিতে এনামেল ব্যবহৃত হয়। ফলে, পাশ্চাত্য বাণিজ্য কেবল মাত্র স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবাসীর জীবন হন্তারক পর্য্যন্ত হইয়াছে। কে বলিতে পারে যে আমাদিগের শারীরিক অবনতির কারণ বিলাতি এনামেল পাত্রের ভিতর নিহিত নাই? যে ভাবেই পাশ্চাত্য বাণিজ্যের পরীক্ষা করা যাউক না কেন, শেষে এই মিমাংসায় উপনীত হইতে হইবে যে, এতদ্দ্বারা ভারতবাসির যত প্রকার অনিষ্ট সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। স্বার্থ যে বাণিজ্যের মূল, স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত যে বাণিজ্য নিরীহ খরিদ্দারকে গোপনে বিষ ভক্ষণ করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, সে বাণিজ্য ভগবানের রাজত্বে অধিকদিন স্থান পাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের দেশে এক্ষণে যে স্বদেশী আন্দোলন হইতেছে তাহা ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির হেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য বাণিজ্যের পাপময় চিত্র আপনাদিগের মানস নেত্রের অন্তরালে সরাইয়া ফেলিয়া একবার দেশের বর্ত্তমান অবস্থার

প্রতি স্থির নেত্রে অবলোকন করুন। বিগত কয়েক বৎসর হইতেই ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক উন্নতি কল্পে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। নিস্বার্থ ও সরলভাবেই হউক বা কূট রাজনীতির উত্তেজনাতেই হউক, ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যে এতদ্দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে, বলিতে পারেন কি যে গবর্ণমেণ্টের মনে এত বৎসর পরে কেন এমন একটি ভাবের উদয় হইল যাহার ফলে প্রজা সাধারণের চিন্তার স্রোত স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির দিকে ধাবিত হইতেছে? ইহার উত্তরে আমি পুনরায় বলি যে, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করাই ইহার একমাত্র হেতু। যে লর্ড কর্জ্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনিই একমাত্র রাজপ্রতিনিধি যিনি এদেশের শিল্পের স্তুতিবাদ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ও শাসনকর্ত্তার কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থনীতি শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তির অনুসরণ করিলে আজিকার জাতীয় আন্দোলনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের কারণ থাকিবে না। পাশ্চাত্য বাণিজ্যের বর্ত্তমান নৈতিক অবস্থা, দেশ মধ্যে অভূতপূর্ব্ব জাতীয় আন্দোলন, ভারত সভার দৈন্য দশা, ভারত সন্তানের নির্জ্জীবতা, গবর্ণমেণ্টের মতিগতি, এই সকল বিষয় ঐতিহাসিক দর্শনশাস্ত্রের দীনালোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে অর্থনীতি শাস্ত্রের সাহায্যে দেখা যাউক দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ ফল প্রসব করিবে। কোন জাতি দারিদ্র্যের নিম্নতম সোপানে উপনীত হইলে, যদি ভগবানের এরূপ ইচ্ছা না হয় যে সেই জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাউক, তাহা হইলে সেই দেশে বা সেই জাতির মধ্যে এমন কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিবর্ত্তন হয় যদ্দ্বারা সেই জাতি দরিদ্রতার হস্ত হইতে রক্ষা পায়। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে ইংলণ্ডে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে তথাকার কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। ইংলণ্ডে এমন এক সময় আসিয়াছিল যে সেখানে শস্যের অভাবে প্রজা সমূহের দুরবস্থা হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় পোত আবিষ্কার হওয়াতে ইংরাজ বণিক দেশ দেশান্তর হইতে আপন দেশে শস্য আনয়ন করিতে সক্ষম হয়। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারের সহিত অর্থ বিনিময়ের নিমিত্ত

অর্থাভাব হওয়ায় ইংরাজ রাজনৈতিকেরা ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় সুবর্ণ খনির আবিষ্কার হওয়াতে ইংলণ্ডের অর্থাভাব দূর হইয়া ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির উপায় হয়। ইউরোপ ও ইংলণ্ডের বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যই যেন কলম্বসের জন্ম হইয়াছিল। যাহা হউক, এদেশে এমন কি ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছে যদ্দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য মোচন হইতে পারে। কয়লা, অভ্র, মেগনিসিয়ম্, এলিউমিনিয়ম্, পিট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনির ও খনিজ পদার্থের আবিষ্কারের কথা বলিতে চাহি না। কর্ম্মকার শিল্পির কোন যে ধাতুর সহিত বাক্য ও অর্থের ন্যায় সংশ্লিষ্ট সেই লৌহের অনেক গুলি খনি বঙ্গীয় কর্ম্মকার-দিগের জন্মস্থান বঙ্গ দেশের বরাকর অঞ্চলে অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে সেই সকল খনিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ বাহির করা হইয়াছে। অনেকেই আশা করেন যে দশ বৎসরের পরে ঐ সকল খনি হইতে এত অধিক লৌহ বাহির করা যাইতে পারিবে যে, ভারত-বর্ষকে তখন আর বিদেশ হইতে লৌহ আমদানি করিতে হইবে না। ফলকথা সকল দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদিগের জাতীয় উন্নতির অনুকূলে অনেকগুলি ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। আর সেই জন্য প্রতিবাদের ভয় না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী ঝটিকার ন্যায় নহে।

শিল্পপ্রধান জাতিদিগের এ সময়ে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। স্ব স্ব জাতির শিল্পের কিসে উন্নতি ও বিস্তার হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদিগের মনোযোগ দেওয়া ও যত্নবান হওয়া উচিত। নিত্য ব্যবহার্য্য নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য এখনও বঙ্গদেশের নানা স্থানের শিল্পি জাতিরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই জাতীয় উন্নতির সূচনা হইতেই যদ্যপি তাঁহারা কার্য্যারম্ভ না করেন তাহা হইলে আর তাঁহারা কোন কালে বঙ্গীয় শিল্পের উন্নতি করিতে পারিবেন না। সমগ্র বঙ্গদেশ স্বদেশীয় শিল্প-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালি মাত্রেই স্বদেশী শিল্পের পূজা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে জাতীয় উৎসাহ হ্রাস হইয়া আসিবে। বঙ্গীয় শিল্পি জাতিদিগের উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। জাতীয় শিল্পোন্নতির দায়িত্বের গুরুভার তাঁহাদেরই স্কন্ধে স্থাপিত। দলাদলির ইতরতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সাধন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল্।

কুন্তী।

পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবী হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাভারতে এই অপূর্ব্ব চরিত্রের বিকাশ। মহামুনি এই চরিত্রে জননীর আদর্শ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই জননীর চিত্র না থাকিলে যে জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, আর জননী ব্যতিরেকে ধর্ম্ম জীবনের জন্মই বা কোথায়!

জগতে সকল দেশে, সকল জাতিতে, যেখানে মহত্ব, যেখানে অসাধারণ, যেখানে স্বর্গীয় তাহাই করুণাময়ী জননীর স্নেহময় শ্যামল ছায়ায় অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও সুরভিত দেখা যায়। জননী কেবলমাত্র মাংসপিণ্ড নশ্বর মানব দেহের জননী ও রক্ষয়িত্রী নহেন, পরন্তু তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার দীক্ষা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ মানব আজীবন প্রত্যহ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। "যন্নবে ভাজনে ভগ্ন সংস্কারঃ নান্যথা ভবেৎ" সেইরূপই কিশোর হৃদয়ে মাতার স্নেহাঙ্কিত সৎনীতি নিচয় কদাপি অন্যথা হইবার নহে। দেহের ন্যায় মনোজীবনের মূলেও মাতা—দেবী মাতা না হইলে পুত্রে দেবত্ব সম্ভবে না। ধার্ম্মিকা জননী ব্যতিরেকে ধর্ম্মশীল পুত্র অসম্ভব। এ হেন গুরু ভার যাঁর হস্তে ন্যস্ত, সৃজনের সুন্দর অংশ সংগঠনে যিনি ভারার্পিত, ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার স্থান কত উচ্চে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

একদা শ্রীমন্ রামকৃষ্ণ দেব কেশবচন্দ্র সেনের সহিত কথোপকথনে যখন জ্ঞাত হইলেন যে তিনি শুদ্ধ পিতা ও পরমেশ্বরের নাম স্মরণে জীবনের কয়টা দিন একরূপে অতিবাহিত করিতেছেন, তখন বলিয়াছিলেন "দেখ কেশব তোমাদের দৌড় বাপু বাহির বাটী পর্য্যন্ত, মার ধার যখন ধার না তখন অন্দর মহলে আর প্রবেশ কত্তে পাচ্চোনা।"

বাস্তবিক এতদূর নির্ভর, এত প্রত্যাশা মানব আর কাহার নিকট করিতে পারে, আর কাহার আশ্বাস বাক্যে অবসন্ন হৃদয়ে এত উদ্যম ফিরিয়া আসে? মরণের অব্যক্ত যাতনাও এই পবিত্র নামের স্মরণে লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়।

লোক-চরিত্রদর্শী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাকাব্যে কুন্তীদেবীর পরিচয় না পাইলে ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই দেবী

মাতার সাহচর্য্য না পাইলে কখনই এই দেব চরিত্র নিচয়ের সংগঠন হইত না। পাণ্ডবের দ্বারে ধর্ম্ম আজীবন প্রহরী থাকিতেন না, আর—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এই মহাবাক্যের স্বার্থকতা করণার্থ সমগ্র ক্ষত্রিয় মণ্ডলী ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমূলে বিনষ্ট হইলেও জগৎ পাণ্ডু পুত্রগণকে জয়যুক্ত দেখিত না।

কুন্তীদেবীর মাতৃরূপ কোমল ও কাঠিন্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। তাহা শুদ্ধ সন্ধ্যার সমস্ত বিশ্ব হইতে সুদূরে, অবসাদ বিজড়িত, আপন বিভোরা বাৎসল্যময়ী স্নেহের প্রবাহ নহে কিম্বা কেবল প্রভাতের তেজঃ প্রকাশি তপনকরোজ্জ্বল কর্ত্তব্যময়ী হৃদয়ও নহে। তাহা ঊষার রক্তিম রাগ রঞ্জিত, কর্ত্তব্য পথে প্রধাবিত, অপত্য স্নেহ সৌরভবাহী, পুত্রগণের মঙ্গল কামনা বিজড়িত হৃদয়। সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, রজনী আগতা প্রায়, পুত্রগণ ভিক্ষান্বেষণে গিয়াছেন। পঞ্চালনগরে কুম্ভকার গৃহে পুত্রগণের পথ চাহিয়া কুন্তীদেবী অধীরা হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধনাদ শুনিয়া কত অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন। কখন ভাবিতেছেন ভীমসেন যেরূপ কলহ-প্রিয়, বোধ হয় কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াছে।

এতক্ষণ নাহি আইল কি হেতু না জানি
কার সহ দ্বন্দ্ব ভীম করেছে আপনি
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে
আজি নাহি জানি বিরোধ কৈল কার সনে।

নানারূপ চিন্তায় হৃদয় ব্যথিত, অশ্রুজলে কপোল প্লাবিত। এমন সময় পুত্রগণের আহ্বান শ্রবণ করিলেন। মাতার শরীরে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, তিনি হৃষ্টচিত্তে পুত্রগণকে সাদর আহ্বান করিলেন

তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা

এখানে তিনি পুত্র অদর্শনে ব্যাকুলা করুণ স্নেহরসের উৎসস্বরূপিণী জননী। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহাতে ইহা হইতে কত বিপরীত কঠোর কর্ত্তব্য-ময়ী আলেখ্য পরিলক্ষিত হয়। সে দিন পার্থ পাঞ্চাল নগরে লক্ষ্য ভেদ করিয়া "পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শরত রজনী" দ্রুপদ নন্দিনীকে লাভ করিয়াছিলেন। হৃষ্টচিত্তে মাতাকে বলিলেন

রজনীতে পাইনু ভিক্ষা দেখ আসি মাতা।

মাতার প্রাণ তখন "পুত্রগণ সারাদিন অনাহারে আছে" এই চিন্তায় আকুলিতা হইতেছিল। তিনি জানিতেন মাতৃভক্ত পুত্রগণ তাঁর আদেশ না গ্রহণ করিয়া জলপান করে না, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন

"বাটিয়া লহ পঞ্চ ভ্রাতা"

পুত্রগণকে চুম্বনান্তর সবার পশ্চাতে দ্রুপদ নন্দিনীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কেবা এ সুন্দরী দেখি তোমার পশ্চাতে"

ভীমসেন উত্তর করিলেন

"জননী এ দ্রুপদ দুহিতা
একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথা
ইহার কারণে মাতা কত দ্বন্দ্ব কৈল
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব রাজারে জিনিল"

সর্ব্বনাশ! বজ্রপতন শব্দে কুন্তী যেন চমকিয়া উঠিলেন। অজ্ঞাতে তিনি আদেশ দিয়াছেন কি? তাঁর আদেশ অবহেলা করা'ত পুত্রগণের পক্ষে অসম্ভব। তিনি সন্তানগণকে ত মাতৃ আদেশ লঙ্ঘনরূপ মহাপাপে পাপী করিতে পারিবেন না, অথচ এ বিপরীত কার্য্যই বা তাহারা কেমন করিয়া করিবে? কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন

কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলে
ভিক্ষা জানি বলি বাটি খাও পঞ্চজন
কেমতে আমার বাক্য করিবে লঙ্ঘন।

এ হেন ব্যাপারেও যে পুত্রগণ মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে, এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। পুত্রগণকে তো তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেই হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ অধীরা হইয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিলেন

"সব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর
শুনিয়াছ যাহা আমি করিনু উত্তর
যে মতে লঙ্ঘন তাত নহে মোর বাণী
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদ নন্দিনী।"

এখানে তাহার অপরিমেয় স্নেহের মধ্যে কি কঠোর ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। যার পদাঙ্ক অনুসরণে, উদাহরণ অনুশীলনে পুত্রের শুভাশুভ

নির্ভর করে সেই জননীর শাসন নির্দ্দেশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে, সন্তানগণকে কর্ত্তব্য পথে অবিচলিত রাখিতে, এতাদৃশ বাধা সত্বেও কি প্রয়াস করিতেছেন!

কুন্তী হৃদয়ে স্নেহের প্রচুর তরঙ্গ থাকিলেও কুত্রাপি তাহা তাহার কর্ত্তব্য নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। ভীমসেন স্বাভাবিক বড়ই উদ্ধত প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মাতা তাহাকে একদণ্ড দেখিতে না পাইলে অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়িতেন।

পাণ্ডবরা যখন নিতান্ত বালক তখন পাপমতি দুর্য্যোধন ভীমসেনের অমিত বিক্রম দেখিয়া যারপর নাই ভীত হইল।

বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল
ইহা হৈতে জীবনে মোর না দেখি কুশল
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি কৈল সার।

একদা দুরাচার এই সংকল্প করিয়া ভোজন প্রিয়, জল ক্রীড়াগত বৃকোদরকে কালকুট মিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করাইল।

বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন

এই অবসরে দুর্য্যোধন তাঁর হস্তপদ বদ্ধ করিয়া গঙ্গা সলিলে নিক্ষেপ করিল। ভীম গৃহে ফিরিতেছে না দেখিয়া অধীরা হইয়া উঠিলেন, বিদুরকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভাই সহ গেলা ভীম ক্রীড়ার কারণে
সবে আইল বৃকোদর না আইল কেনে।

এই পুত্রপরায়ণা মাতৃ হৃদয়ই আবার একদিন কর্ত্তব্যানুরোধে এত স্নেহের পুত্রকে নর মাংস লোলুপ বিকট নিশাচরের সম্মুখীন করিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই। যতুগৃহ হইতে পলায়িত পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বামচক্র নগরে ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ পরিবারের করুণ আর্ত্তনাদ কুন্তীর শ্রবণ পথে প্রবেশ করিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন

"এই তো নগরে আছে বক নিশাচর
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর
রাক্ষসেতে নির্ণয় করিল এই কর

পায়স পিষ্টক অন্ন সবর্ণ পুড়িয়া
এক নর বলি দেই মহিষ করিয়া।"

অদ্য তাহার পালা পড়িয়াছে কিন্তু

এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আদি চারিজনা
কারে দিব বলিদান করিছি ভাবনা
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধনে
সুহৃদ কুটুম্ব তারে নাহি হেন জনে।

ব্রাহ্মণের বিপদ শ্রবণ করিয়া পরদুঃখকাতরা মহীয়সী মাতা বলিলেন—

পঞ্চ পুত্র আছে মোর শুনহে ব্রাহ্মণ
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ।

বাস্তবিক এরূপ শিক্ষায়, কার্য্যে এরূপ জলন্ত উদাহরণেই কুন্তীদেবী তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহচ্ছায়াসীন পুত্রগণকে সনাতন ধর্ম্ম পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। আবার সপত্নী পুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেবের ভারও তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল। স্বীয় পুত্র নির্ব্বিশেষে সপত্নী পুত্রের পালন কত কঠিন ব্যাপার; কিন্তু দেবী কুন্তী মাদ্রীর শেষ অনুরোধ

যত্নেতে পালিবে মোর দুইটী কুমার

আজীবন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহারই এই অসাধারণ কার্য্য পুত্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। দূষিতবারি পানে মৃত ভ্রাতাগণের মধ্যে, বকরূপী ধর্ম্মের সন্নিকটে একজনের প্রাণ ভিক্ষা পাইলে, তিনি সর্ব্ব প্রথমেই নকুলের জীবন দান প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রতিভাবান কবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার পাণ্ডবগৌরব নাটকে এই মহীয়সী মাতার পুণ্য শিক্ষায় শিক্ষিত আশ্রিত রক্ষণে কৃত সংকল্প সমগ্র দেবতামণ্ডলী ও স্বীয় হৃদয়াসীন শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষেও দণ্ডায়মান পুত্র মুখে বলাইয়াছেন—

ভুলেছ কি মহাদেবী?
তব ধর্ম্মবলে—ধর্ম্মরাজের জননি!
ব্রাহ্মণ নন্দন হেতু অর্পিলে তনয়ে
ভয়ঙ্কর বক নিশাচর মুখে।

শ্রীউমাচরণ ধর।

অপ্রিয় সত্য।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা নিতান্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে এক পক্ষের প্রভূত উপকার সাধিত হইলেও সাধারণ জগতের ইহা দ্বারা অল্প বিস্তর অপকারও যে সাধিত হইতেছে না এমন নহে। কারণ, কবে কোন্ অতীত যুগে কোন্ লেখক তাঁহার উপন্যাস-গত চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য একটু ইতিহাস বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, অমনি সাহিত্য জ্ঞানাভিমানী মুসলমানগণ এবং তৎসঙ্গে মহচ্চেতা দুই একটী হিন্দু লেখক, পরলোকগত লেখককে তাঁহার অমর আশ্রয় হইতে ধরাতলে টানিয়া আনিয়া বিদ্রূপ ও শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সৌভাগ্যান্বিত করিতেছেন। আর বর্ত্তমান সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুইটী ধর্ম্মের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ হইয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা ও মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে এই সাহিত্য-চর্চ্চার গুণে আমাদের মধ্যগত যে সামান্য বন্ধুত্ব ভাব ছিল তাহাও আমরা হারাইতে বসিয়াছি। এখন মুসলমান সাহিত্যসেবী ভ্রাতৃগণ আমাদের একটু দোষ পাইলে এমনি সভ্যজন বিগর্হিত ভাষা সকল প্রয়োগ করেন যে তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয় সাহিত্য ও নীতি যে পরস্পরে বিজড়িত ইহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আবার কাহারও কাহারও ভাষা এত মার্জ্জিত যে, তাহা শুধু মৎস্যবিক্রেতা স্ত্রীলোকগণের মুখেই শোভা পায়। *

---

* কোহিনুরের একজন শিশিষ্ট লেখক হিন্দু গ্রন্থকারদিগকে বলিয়াছেন—"তাঁহারা মনে করেন, এম, এ, বি, এল, কিম্বা বি, এ, বি. এল, পাশ করতঃ মাসিক দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই তাঁহারা মুসলমান সম্রাট, নবাব, আমীর ওমরাহদের সমান হইলেন। এমন কি চুনীরাম, পুঁটীরাম পর্য্যন্ত মনে করেন যে তাঁহারা সম্রাট শাহজাহান, আকবর ও আওরঙ্গজেব প্রভৃতি হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোক।" আমার বিশ্বাস এই লেখক কখনও শিক্ষিত হিন্দুর সংস্পর্শে আসেন নাই, কারণ তাহা হইলে তিনি কখনও এমন নীতিবিগর্হিত ভাষা শিক্ষার অবসর পাইতেন না। নিজ জাতির Standard লইয়া অন্য এক জাতির দোষগুণ বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচায়ক। কোহিনুরের একজন লেখক অম্লান বদনে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী" রূপ বিকট উপাধিধারী

সেদিন শ্রদ্ধেয় কেশববাবু "অর্চনা" পত্রিকায় 'ধর্ম্মদ্বেষিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যেরূপে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহা দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, কেশববাবুর সহিত আমি পরিচিত নহি, এমন কি তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করি বলিয়া তাঁহাকে জানি। তাঁহার এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা করা মুসলমান সমাজের নিকট নিতান্ত অসহনীয় এবং অতৃপ্তিকর হইয়াছে, একথা স্বীকার করিয়া লইলেও এবং তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও—"বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত ডাঁটায় তাঁহার মনোভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে" "কেশব বাবুর মুসলমান-হিতৈষিতার ভান…মুখোশ মুক্ত হইয়া গিয়াছে" "কেশববাবু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহার জীবোচিত যথেষ্ট কুটিলতারই পরিচয় দিয়াছেন বটে" "এরূপ মক্ষিকা বৃত্তি অবলম্বন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের একান্ত অন্তরায়"—প্রভৃতি বাক্যপূর্ণ প্রবন্ধ একটীর পর আর একটি ক্রমাগত প্রকাশিত হওয়া সাহিত্য নীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয় নাকি? কেশববাবু অতি কুক্ষণেই "ধর্ম্মদ্বেষিতা" প্রবন্ধের রচনার নিমিত্ত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কারণ, এখন দেখিতেছি, প্রত্যেক মুসলমান সাহিত্যসেবীই তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া এক একটী প্রবন্ধ ছাপাইয়া "কোহিনুরের" মত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত পত্রিকার কলেবর পূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না। "Forgive and forget" নীতি কি উদার ইসলাম ধর্ম্মে নাই? "কোহিনুর"কে আমরা ভালবাসি বলিয়াই বলিতেছি যে, সম্পাদক সাহেব তাঁহার পত্রিকায়, এরূপ একই যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বারবার ছাপাইয়া বিগত কর্ম্মের অনিষ্টকর স্মৃতি জাগরিত রাখিয়া "কোহিনুরে"র মহদুদ্দেশ্য গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন।

এই স্থলে আর একটী কথা না বলিলে চলে না। আমাদের মতে কৈফিয়তের উত্তরকারী লেখক কেশববাবুর উক্তিগুলি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কতকগুলি উপদেশ তুলিয়া আসল কথাটা চাপা দিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে "Theory and practice

অকাল কুষ্মাণ্ডগণ এখনও মুসলমানকে 'ভারতীয়' বলিতে কুণ্ঠা করে।" ভাষার মাধুর্য্যটা একবার দেখিলেন! ইনি নাকি একজন মৌলভী এবং ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি। এইরূপ ভাষা যে ভদ্রজনের মুখে শোভা পায় না, ইহা মৌলভী সাহেবকে বুঝাইয়া দিবার মত লোক কি "কোহিনুর সাহিত্য সমিতিতে" কেহ নাই?

are different things." তাঁহার ঐ ধর্ম্মোপদেশগুলি কার্য্যকালে কে কতদূর অনুসরণ করিয়াছে ইহা দেখানই উচিত ছিল। কোন্ ঐতিহাসিক ব্যক্তি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের আদেশ কতদূর পালন করিয়াছিলেন তাহাই বিবৃত করিলে ভাল হইত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের নৃশংসতা ও হৃদয়হীনতা রূপ দোষ ক্ষালনের পক্ষে তাঁহাদের যে এক একটী হিন্দু কর্ম্মচারী ছিল এই যুক্তিই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। আর মাহমুদ গজনবী ও ঘোরীর অত্যাচার যে ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই বিদিত আছে, এই প্রবোধ বচন প্রয়োগ করিয়া সারিয়াছেন। যাহা হউক, লেখকের Logicটা আমাদের পক্ষে বড় জটিল বলিয়াই বোধ হয়।

এই উপলক্ষে লেখক বলিয়াছেন যে, সকল জাতির মধ্যেই পরধর্ম্মদ্বেষী লেখক আছেন এবং তাঁহারা পরধর্ম্ম-শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া আত্মশ্লাঘানুভব করেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় কেশববাবুর ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা করা উদ্দেশ্য ছিল কিনা এবং তিনি স্বীয় দুরদৃষ্টবশতঃ অবমানিত এবং অপদস্থ হইয়া কতটা আত্মশ্লাঘানুভব করিয়াছেন, তাহা মোস্লেম সমাজ একটু ধীর বুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইবেন কি ?—আর এক জন বিশিষ্ট লেখক লিখিয়াছেন যে, প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকই মুসলমানদিগের প্রতি গালি এবং বিদ্রূপে পূর্ণ। এই উক্তি সর্ব্বথা সত্য না হইলেও দুই একখানি পুস্তকে যে ঐরূপ দূষ্য বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে সকল যুগেই সাময়িক দেশাচার এবং ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রভাব সাময়িক সাহিত্যের উপর আসিয়া পড়ে। বঙ্কিমবাবু এবং নবীনবাবু প্রভৃতি মনীষিগণ যখন সাহিত্যগগনে জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য চন্দ্রের মতই শোভা পাইতেন, তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এরূপ মৌখিক সম্মিলনের প্রস্তাব ও সুবিধার সূচনা হয় নাই। তাই ধর্ম্মাভিমানী সাহিত্যরথিগণ কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। আরও ভাবিয়া দেখা উচিত, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আমাদের প্রতি কিরূপ সম্মানসূচক শব্দ সকল ব্যবহার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক খাঁফি খাঁ মহারাষ্ট্র গৌরব হিন্দুবীর শিবাজীকে "কাফের" "জাহান্নবি রাফৎ" প্রভৃতি অভিধানে * ভূষিত করিতে পারেন

* The date of his (Sivaji's) death is found in the words "Kafir

আর হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সম্রাট ও নবাবের প্রতি সম্ভ্রমার্থ সূচক শব্দ ব্যবহার না করিয়াই যত অপরাধী হইলেন? * আমি জিজ্ঞাসা করি যে মহাত্মা শুধু ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন—যে শিবাজী ভুলিয়া কখনও ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ" ইহাই যাঁহার মূল মন্ত্র হইয়াছিল, শত্রুকে নিকটে পাইয়াও যে ব্যক্তি কখনও তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করেন নাই, সেই দেব-চরিত্র শিবাজী নরকস্থ হইবেন, আর যে মহামতি স্বার্থকেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের প্রধান ও প্রথম অবলম্বেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সহোদর ভ্রাতৃগণের প্রিয় শোণিত এবং কঙ্কালের উপর যাঁহার সিংহাসনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, যে মহাপুরুষ তুচ্ছ রাজ্য লাভের আশায় জগতের শ্রেষ্ঠ দেবতা পিতাকে আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মজ্ঞানী তাহার পরাজিত শত্রুকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া কৌশলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ক্রূরমনা রাজর্ষি † আওরঙ্গজেব জিন্নতবাসী হইবেন ইহা কোন্ ধর্ম্মের আদেশ? রাজ্য লোভে পিতার সর্ব্বনাশ, ভ্রাতার জীবনান্ত এমন কি সহোদরের ছিন্ন মুণ্ড স্বহস্তে ধৌত করিয়া তাহার নিধন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া, এ সব কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে কি নরপিশাচ না বলিয়া দেবতা আখ্যা প্রদান করিতে হইবে? যাহা হউক আওরঙ্গজেবের রাজ্যলাভ ঘটিত নিষ্ঠুর

---

be Jahannam raft,"—the Infidel went to Hell. Khafi Khan is proud to be the discoverer of this chronogram.—S. Lane Poole's Aurangzib.

* হজরত মহম্মদের পবিত্র নামের পূর্ব্বে মহাত্মা শব্দ প্রয়োগ না করায় কোন মুসলমান লেখক "কোহিনুরে" কোন হিন্দু গ্রন্থকারকে যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু লেখকের জানা উচিত যে, যে মহাত্মা সকল সম্মানের আধার এবং বাস্তবিক সম্মানী তাঁহার নামের পূর্ব্বে মহাত্মা শব্দ ব্যবহার না করিলেই তিনি অবমানিত হইতে পারেন না। তাহা যদি হয় তাহা হইলে সেই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মকে আমরা উদার ধর্ম্ম বলিতে পারি কৈ? প্রকৃষ্ট স্বর্ণ কোন নিকৃষ্টতর নামে অভিহিত হইলেও তাহার গৌরব নষ্ট হয় না। মহামূল্য হীরক 'প্রস্তর খণ্ড' বলিয়া অভিহিত হইলেও তাহার সম্মান লাঘব হয় কি? বোধ হয় এবিষয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

† He adopted the rigorous system of self mortification which distinguished the fakir or mendicant friar of Islam. It is insinuated that the pretence of indifference to the reductions of power was designedly adopted with a view to hoodwink his contemporaries as to his real ambition."—Aurangzib.

অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য অমানুষিক কার্য্যগুলি যিনি যে ভাবেই সমর্থন করুন না কেন, তাহা যে নিতান্ত ছেলে ভুলান উপকথারই মত ভিত্তিহীন এবং অবিশ্বাস্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে কি? ইতিহাস হইতে ইহা বেশ প্রতীয়মান হয় যে, আওরঙ্গজেবের সহিত তুলনায় শিবাজীর চরিত্রে এমন কোন মারাত্মক অপরাধ দেখিতে পাওয়া যায় না যদ্দ্বারা অন্তিমে তাঁহার জন্য জাহান্নমের ব্যবস্থা হইবে। আমরা জানি—"He (Sivaji) was absolutely guiltless of baser sins and was scrupulous of the honour of women and children of the Muslims when, they fell into his hands." মুলানা আহম্মাদ নামীয় একজন মোগল সুবাদার মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক সপরিবারে বন্দী হইয়াছিলেন। শিবাজী এই বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া স্ত্রীলোকগণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। *

যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য। কিন্তু কয়েকটী অপ্রিয় সত্য কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া যে কেশববাবু এইরূপে অবমানিত হইতেছেন তাহা আমাদের দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলিব? স্বীকার করি, মুসলমান নরপতিগণ স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহাই করিয়াছিলেন; কিন্তু কেশববাবুর ন্যায় আমিও জিজ্ঞাসা করি, মহমুদ গজনীর এবং আওরঙ্গজেবের হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির গুলির ধ্বংস সাধন কি তাঁহাদের ধর্ম্মদ্বেষিতা এবং নৃশংসতার পরিচায়ক নহে? আমরা জানি—

"The Director of Faith issued orders to all the governors of provinces to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels; and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practising of idolatrous forms of worship." নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য পরের ধর্ম্মের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করা কি ইসলাম ধর্ম্মের আদেশ? লেখক বলিয়াছেন আওরঙ্গজেবের একজন হিন্দু কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতির বর্ত্তমানে যে অত্যাচারী সম্রাটের হিন্দুদ্বেষ প্রকাশ করিবার পক্ষে একটু অসুবিধা হইয়াছিল, একথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু তাঁহার রাজ্য লাভের অত্যল্পকাল পরেই যশোবন্ত এবং জয়সিংহ প্রভৃতির মৃত্যু হওয়ায় সম্রাটকে হিন্দু বিদ্বেষ বহ্নি

* Grant Duff's Account.

বেশী দিন চাপিয়া রাখিতে হয় নাই। ইতিহাস কি বলিতেছে দেখুন— "At last the Emperor was free to carry out his repressive policy towards the Hindus, which must be the aim of every good Muslims." এমন কি অনুতপ্ত সম্রাট তাঁহার শেষ জীবনে নিজেই স্বীয় অপরাধ এবং অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজকুমার মহম্মদ আজমকে আওরঙ্গজেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একস্থানে আছে :—

"আজাব ও গোনাহ হরচে করদম্,
ছম্‌রায়ে আঁবখোদ মিবোরাম।"

আমি যে সব অত্যাচার এবং পাপ করিয়াছি তাহাদের ফল নিজে বহন করিতেছি। কোন কোন লেখক বলেন যে আওরঙ্গজেব পিতাকে অবরুদ্ধ করিলেও তাঁহাকে সম্রাটেরই মত ঐশ্বর্য্যের মাঝে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মতে স্বর্গের ও স্বচ্ছন্দতা বর্ত্তমানেও কারাগার কারাগারই বটে।

তারপর লেখক লিখিয়াছেন যে জিজিয়া ট্যাক্স, হিন্দুরা যুদ্ধে যাইত না বলিয়া শুধু তাহাদেরই উপর নির্দ্ধারিত ছিল। আওরঙ্গজেব বাদসাহের সময়ে হিন্দুরা যুদ্ধে যাইত না একথা লেখককে কে শিখাইল? তিনি কি বলিতে চাহেন যে সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে হিন্দু রাজপুতগণ যুদ্ধ যাত্রা করিত আর সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহারা বাদসাহের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে বিমুখ হইয়াছিল? এইরূপ অযৌক্তিক বাক্য দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ না করিলেই ভাল হইত। জিজিয়া কর কি উদ্দেশে আদায় হইত তাহা সম সাময়িক পারস্য ইতিহাস হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এবিষয়ে "কানুজুল মায়ফুজ" নামক ইতিহাস বলিতেছে—"সম্রাট কহিলেন—তোমার (ওমরাহগণ) যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু আমি এবিষয়টি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি; তোমরা যদি রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতে চাহ, জিজিয়া আদায় করিয়া এ উদ্দেশ্য আরও উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা পৌত্তলিকতা দমন হইবে, মুসলমান ধর্ম্ম এবং সত্য বিশ্বাস সম্মানিত হইবে, আমাদিগের যথার্থ কর্ত্তব্য সাধিত হইবে, রাজকোষ বৃদ্ধি হইবে এবং কাফেরগণ অবমানিত হইবে।" ওমরাহগণ উচ্চকণ্ঠে ইহা অনুমোদিত করিলেন, এবং সম্রাট সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত প্রতিমাগুলি ভঙ্গ করিলেন এবং মন্দির ধ্বংস করিলেন।" হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির

জন্ত পরিচালিত "কোহিনুর" কি এখনও বলিবেন আত্মধর্ম্ম রক্ষার জন্যই কেবল মুসলমান পশুবল ব্যবহার করিতেন? এ বিষয়ে আরও অনেক মুসলমান লেখকের মত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু আশা করি ইহাতেই উদ্দেশ্য সাধন হইবে। উভয় সমাজের মঙ্গলের জন্ত এখন এ সকল ইতিহাস বিস্মৃত হওয়াই ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কবিতা-কুঞ্জ।

বাঁশী।

কুসুম সুরভি ভরা কৌমুদী নিশায়,
সুনীল সলিল শ্যাম যমুনার কূলে
তুমি কিগো বেজেছিলে মোহন বাঁশরি!
তুলিয়া লহর শত নীল যমুনায়!
অস্ফুট সঙ্গীত ভরা নিস্বনে তোমার,
রোমাঞ্চ উঠিত স্তব্ধ বনানী নিখিলে,
আকুল মুকুল কিগো বিকশিয়া উঠি
ঘুমায়ে পড়িত মুগ্ধ জোছনার কোলে!
তোমারি ফুকারে কিগো যত গোপাঙ্গণা
ছুটিয়া আসিত সবে যমুনার তীরে
বিরাজে যেখানে নিত্য বাঁকা বনমালী?
দ্বাপরের সেই সুরে বাঁশরী আমার!
বারেক বাজিবে কিগো মধু মূর্চ্ছনায়,
তুলিয়া উজান মোর ভক্তি যমুনায়?

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

ফতেপুর শিকৃরি।

(হিরণ মিণারের উপর হইতে ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া)

শুধু এ অমরাবতী ভারত শ্মশানে,
জ্বলিছে কীর্ত্তির চিতা নিবিয়া নিবিয়া;
শিখাইতে চিরঅন্ধ মানব অজ্ঞানে,
জগতের সব যাবে ভস্মেতে মিশিয়া।
বিরাট সমৃদ্ধি-স্তূপ গিয়াছে ভাসিয়া,
ভীষণ তরঙ্গময় কালের সাগরে
প্রাচীন মন্দির সৌধ পড়িছে হেলিয়া,
ঝরিছে গৌরব-রেণু হীন রেণু'পরে।
দীর্ণ জরাজীর্ণ সব;—লতিকা শৈবালে
মণ্ডিত সুরম্য হর্ম্ম্য! বিশাল প্রাঙ্গণ
আচ্ছন্ন কণ্টক বনে; স্তব্ধ পান্থশালে
বিচরিছে বনপক্ষী—অহো সুদুর্জ্জন;
শোভাহারা রাজপুরী সন্ধ্যার আকাশে,
লয়ে সুমহান্ স্মৃতি, চিত্র সমভাসে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বিরহিনী।

কোকিল কূজিত বল এ কুঞ্জ কুটীরে,
কোথায় উৎসব ওগো কহ বিনোদিনী?
এ নীল যমুনা তীরে মলয় সমীরে,
উড়িছে চিকুর কোথা? নয়নে দামিনী
সে ঘোর নিশীথে মৃদু মন্থর গমনে
কোথা সে কানন পথে মধু অভিসার,
কোথা বঁধুয়ার সাথে চুম্ব আলিঙ্গনে
কপোলে রক্তিম রাগ বসন্ত উষার,
আজু কেন আলু থালু শিথিল কুন্তলে,
শ্লথ চারুনীলবাস পড়েছে গলিয়া:
ফুল্ল শশধর কান্তি ও মুখ কমলে,
নিবিড় মেঘের ছায়া রহেছে ঘেরিয়া।
সে শ্যাম বিহনে কিগো দিবস যামিনী
রবে কি বিরহ সাজে চিরবিরহিনী!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

অর্চ্চনা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

মীরকাসিম।

(সমালোচনা।)

যে বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতি ঘটে, সেই বিশ্বাসঘাতকতায় মিরজাফরেরও রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাবের হত্যাসাধনের পর 'ক্লাইব-গর্দ্দভ' যখন সিংহাসন অধিকার করিয়া ইংরেজ বণিক করে বঙ্গবাসীর অশেষ নির্য্যাতন দেখিয়াও স্থির হইয়া রহিল—তখন এক মহাপ্রাণী বঙ্গবাসীর আকুল ক্রন্দনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর সর্ব্বনাশ দর্শনে ক্ষুব্ধ ও চিন্তাকুল হইয়াছিলেন, এ চিন্তার ফলে যে বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা মার্জ্জনীয়। এই জন্য, মীরকাসিম বঙ্গবাসীর নিকট এখনও ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পীড়িত জন্মভূমির উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়া, স্বদেশের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, পরাধীনতা অসহ্য বোধ করিয়া, বঙ্গবাসীর হিতসাধনে অসঙ্কুচিত চিত্তে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। নিন্দাভয়, শত্রুভয়, প্রাণভয় বিসর্জ্জন করিয়া উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া মীরকাসিম সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নবাবীর নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ করেন নাই। এজন্যই বলিতেছিলাম, তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা মার্জ্জনীয়। তবে সিরাজকে বন্দী করিয়া ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করা মীরকাসিম চরিত্রের মহা-কলঙ্ক। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। জগদীশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারে তাঁহাকেও একদিন সিরাজের ন্যায় ফকীরি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

কবি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বড়ই কৌশলে দেখাইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট মীরকাসিম পূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র হইলেও তিনি সম্পূর্ণ ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নাই। ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও তিনি কবি প্রতিভা বলে ঐতিহাসিকের অদৃশ্য ঘটনা গুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতেই এ কাব্যের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। মীরকাসিম ফকির বেশে অযোধ্যা হইতে পলায়নের পর কোথায় কি ভাবে ছিলেন, ইতিহাস সে বিষয়ে মূক। কিন্তু কবির সূক্ষ্ম বিচারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও আঘাতের পর

প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। পর্ণকুটীরে বিকৃত মস্তিষ্ক কাসিমকে কবি তাই বলিতে শুনিলেন, "সিরাজ—সিরাজ—তুমি আমায় তিরস্কার কচ্ছ না? তোমার মর্ম্মব্যথা আমি বুঝেছি।—রাজ্যেশ্বর, আবার রাজ্য গ্রহণ কর;—আমি তোমার ক্রীতদাস, আমি তোমার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করবো। আহা প্রজার দুঃখে তোমার হৃদয় ব্যথিত!—শান্ত হও, রাজ্যেশ্বর শান্ত হও!"

হায় মীরকাসিম! যখন সিরাজকে বন্দী করিয়া তাঁহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিয়াছিলে "এই যে, জনাবের ধর্ম্মে মতি হয়েছে!" তখন বুঝ নাই যে ধর্ম্ম কোন স্থানে বসিয়া তোমার ভাগ্য চক্রের পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। যখন বালক সিরাজকে বন্দী করিয়া উপহাসের সহিত বলিয়াছিলে, "এ ফকিরের আস্তানা কি রাজ্যেশ্বরের শোভা পায়!" তখন ভাব নাই যে তোমাকেও একদিন দৈবচক্রে রাজ্যেশ্বর হইয়া এই ফকিরের আস্তানায় ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। যে আঘাতে একদিন সিরাজকে ধ্বংস মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, কালে সেই আঘাতে তুমিও তদ্রূপ বিধ্বস্ত ও নিষ্পেষিত হইয়া ইহ সংসার ত্যাগ করিলে! তখন বুঝ নাই যে কি অবস্থায় সিরাজ অবস্থিত! স্বীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই জন্যই তোমাকে বলিতে শুনি "নবাবীপদের এতদূর অমর্য্যাদা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না। সিরাজদ্দৌলাকে আমরা বালক ব'লে উপেক্ষা করেছি;—উদ্ধত স্বভাব, হিতাহিত বিচার শূন্য এইরূপ বিবেচনা করতেম! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—সেই বালকই প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়েছিল! যদি আমরা হিন্দু মুসলমান বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী না হতেম, বোধ হয় সেই উচ্চচেতা নবাব, বঙ্গের কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হতেন। আমি তাঁর পতনে সাহায্য করেছি। নিরপেক্ষ ঈশ্বর তার প্রতিফল স্বরূপ দিবারাত্র আমায় পীড়ন কচ্ছেন;—দেখ্‌ছি—সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!..." প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। ক্ষোভে ও যাতনায় অধীর হইয়া কাসিমকে বলিতে হইয়াছিল—

"ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ
করেছিল বালক সিরাজ!
ত্যজি রাজ-পরিচ্ছদ
ভিখারীর বেশে, ফকীর-আবাসে,
এসেছিল ক্ষুধার তাড়নে।

রাজ-রাজেশ্বরে—
করিলাম বন্দী দম্ভভরে।
দেখি কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত তার
হয় যদি ফকীরি গ্রহণে।”

সিরাজ যেরূপ দানসা ফকীরের আশ্রয় পাইয়াছিল, কাসিম তদপেক্ষা হীনচেতা 'দানসার' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ 'দানসা' অযোধ্যার নবাব—সুজাউদ্দৌলা। ইনি কোরাণ স্পর্শ করিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কোরাণ স্পর্শের পর ধর্ম্ম ভ্রাতা সম্বোধন করিয়া অযোধ্যাপতি কাসিমকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যে সমাদরে রাখিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কাসিম নিজেই দিতেছেন ;—

“আলী, সহিয়াছি অশেষ যন্ত্রণা
বাঙ্গালার নবাবী গ্রহণে।
কিন্তু যে যন্ত্রণা সহিলাম সুজার আশ্রয়ে
সহিয়াছি ইতি পূর্ব্বে যত—
বিন্দু সম সিন্ধু তুলনায়!...”

বিচক্ষণ কাসিম যখন সুজার মনোভাব অবগত হইয়া ফকীরি গ্রহণে তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তখনও কপট সুজা মুকুট লইয়া তাঁহাকে বলিতেছে, “ভ্রাতঃ, তোমার ধর্ম্মভ্রাতা তোমার মস্তক মুকুটে ভূষিত কচ্ছে ; এ মুকুট চিরস্থায়ী হবে।” কাসিম বুঝিয়াছিল, “কপট এ মুকুট প্রদান!” কিন্তু, আশার কি বিষম কুহক!

“উপহাস করে আশা তবু তার দাসী,
আশায় যাতনা তবু আশা ভালবাসি।”

কাসিম বার বার আশার উপহাসে উপেক্ষিত হইয়াও আশার দাসত্ব করিতে বিরত হইলেন না। তাই ভাবিলেন,

“আশা নারি করিতে বর্জ্জন,
ইংরাজ-বিদ্বেষ, অগ্নিসম জ্বলে হৃদে!”

পরক্ষণেই, বুদ্ধিমান কাসিম ভবিষ্যতের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন,

“লোকাচার ভয়ে ক'রে গেল সৌহার্দ্দ্য স্থাপন।”

সুজার এ ব্যবহার লোকাচার ভয়ে সম্পাদিত হইয়াছিল সত্য। কিন্তু, কাসিম আশার আশ্বাসে এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন,

"পাথার মাঝারে, ক্ষীণ তৃণ আশ্রয় আমার।"

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি যখন পরিণামের চিন্তায় ব্যাকুল, তখন উদাসিনী তারা বলিল, "মীরকাসিম! আর তো দুঃখিনী বঙ্গভূমির উপায় নাই! তুমি শান্ত হও, বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক; স্বদেশদ্রোহিতা মহাপাপ, কঠোর অধীনতা ভিন্ন তার প্রায়শ্চিত্ত নাই। হেথায় কপটাচারী, কৃতদাস—হেথায় তোমার কার্য্য নাই! অশান্ত আত্মা শান্তি লাভ করো।"

মীরকাসিম ঐতিহাসিক নাটক। গিরীশবাবু ইতিহাস অনুসরণ করিয়াই ইহার ঘটনা ও চরিত্রাবলী চিত্রিত করিয়াছেন। মীরকাসিম চিত্র ইতিহাস সঙ্গত। ইতিহাস তাঁহাকে স্বদেশানুরাগী, প্রজাবৎসল, ন্যায়বান, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্য্যকুশল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কবিও তাহাই দেখাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার ন্যায় যে একজন স্বদেশানুরাগী ও রাজনীতিজ্ঞ নৃপতি রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ হইয়া দ্বারে দ্বারে সাহায্যের আশায় ভ্রমণ করিয়া পরে বিফল মনোরথ হইয়া পর্ণকুটীরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; ইহার কারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পূর্ণরূপে অঙ্কিত না থাকিলেও এ নাট্য কাব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। তাহার এক কারণ কাসিমের বন্ধু আলী ইব্রাহিম যাহা বলিয়াছিল তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিলাম। "জনাব, পলাশীক্ষেত্রে যখন নবাব-সৈন্য পরাজিত হয়, তখন কি ইংরাজ সৈন্যের আধিক্য ছিল? শৌর্য্য-বীর্য্যে মোগল সৈন্য কি কারো অপেক্ষা ন্যূন? নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনার অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, উপযুক্ত সেনা নায়কের অভাব ছিল না, অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না,—অভাব ছিল একতার, অভাব ছিল মনুষ্যত্বের, অভাব ছিল স্বদেশ-অনুরাগের! সেই অভাব এখনও বর্ত্তমান।" ইহা পূর্ণ সত্য হইলেও কাসিমের পতনের ইহাই যে প্রধান কারণ তাহা আমরা বলিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্বাসঘাতকতায় যাহার উত্থান, অন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। মীরকাসিমের জীবনে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাই বলিতেছিলাম, সিরাজের প্রতি কাসিমের নৃশংস ব্যবহারই কাসিমের পতনের প্রধান কারণ। কবি বড়ই কৌশলে তাহা দেখাইয়াছেন।

মীরকাসিম পাঠ করো, দেখিবে সিরাজের আত্মা যেন সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। যেন তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ দর্শনে ও দীর্ঘশ্বাসে জাফর ও

কাসিম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হতজ্ঞান হইতেছে। যেন সিরাজের আত্মা তাহাদের শুনাইয়া রোষভরে আবার বলিতেছে "ফিরিঙ্গি-কালসর্প এনে রাজ্যে স্থান দিয়েছ, গরলে রাজ্য জর্জ্জরীভূত হবে! অচিরে সকলের আমার দশা হবে, তখন আমায় স্মরণ করবে!"

সিরাজের নিমিত্ত তাঁহাদের সকলকেই একদিন আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। সিরাজের অনুরূপ অবস্থা যে কাসিমের ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এবং কাসিমের সিংহাসন আরোহণের পর মীরজাফরকেও দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিতে হয়, "সিরাজ—সিরাজ—তুমিও একদিন এমনি সিংহাসনচ্যুত হ'য়ে, স্ত্রী কন্যা ল'য়ে চ'লে গিয়েছিলে, সে দিন আজ আমার মনে হ'চ্ছে!" মীরজাফরের এ অনুতাপ দেখিয়া কেহই দুঃখিত হয় না। বরং তাহার যখন চরম প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, যখন সে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "কোথায় কি প্রলেপ আছে যে আমার উপশম করবে? আমার দেহ ক্ষতপূর্ণ, মন ক্ষতপূর্ণ, আত্মা ক্ষতপূর্ণ! এত যন্ত্রণা, তবু আবার মন বলছে—আমার সমুচিত দণ্ড হয় নাই!—দারুণ আত্মগ্লানি—দারুণ আত্মগ্লানি, শান্তিহীন হৃদয় স্থির হয় না!" তখন ডাক্তার ফুলারের সহিত আমরাও বলি, "The punishment of sin may begin here but not end here." মীরজাফর যে কুষ্ঠগ্রস্থ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন করিয়া সিরাজ, কাসিম, জাফর ও জগৎশেঠের চরিত্র বিকাশের সঙ্গে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ দেখাইতে কয়জন পারে! গিরিশচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও আধুনিক কবি যদি সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম উভয় নাটকেরই রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে ইহাদের উভয়ের মধ্যে আক্ষেপোক্তি ও চরিত্রগত যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা থাকিত কিনা সন্দেহ! স্বদেশের কল্যাণ সাধনে উভয়েই নিযুক্ত ছিলেন, উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, উভয়েরই শেষ ফকীরি গ্রহণ; কিন্তু, তথাপি কি বিচিত্র পার্থক্য! পাপের প্রায়শ্চিত্ত মীরজাফর ও মীরকাসিম উভয়কেই ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মানসিক বিকার ও আক্ষেপোক্তির পার্থক্য দেখিয়া Hazlittএর কথায় বলিতে হয়, "of all poets, perhaps, he alone has portrayed the mental diseases—melancholy, delirium, lunacy—wilt such inexpressible, and in every respect definite truth, that the physi-

cian may enrich his observations from them in the same manner as from real cases."

সিরাজের সর্ব্বনাশের প্রধান উদ্যোগী যেমন জাফর ও জগৎশেঠ, মীরকাসিমের সর্ব্বনাশের তেমনি প্রধান উদ্যোগী ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট। বঙ্গবাসীর প্রতি হেষ্টিংশের তৎসাময়িক ব্যবহার নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট ও অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে আমরা এই সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত না করিয়া মেকলে সাহেবের উক্তিই উদ্ধৃত করিলাম, "The English Government resembled the government of Evil Genii, rather than the government of human tyrants." মেকলে সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, তৎসাময়িক ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ লোভের বশে এমন হীন ও নীচ কর্ম্ম নাই যাহা তাহারা করে নাই, এবং তাহাদের কদর্য্য ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া ক্লাইবের মত ব্যক্তিও বলিয়াছিলেন, "Alas ! how is the English name sunk ! I could not avoid paying the tribute of a few tears to the departed and lost fame of the British nation—irrecoverably so, I fear." বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে মীরকাসিমকে এই সকল ইতর প্রকৃতিসম্পন্ন ইংরাজের সহিত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল! এবং বঙ্গবাসীর ততোধিক দুর্ভাগ্য যে তাহারা এই নীচ ও ঘৃণ্য বণিককে সিংহাসন দিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। যাহারা ইংরাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নবাব মীরকাসিমের ও বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশে তৎপর হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ চিরবিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ ও গুরগিন প্রভৃতির উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছিল। পলাশীক্ষেত্রে যাহাদের দ্বারা ভীষণ পাপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সেই জাফর হইতে আরম্ভ করিয়া গুরগিনকে অবধি প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল, এখনও সে ভোগের অবসান হয় নাই; রাজবল্লভ ও রামনারায়ণ প্রভৃতির বংশধরগণকে অদ্যাবধি সে পাপের ফল ভোগ করিতে হইতেছে। এই জন্যই একদিন কাসিম ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিদেশীর পদানত হইয়া যে চিরদিন যাপন করিতে হইবে, ইহা কি কেহই মনে করে না। কেহ কি একবার ভাবিয়া দেখে না যে পুত্র পৌত্রেরা বিদেশীর গোলামী করিয়া জীবন যাপন করিবে, দীন প্রজারা

অন্নাভাবে মরিবে, শস্যশালিনী রত্নপ্রসূ বাঙ্গলা ছারখার হবে! ধিক ধিক—বাঙ্গলায় ধিক! বাঙ্গালীকে ধিক! স্বার্থে ধিক! হীনতায় শতধিক!! কে জানে এ হীনতার কোথায় পরিণাম।

সিরাজের হিতকারী ও বিশ্বাসী যেমন মীরমদন ও মোহনলাল, কাসিমও তেমনি আলী ইব্রাহিম ও তকীখাঁকে পাইয়াছিলেন। মীরমদনের ন্যায় তকীও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ইতিহাসানুযায়ী গিরিশবাবু তকীকে বীর, বিশ্বস্ত ও স্বদেশহিতৈষী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু, বঙ্কিমবাবু তকীখাঁকে লম্পট ও কাপুরুষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি যখন চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও সয়ের মতাক্ষরীন গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি", তখন বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কোনও 'জন্‌সন্' অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই যে তাঁহার অভিমত খণ্ডন করে! তবে, একথা আমরা বলিতে প্রস্তুত যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দলনী-প্রেমোন্মত্ত-তকী ও নবীনচন্দ্রের ভবানী-কন্যার নিমিত্ত উন্মাদ সিরাজ সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে যত বিলুপ্ত হয়, ততই সাহিত্যের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং দেশের মঙ্গল! কারণ, ঐতিহাসিক চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত করিলে সাহিত্যের যে পরিমাণ ক্ষতি, সমাজের পক্ষে ততোধিক ক্ষতি বলিয়া বিবেচিত হয়। চন্দ্রশেখরে তকী যে শুদ্ধ লম্পট রূপেই বর্ণিত হইয়াছে এমত নহে, কাসিমের হস্তে তাহার মৃত্যু অবধি ঘটিয়াছে।—বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের সিরাজ ও তকীর নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট মহা ঋণী।

সিরাজদ্দৌলায় কবি যেমন করিমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাতেও তেমনি দু' একটি নূতন সৃষ্টি আছে। আলী ইব্রাহিম কাসিমের বন্ধু ও স্বদেশের বন্ধু। এবং উদাসিনী তারা দেবদূতের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণ সাধনে রণে বনে ভ্রমণ করিয়াছে। কবির ইঙ্গিতে তারাকে ভবানীর কন্যা বলিয়া বোধ হয়। যেখানে নিরাশার বায়ু বহিয়াছে সেই খানেই আশার মোহিনী-মূরতি তারা আসিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছে। যেখানে কুচক্রী ও বিশ্বাসঘাতকগণ দলবদ্ধ হইয়া জন্মভূমির সর্ব্বনাশে সচেষ্ট হইয়াছে, সেই স্থানেই বহ্নিশিখার ন্যায় উদাসিনী ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া স্বদেশ-দ্রোহিতা পাপের যে ভীষণ পরিণাম তাহাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহাই তাহাদিগকে

দেখাইয়াছেন। আবার যেখানে আহত-সৈন্য মুমূর্ষু অবস্থায় নিমজ্জিত হইয়াছে, সেই স্থানেই করুণার প্রতিমূর্ত্তি উদাসিনী শত্রু মিত্র ভুলিয়া তাহাদের সেবায় নিযুক্তা হইয়াছেন এই উদাসিনীর উদ্দীপনায় মীরকাসিম স্বদেশের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে কাসিম সিরাজকে বন্দী করিবার সময় স্বদেশ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভাবে নাই, সে হঠাৎ একেবারে স্বদেশ-প্রেমিক হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত বোধ করিয়াই কবি যেন উদাসিনীর উদ্দীপনায় তাঁহাকে নিস্বার্থ দেশহিতৈষী করিয়াছেন। এ উদাসিনী কবির কল্পনা-প্রসূত হইলেও এই নাট্যকাব্যের ইহাতে কোনও ক্ষতি হয় নাই। কারণ, তিনি আপনাকে 'মৃত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; এবং ক্রিয়া-সঙ্গিনীর ন্যায় তাঁহাকেও যেন বলিতে শুনি,

"ছিলাম, রহিব জানে তো সকলে,
আছি কিনা আছি কে জানে।"

এই "আছি কিনা আছি কে জানে" কথাটা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি বটে; কিন্তু, এমন করিয়া বুঝাইতে পারে কে? সমগ্র জীবজগতের প্রতি চাহিয়া সকলেই ভূত ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাকুল; কিন্তু, বর্ত্তমানের 'আছি কিনা আছি কে জানে' এ বিষয় ভাবিবার অবকাশ লইয়া থাকে কয়জন?

এ পুস্তকের ইংরাজ চরিত্র সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষপাতশূন্যতাই যদি মহাকবির প্রকৃত গুণ হয়, তাহা হইলে, তাহার পরিচয় ইহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাঠকের অবগতির নিমিত্ত আমরা একস্থল মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার শেষ করিব। হেষ্টিংস ও ব্যাটসনে যখন তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, তখন আমিয়ট্ সাহেবের হত্যা সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌছিল। তাহাদের গৃহ-বিবাদ অন্তর্হিত হইল। সকলেই সমস্বরে "War—War—War!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাটসন বলিল, "Mr. Hastings, will you pardon me?"

হেষ্টিংস। "I give you my hands Mr. Batson and my heart with it."

এই অতি ক্ষুদ্র ঘটনায় নিরপেক্ষ ভাবে জাতীয়তার মহান্ চরিত্র দেখাইতে কয়জন সমর্থ! মীরকাসিম গিরিশচন্দ্রের অতুল কীর্ত্তি!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

অপ্রিয় সত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উন্নতচেতা বহুদর্শী সম্রাট আকবর অথবা নবাব আলিবর্দ্দীর কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য অনেক মুসলমান নরপতির রাজত্ব কালে হিন্দুরা যে যথেষ্ট নিগৃহীত হইত, একথা কি লেখক এখনও অস্বীকার করিবেন?* মুর্শীদ কুলিখাঁর কাট্‌রার মসজীদ নির্ম্মাণ ব্যাপার কি হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? কেহ কেহ বলেন যে, মসজিদ নির্ম্মাণ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মোরাদ স্বইচ্ছায় মন্দির গুলির ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, ইহার জন্য নবাব দায়ী নহেন। কিন্তু ইহাও জানা উচিত যে, নবাব উক্ত আদেশ না দিলেও তিনি যে ঐ সকল বিষয় অবগত হইয়াও মোরাদকে কিছু বলেন নাই ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্মদ্বেষিতার পরিচয়। ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরের মতে কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দিরের অভগ্ন অবস্থাই নবাবের নির্দ্দোষিতা এবং উক্ত মন্দির ভগ্ন ব্যাপারের অযৌক্তিকতার প্রমাণ। কিন্তু

---

* এ সময় এ বিষয়ের বহুল দৃষ্টান্ত দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর স্বরচিত ইতিবৃত্তে আপনার পুত্র খসরুর বিদ্রোহাচরণের গল্পে যাহা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে Major Prince এর তর্জ্জমাটি উদ্ধৃত করিলাম—"It now appeared that when Khossrow reached Muttra, which is one of the most venerated places of Hindu Worship (the Keblegah, in fact) Husson Beg the Badakhshany entered the town with a body of his troops, and proceeded to exercise upon the defenceless inhabitants every species of violence and outrage; forcing from every one all the money they could lay hands on, and otherwise perpetrating such acts of profligacy and barbarity that there remained no security for either sister, wife or daughter in the whole neighbourhood." ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

অপর একস্থলে আকবরসুত মুসলমান বাদসাহ নিম্নলিখিতরূপে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন—"A temple had been erected by Rajah Maun Sing which cost him the sum of nearly 36 laks of 5 meethkally ashrefies. It was the belief of these Jehennemetes that a dead Hindu...when laid before this idol would be restored to life. I made it my plea for throwing down the temple which was the scene of this imposture; and on the spot with the very same materials, I erected the great Mosque." ইত্যাদি।

আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী বঙ্গাধিকারী রাজগণের সহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু তীর্থ কিরীটেশ্বরীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় মোল্লাদের মত নীচ পদস্থ কর্ম্মচারী উহা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই।

হিন্দুগণ কর্ত্তৃক মুসলমান নিগ্রহের একটীও দৃষ্টান্ত লেখক খুঁজিয়া পান নাই, তবে উহা যে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে এই রূপ ভয় দেখাইয়া সারিয়াছেন। তিনি কি হিন্দু রাজা গণেশের (কংশ) উদার রাজ্য শাসন ভুলিয়া গিয়াছেন? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদ কি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত হয় নাই? যাহা হউক, লেখক কোন ঐতিহাসিক উদাহরণ না পাইলেও ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি তাঁহার সুন্দর মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা দেবীর সাহায্যে যে একটী উদাহরণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা এই—"হিন্দুগণ যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে শৃগাল কুকুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও হেয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র সম্পর্ক রাখাও অপবিত্র বিবেচনা করেন—পরধর্ম্ম বিদ্বেষের পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট অত্যাচার নহে?" না হয় স্বীকার করিলাম আপনাদের মতে অসত্য ও সত্য হইল এবং ইহা আমাদের ধর্ম্মদ্বেষিতার প্রমাণ; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়দিগের স্বলিখিত—"এমন কি মূর্ত্তি-পূজকদিগের সহিত মুসলমানের আলাপ পরিচয় ও আচার ব্যবহার করাও সম্পূর্ণ অনুচিত"—"যে উৎসবে হিন্দু ধর্ম্মের সংস্রব আছে সেরূপ উৎসবে মুসলমানের যোগ দেওয়া মহাপাতকের কথা"—এই উক্তি গুলির কিরূপে সমর্থন করিবেন? আপনাদের theory বিশ্বাস করিতে গেলে আপনাদের এই উক্তি গুলিও কি ধর্ম্মদ্বেষিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? লেখক বলেন যে, ইসলাম ধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টী নাই। হইতে পারে "একমেবাদ্বিতীয়ং" কিন্তু উহা উপযুক্ত প্রবন্ধাদির দ্বারা আমাদের না বুঝাইয়া দিলে আমরা বুঝিতে পারি কৈ? মুসলমান ধর্ম্মে আহারাদি এবং স্ত্রীপুরুষে বিবাহাদি লৌকিক আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে অনেক সুবিধা আছে। ইসলাম ধর্ম্ম কি ঐ senseএ উদার?

•আমি একবার 'কোহিনুর' পত্রিকায় 'সম্প্রীতি' নামীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"বেদ ও কোরাণ একই ঈশ্বর প্রণীত"। আমি অবশ্য এই উক্তির দ্বারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই, তবু সম্পাদক সাহেব ইসলামের উদার নীতির অনুসরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফুট নোটে টিপ্পনী

কাটিলেন—"বেদ অপৌরুষেয় হইতে পারে কিন্তু মুসলমানেরা তাহা স্বীকার করেন না।" একথাটা গায়ে পড়িয়া ঐ স্থানে না বলিলেই বরং ইসলাম ধর্ম্মের উদারতার কতকটা পরিচয় আমাদিগকে দেওয়া হইত। বেদ অপৌরুষেয় কি না সে বিষয় প্রমাণ করিয়া দিবার পক্ষে "কোহিনুর" উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়াই আমার কিল খাইয়া কিল চুরি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের মহানুভবতার কতকটা পরিচয় যে পাই নাই এমন নহে।

তাহার পর কৈফিয়তের উত্তরকারী আর কিছু উদাহরণ খুঁজিয়া না পাইয়া in a fit of frenzy বলিয়া উঠিয়াছেন যে, এখন হিন্দু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কল্যাণে সরকারী অফিসগুলি যেরূপ মুসলমান শূন্য হইয়া উঠিয়াছে তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে যদি হিন্দুরা এই দেশে রাজত্ব করিত তাহা হইলে মুসলমানগণকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্পেনের মুরদিগের মতই ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইতে হইত। এ উক্তি সত্য হউক মিথ্যা হউক কিন্তু লেখকের foresight এবং forethoughtএর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। লেখক কি Logical Reasoningsএর দ্বারা এইরূপ স্থির করিলেন, না তিনি একজন ভবিষ্যৎ রহস্যচেতা জ্যোতিষী পণ্ডিত? যাহা হউক তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, শিক্ষিত হইলে মুসলমান যে ইংরাজ সরকারের সর্ব্বত্রই বেশী সুবিধা (privilege) পাইয়া থাকেন একথা কি তিনি অস্বীকার করিয়া সত্যের অপলাপ করিতে চাহেন? তবে first deserve and then desire এই নীতির ব্যত্যয় করা ত আর হিন্দু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সাধ্য নহে।

যাহা হউক বাহুল্য ভয়ে অদ্য এই স্থানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে মুসলমানগণের মনে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না বা নাই। তবে নিষ্ঠুর ন্যায়ের খাতিরে আমায় যে কতকগুলি অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে, তাহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সহৃদয় মুসলমান সাহিত্যসেবিগণ যদি একটু ধীর বুদ্ধিতে এবং Unbiassed principleএর সহিত এই প্রবন্ধের সত্যাসত্যের বিষয় আলোচনা করেন,

তাহা হইলে তাঁহাদের অসন্তুষ্টির কোনই কারণ থাকিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। *

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পীত বস্ত্র পরি নারী দেহি আলিঙ্গন।
ধন জন সম্পদ জাএ না রহে জীবন ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান রজত ধরে অঙ্গে।
হেন নারী আলিঙ্গিলে লক্ষ্মী থাকে অঙ্গে (সঙ্গে ?) ॥
কোকিলা দেখএ আর পিঙ্গল কেশ নারী।
হেন স্বপন দেখিলে পীড়াএ জাএ ছাড়ি
রাহু গ্রহস্তে (গ্রস্তে) চন্দ্র সূর্য্য দেখে জেই জন।
বিদ্যাধর তুল্য পুত্র জন্মিব তখন ॥
ব্রাহ্মণে দেখএ যদি দেব পূজা করে।
দিব্য নারী পুষ্প লইআ আশীর্ব্বাদ করে ॥ ৫৫
হেন স্বপন পার্ব্বতি দেখিব ভালো জন
ব্যাস্যা (বেশ্যা ?) গৃহে বসি যদি করএ ভোজন ॥
নৌকা আরোহিআ যদি সমুদ্র তরণ।
* * *
এগলোকে সুখ ভোগ কথেক কহিব।
দাসকুলে জন্মান্তরে নরপতি হৈব ॥
অস্থি ভস্ম স্বপনে যদি করে পরশন।
শুক্ল বস্ত্র পৈরি যদি করএ গমন ॥
গৃহ শূন্য হএ তার ভার্য্যার মরণ।
অলক্ষ্মী হইব তার না জাএ খণ্ডন ॥ ৬০
শ্মশান উদ্দেশে যদি করএ গমন।
দেশেতে দুর্ভিক্ষ হএ লোকের মরণ ॥
ভূমিকম্প দেবকর্ম্ম স্বপ্নেতে দেখিব।
স্ত্রীএ দেখিলে পতি নিশ্চয়ে মরিব ॥

---

* এরূপ প্রবন্ধ অপ্রিয় হইবে বলিয়া আমরা ইহা মুদ্রিত করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না। কিন্তু ব্যাপারটি ক্রমশঃ এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা এ প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই মর্ম্মের প্রত্যুত্তর লিখিবার জন্য কেশববাবুকে তাঁহার অনেকগুলি হিন্দু ও মুসলমান লেখক অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিষয়টি অপ্রিয় বলিয়া এবং তাঁহার 'কৈফিয়তের' মত বিনয়পূর্ণ ও প্রসিদ্ধ মুসলমানদিগের মতপূর্ণ প্রবন্ধও সুফলপ্রসূ হইল না দেখিয়া তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকিতেই মনস্থ করিয়াছেন। সুতরাং 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম' নীতি বাক্যটীর অনুসরণ না করিয়া ইহা প্রকাশ করার নিমিত্ত আমরা সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি—এই স্থলেই এই বিষয়টির যবনিকা পড়িবে।—সম্পাদক।

পুরুষে দেখিলে পত্নী নিশ্চয়ে মরিব।
কুকুরে কামড়াইলে সেই ফল জাইব॥
রুধিরে বহএ নদী দেখে জেই জন।
রক্তে স্নান করি রক্তে করএ ভোজন॥
উদর ভরিআ তবে অঙ্গেত লাগিব।
প্রধান পুরুষ সেই ভূপতি হইবো॥
উন্মত্ত হইআ যদি করে মদ পান।
বেশ্যা গৃহেতে জাএ করিআ সন্ধান॥
বিষ্ঠা এ জে অঙ্গুলে করএ মূত্রপান।
সে নর পবিত্র বড় অতি বিলক্ষণ॥
আপনার হস্তে যদি ঔষধ করে পান।
সেই সব নর জান রাজার সমান॥
গোরস(?) দেখএ কিবা নতু কিবা খাএ
দিনে ২ তাহার জে শীরি (শ্রী ?) বাড়ি জাএ॥
জলউকা (জলৌকা) ধরএ কিবা বহুত সিঙ্গসে (?)।
উর্দ্ধ শরীরে ভয় পাইব বিশেষে॥
অশ্ব গজ মেষ বৃষ হংস বাহন।
বরাহ পক্ষী আরোহণ করে জেই জন॥
এই চারি স্বপন দেখি বীজ উচ্চারিব।
ভাগ্যবন্ত জন সেই শ্রীবৃদ্ধি হৈব॥
বৃক্ষ ভাঙ্গি পড়ে কিবা গর্ত্ত হোতে পড়ে।
ব্যাধিএ পীড়িত হইআ সেই জন মরে॥
কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পআর কৈল বসতি নবগ্রাম॥

গন্ধর্ব্ব (গর্দ্দভ ?) শিবা এ যদি করে আরোহণ।
রাজ অসুস্থ হএ কিবা নিমেষে মরণ॥
গুথনা বৃক্ষেত জেবা আউরো * হইআ বৈসে।
দুই তিন মাসে তার মরণ বিশেষে॥
চিতাকাষ্ঠ আরোহণ চিতাতে শয়ন।
তিন মা[illegible] জান তাহার মরণ॥
সমুদ্রের [illegible] পদ্ম পত্রেত বসিআ।
দধি পায়স খাএ আনন্দিত হইআ॥
তপন উদয়ে যদি এই স্বপন দেখিব।
দশ দিনে সেই নর ভূপতি হইবো॥
যুবতী দেখিলে পতি হৈব ভালো জন।
অবশ্য সম্পদ তার না জাএ খণ্ডন॥
পর নারী লইআ যদি স্বপ্নে করে কেলি
নানা সুখ হৈব তার বাড়ে ঠাকুরালী॥
কুঞ্জরে চড়িআ যদি শৈলাগ্রেতে উঠে।
সে নর নৃপতি হএ ভাগ্য নাহি টুটে॥
দেবগৃহে উঠে কিবা পর্ব্বতে আরোহণ।
ফল বিক্ষে (বৃক্ষে) উঠে কিবা হরষিত মন॥
নৌকা আরোহণ কিবা কবিলাস বাহে।
কিবা স্ত্রী পুরুষে দেখে অন্যথা না হএ
ভোজন করএ কিবা করএ রন্ধন।
অর্ঘগাতে (?) দিআ গৃহে করিএ গমন॥
বিষ পান করে কিবা কুট জন (?) দেখে।
সেই স্বপনে ধন পাএ শাস্ত্রে হেন লেখে।

---

* আউরো—আড়া আড়ি।

মূত্র পান অমৃত পান করে জেই নর।
সর্ব্ব দিন লক্ষ্মী দেবী থাকে তার ঘর ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু জনক জননী।
এই চারি ভালো জান দরশন পুনি ॥
ঘর দ্বারো হোতে জান বাহির হইব।
বিসম্বাদ বিনয় করিআ বুঝিব ॥
এই সব স্বপন জান সুচারু [illegible]ণ।
অর্থ পাএ সুখে থা[illegible], [illegible]ই
[illegible]হীজন ॥
দেবতা নাচএ কিবা পি (?) ধরাধরি।
সেই স্বপন দেখিলে জাএ স্থান পরিহরি।
করবী অশোক বিক্ষে (বৃক্ষে) স্বপ্নে
আরোহণ।
ফলাফল সনে যদি দেখে জেই জন(?) ॥
যশকীর্ত্তি বাড়ে তার প্রতি ধনে জন।
অপুত্রার পুত্র হএ শুন দিআ মন ॥
ধবল ছত্র দেখে কিবা ধবল বসন।
ধবল পুষ্প দেখে কিবা ধবল চন্দন ॥
ধবজ পতাকা দেখে হএ নৃপবর।
করিবর অশ্ব দেখে রাজছত্রধর ॥
গোধন দেখিব কিবা বিমান দেখিব।
ভাগ্যবন্ত হইবো সেই কুটুম্ব বাড়িব ॥
সুবর্ণ রজত যদি পাএ দরশন।
বহু ভালো হএ তাক* বাড়ে ধনে জন॥
ক্ষীর বর্ণ বিক্ষ (বৃক্ষ) যদি পাএ
দরশন।
ফলবন্ত বিক্ষ যদি করে আরোহণ ॥
স্বপ্ন দেখিআ যদি চৈতন্য পাইব।
ধন জন বাড়ে তার পুত্র লভ্য হৈব ॥

লাচারি।

দিব্য নারী গণ সঙ্গে,
চলি জাএ মনোরঙ্গে,
হেন স্বপন দেখে ভাগ্যবান।
হইবেক ভূপতি,
ধন রতন বহু অতি,
আউ (আয়ু) বৃদ্ধি হইব তাহার।
স্ত্রীএ দেখএ যদি,
হইবেক পুত্রবতী,
যশকীর্ত্তি হইব তাহার ॥
ভাগ্যবন্ত সেই হৈব,
হেন স্বপন জে দেখিব,
পূর্ণ কুম্ভ সনে দেখি নারী।
তাম্বুল লইআ করে,
ধর ২ যদি বোলে,
প্রদীপ দেখএ সারি ২ ॥
দেখে যদি শেষ রাত্রি,
অর্থলভ্য বহু অতি,
দিনে ২ পূরে মনস্কাম।
নিদ্রা জান ভঙ্গ হৈব,
গুরু বিপ্র স্থানে কৈব,
হেন স্বপন পূরাইব আশ ॥
পাইবেক নানা বিধি (নিধি ?)
তাহারে মিলাইব বিধি,
ধন জন সম্পদ অপার।
ভারত ভুবনে,
নর মধ্যে সেই জনে,
যশকীর্ত্তি বাড়িব অপার ॥

* তাক—তাহার।

নর মাংস যদি খাএ,
পাঁচশত মুদ্রা পাএ,
অসাধ্য করিতে পারে সাইধ্য (সাধ্য) ॥
দুই বাহু যদি খাএ,
সহস্রেক মুদ্রা পাএ,
সাফল জে আরাধিল বিধি ॥
পদ খাইলে হৈব পুণ্য,
মস্তক খাইলে হৈব শূন্য,
বুক্ষ (বক্ষ) খাইলে হইব মহাজন।
আরোহণ করে হর,
দুর হোতে আইসে ঘর,
নরলোকে সাফল জীবন।
স্বপ্নে যদি খেউর (ক্ষৌর) করে,
কিবা তার পুত্র মরে,
ব্যাধিএ পীড়িত সেই জন ॥
শিবলিঙ্গ দরশন,
প্রতিমা সে গঠন,
হেন স্বপন দেখিব মুরুতি (মুরতি)।
করে সেই নানা দান,
বঞ্চিবেক সন্মান,
শ্রীমন্ত পাইব সেই পতি ॥
পুরুষে দেখএ যদি,
হইবেক ভুপতি,
ধন জন বাড়িব অপার।
অস্ত্রে যদি অঙ্গ জরে (জড়ে ?),
যদি রাজ সৈন্য বেড়ে,
আপনার বাড়ি ঘর দ্বার ॥
নগর বেড়িআ যবে,
ধর ২ বোলে সবে,
হেন স্বপন দেখে জেই জন।
পাএ ভালো যুবতী,
নতু হএ ভূপতি,
রিপু শাসি হএ মহাজন ॥

পআর।

মহিষ বাহনে পুনি যদি পাএ ভয়।
হস্তী ভয় পাইলে পুনি রাজদণ্ড হএ ॥
দন্তে বিদারে পুনি শৃঙ্গে যদি পোরে(?)।
নিশ্চয়ে জানিয় তার ভ্রাতি* সব মরে ॥
দধি ঘৃত ঔষধ যদি পাএ দরশন।
ঐশ্বর্য্যমন্ত শ্রীমন্ত হইব সেই জন ॥
গোধন বাড়এ তার বাড়ে বুদ্ধি বল।
রাজকার্য্য থাকিব সেই জান ক্ষিতি-তল ॥
ধান্য দেখিলে হএ জ্ঞাতির নিধন।
সর্ব্বজ্ঞাতি নিবেদন করে তার স্থান ॥
বিবাহ দেখএ কিবা গৃহের বন্ধন।
সে দেশে মরএ কিবা তার এক জন
স্বপ্নে যদি গৃহো ভাঙ্গি অঙ্গেত পড়এ।
দূর হোতে জ্ঞাতি মরা বার্ত্তা জের আইসএ ॥
মহা বৃক্ষ অশ্বথ যদি হএ পাত।
তবে সে মরএ জান গ্রামের জে নাথ।
কাষ্ঠ কাটএ যদি স্বপ্নেতে দেখএ।
কিবা জ্ঞাতি পড়শী জে মরএ নিশ্চএ ॥
দোলা আর ঘোড়া যদি স্বপনেতে দেখিব।
অমঙ্গল চিহ্ন হেন মনেতে ভাবিব ॥

* ভ্রাতি—ভ্রাতা।

বিকৃত আকার নারী হএ দরশন।
তবে জান দেবতাএ রাখিল ভালো
জন ॥১২০
দিব্য নারী মনোমত অলঙ্কার পৈরি।
তাহার শিয়রে বৈসে অর্ঘ্য হাতে করি
সেই-জন হৈব জান সভার পরাণ।
সর্ব্বদিন সুখ জান সর্ব্বত্রে কল্যাণ॥
গর্দ্দভে চড়িআ যদি দক্ষিণে গমন।
কিবা তার ভ্রাতি বন্ধু পিতার মরণ॥
ওষ্টে (উষ্ট্রে) চড়িআ যদি করে
আলাপন।
স্ত্রীপুত্র মরে কিবা আপনা মরণ॥
রথে চড়ি জাএ কিবা জাইতে দেখিল
কুস্বপন দেখিল হেন মনেত ভাবিল॥
ভাঙ্গা থাল হাতে যদি জুগিনী
(যোগিনী ?) দেখিব।
রাজ্য নষ্ট হই পুনি অসুস্থ হইব॥
সূর্য্যমণ্ডল যদি স্বপ্নে দেখিব।
ধবং ধ থাকিলে জান তাহা শান্তি হৈব
ধ্বজ প।গ থাকিলে অর্থ পাইব নিশ্চয়ে।
সর্ব্বদাএ সুখী হইব সেই মহাশয়ে॥
শ্বেতবর্ণ সর্পে যদি অঙ্গেত ডংশিব।
ভূপতি হইব সেই অন্যথা না হৈব॥
কিবা বিছা জলউকা (জলৌকা) পাএ
দরশন।
স্বপ্নে দরশন হইলে অর্থ উপার্জ্জন ॥১৩০
খুকুরি কুকুরা (?) যদি হএ দরশন।
সুন্দরী দুহিতা হএ তাহার ভুবন॥
সরোবরো জলে যদি দামে আচ্ছাদিব।
হেন স্বপ্ন দেখিলে জে ঋণকর্ত্তা হৈব॥

ধবল জন যদি হএ দরশন।
ঋণ হোতে মুক্ত পাএ জ্ঞাতির ভাজন॥
গুখনা কাষ্ঠেতে যদি আইসে আর
জাএ।
যমদূতে আসি তারে নিত্য ২ চাহে॥
গুরু আর গুরুপত্নী সঙ্গে দরশন।
আউ (আয়ু) বাড়ে যশকীর্ত্তি হএ
সেই জন ॥ ১৩৫
নিজ নারী সঙ্গে যদি করে রস কেলি।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হৈব স্বপ্ন হেন বুলি॥
পট ঘঠ দূর্ব্বা দধি যদি স্বপ্ন দরশন।
গুরু স্থানে বিদ্যা পাএ হএ ভালো জন
শুক্ল পক্ষে ফল যদি বৃক্ষ হোতে পড়ে।
জনক জননী তার নিশ্চয়েতে মরে॥
স্বপ্নে যদি আঞ্চল পাতিআ লএ ফল।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা জন্মে তার ঘর॥
তণ্ডুল দেখএ কিবা কেহ লইআ জাএ।
যমদূতে আউ (আয়ু) তার মাপিআ
বুজাএ ॥ ১৪০
শৈলাগ্রে উঠিআ করে অভক্ষ ভক্ষণ।
ভূপতি হইব সেই রাজা যোগাএ ধন॥
এই সব স্বপ্ন দেখি নিদ্রা না জাইব।
নিদ্রা গেলে এই স্বপন বিফল হইব॥
স্বপন দেখিআ যদি উঠিআ বৈসএ।
হরি ২ বলিআ জে ভাবিব নিশ্চএ॥
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব।
বীজ উচ্চারিলে তবে ফলাফল হৈব॥
তোহ্মাতে কহিল স্বপ্নর কথন।
স্বপন দেখি কৈতে পারে মরণ
জীয়ন ॥ ১৪৫

"ইতি স্বপন অধ্যা(য়) পুস্তিকা সমাপ্ত। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখক নাস্তি দোসখেমঃ। স্বঅক্ষর শ্রীরাম—মাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘি তারিখ ৭ পৌস বেহান বেলা সমাপ্ত।"

আবদুল করিম।

দস্যু হস্তে।

(১)

সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই, যখন দেশ অরাজকতায় পূর্ণ ছিল, তখনও বঙ্গদেশের অনেকগুলি জেলায় ভদ্র ইতর প্রায় সকলেই লাঠি খেলিতে জানিত, সকলেরই দেহে খুব বল ছিল। তখন এখনকার মত স্বল্পদৃষ্টি, সূক্ষ্মদেহ, প্লীহা ভারাক্রান্ত লোকে দেশ পূর্ণ ছিল না। তখন দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়ার এত আধিপত্য ছিল না, দেশমধ্যে Dyspepsia প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন বিলাসিতার জন্য এখনকার মত এত প্রকারের পথযান ছিল না, তখন লোকে অক্লান্তভাবে দশ পনের ক্রোশ ভ্রমণ করিতে পারিত। সেই সময়ের একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা পাঠকবর্গের নিকট অবতরণা করিব।

সেই সময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিউড়ি হইতে ২।৪ ক্রোশের মধ্যে মাধবপুর নামে একখানি খণ্ডগ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান ও কয়েক ঘর ইতর শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল। এই গ্রামবাসীদিগের মধ্যে—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে—বেশ একটা ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হইত। গ্রামের শত্রুপক্ষ—অন্য গ্রামের জমিদার বা অপর কেহ শত চেষ্টা করিয়াও এই ভ্রাতৃভাব বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না। আধুনিক লোকের ন্যায় এই প্রদেশের লোকেরা এতটা স্বার্থান্ধ ছিল না। হিন্দুর দেবতা বিগ্রহাদিকে মুসলমান ভক্তি করিত এবং হিন্দুও মুসলমানের পীরের কাছে সিন্নি দিত। ফল কথা, তখনকার প্রায় প্রতি গ্রামেই হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে এক মায়ের দুই সন্তান, এক ঘরের দুই ভাই, এইরূপ বেশ একটা পবিত্র ভ্রাতৃভাব জাগরিত ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহে যে সময়ে লোকের ধন প্রাণ কিছুই নিরাপদ ছিল না, সেই সময়ে মাধবপুরের (শুধু মাধবপুরের কেন সমস্ত বঙ্গদেশের সমস্ত পল্লীতে) বেশ একটা "সাজ" "সাজ" সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লাঠি খেলা, তরবারি খেলা শিক্ষা করিতেছিল।

পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় আধুনিক বাঙ্গালী বীর শ্যামাকান্তের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তখন প্রতি গৃহে না হউক, প্রতি পল্লীতেও দুই একজন শ্যামাকান্ত পরিদৃষ্ট হইত।

মাধবপুরের মধ্যেও তখন কয়েকজন বেশ শক্তিশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রভূষণ অন্যতম। তাঁহারই জীবনের একটা ঘটনা এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইবে। চন্দ্রভূষণ একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন ও কার্য্যশেষে বাটী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। রেলে তাঁহার সহিত সরোজকুমার নামক একটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। সরোজকুমার নিরীহ প্রকৃতির লোক "গো বেচারী" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কলিকাতায় কোন সওদাগরী অফিসে কার্য্য করিতেন। তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি অতি কষ্টে আট দিনের ছুটী লইয়া বাটী যাইতেছিলেন। চন্দ্রভূষণের সহিত গাড়িতে তাঁহার আলাপ হয় এবং কথায় কথায় চন্দ্রভূষণের সহিত সরোজকুমারের বেশ একটী সম্প্রীতি জন্মিয়া গেল। পরিচয়ের আদান প্রদানের পর উভয়েই জানিলেন উভয়ের বাটী প্রায় কাছাকাছি। সরোজের বাটী তালপুকুরে, মাধবপুর হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধান মাত্র! * ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া উঠিল, সরোজকুমার চন্দ্রভূষণকে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিল। †

(২)

তাঁহারা যে ট্রেণে গমন করিতেছিলেন সেই ট্রেণখানি বৈকালে বেলা পাঁচটার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিল। চারি পাঁচ দিন পরে বাটী যাইতেছেন, সুতরাং

---

* তখনকার লোক ২।৪ ক্রোশ দূর পথকে আদৌ দূরত্ব জ্ঞান করিত না, একথার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বোধ হয় পাঠক পাঠিকাবর্গকে মাথা ঘামাইতে হইবে না।

† সহরবাসী সাধারণ লোকের প্রধান গুণ এই যে তিনি হয়ত বাটীর পার্শ্বস্থিত ব্যক্তির নাম জানেন না বা তাঁহার সহিত পরিচয় নাই। তিনি সহজে কাহারও সহিত মিশিতে পারেন না, বন্ধুবর্গের নিকট হৃদয় খুলিতে পারেন না। স্ত্রীপুত্র বেষ্টিত ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে সতত আবদ্ধ থাকিয়া দুঃসহ জীবন যাপন করেন। তখনকার পল্লীগ্রামের লোকের রীতি কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।—লেখক।

চন্দ্রভূষণের প্রাণ আমোদে উৎফুল্ল। কিন্তু সরোজকুমারকে যেন একটু বিষণ্ণ বোধ হইতে লাগিল। তিনি চন্দ্রভূষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দাদা, আজকের রাতটা ষ্টেশনে কাটাইয়া কাল সকালে বাড়ী গেলে হ'ত না?" চন্দ্রভূষণ হাসিয়া কহিলেন "কেন, এখানে থেকে কি হবে সরোজ? মোটেত আট দিনের ছুটী পেয়েছ, সেই আট দিনের একদিন পথেই রেখে যাবে। পাঁচ সাত ক্রোশ রাস্তা বৈ ত নয়, চলো দুজনে জোছনায় রাত্রে স্ফূর্ত্তি করে পাড়ি মেরে দি।"

সরোজ নব্য যুবক হইলেও বালক, সে অতসত বোঝে না, বলিল "দাদা, আজকে যেতে আমার মন যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে প্রায় তিন চার শ টাকার গহনা আছে!"

চন্দ্র। বটে! তাত এতক্ষণ আমাকে কিছু বল নাই। আরও কিছু আছে নাকি?

সরোজ। আর ত দেখতেই পাচ্ছেন, থান কত কাপড়, একখানা চেলী, সের পাঁচেক মিষ্টান্ন, সের দুই ছোলা, ইত্যাদি। পথে যে দস্যুর ভয়।

চন্দ্র। "হাঁ, তা বটে। কিন্তু এখানেই বা থাকবার আশ্রয় কোথা! উপস্থিত ষ্টেশনের যে অবস্থা তাহাতে কখন কার কি বিপদ ঘটে কে বল্‌তে পারে! মাঠের সহিত তুলনা করলে, এস্থান যে মাঠ অপেক্ষাও ভীষণ তা বুঝ্‌তে পারবে। এখন কি মনে কচ্ছ বল। যদি একান্ত যেতে না চাও, আমাকেও বাধ্য হয়ে তোমার সঙ্গে থাক্‌তে হবে। তোমাকে ত একেলা ছেড়ে দিয়ে আমি যেতে পারি না।" সরোজ নানাপ্রকার হাঁ—না করিয়া অগত্যা তখনই গমন করা স্থির করিল এবং কালবিলম্ব না করিয়া অনতিবিলম্বে যাত্রা করিল। একটা কাক বিকট কা কা রবে তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। একটা টিকটিকি পার্শ্বস্থ বটবৃক্ষের শাখার উপর হইতে "টিক্ টিক্ টিক্" করিয়া যেন বলিল "ধীরে, সরোজ ধীরে।" সরোজের হৃদয় একটু স্পন্দিত হইয়া উঠিল, সে কাতর ভাবে চন্দ্রভূষণের মুখের দিকে চাহিল। চন্দ্রভূষণ বলিল "ভয় কি!"

(৩)

সরোজ বলিল "দাদা একটা মুটে নিলে হয় না, ছয় ক্রোশ রাস্তা হাঁট্‌তে হবে, আর জানইত পথ ভ্রমণের সময় সামান্য একটা জিনিষ কত ভার বলে বোধ হয়।"

চন্দ্র। তোমরা সব উচ্ছন্নে গেছ। এই সামান্য সের আষ্টেক দশ জিনিষের জন্য মুটে নিতে হবে ? মুটে মানুষ, আমরা বুঝি মানুষ নহি !

সরোজ। না না, আমি তা বল্‌ছিনা, আপনারও ত জিনিষপত্র রয়েছে, দুজনের জিনিষত বড় অল্প ভারী হবে না !

চন্দ্রভূষণ। থাম হে থাম, কলিকাতায় গিয়ে একেবারে উচ্ছন্নে গেছ। তুমি বাবুটীর মত গায়ে ফুঁ লাগিয়ে যেও, আমি নিজে সমস্ত মোট বহিব !

চন্দ্রভূষণের বিদ্রূপোক্তিতে সরোজ আর বেশী কথা কহিতে পারিল না। সে সুবোধ বালকের মত চন্দ্রভূষণের কথাগুলি শুনিয়া লইল এবং চন্দ্রভূষণকে একমাত্র ভরসাস্থল জানিয়া নিরুত্তর রহিল। নচেৎ কলিকাতা প্রবাসী সভ্যতালোকে ঈষদ উদ্ভাসিত সরোজকে তর্কে পরাস্থ করা চন্দ্রভূষণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইত।

দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কখনও বা গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতে লাগিল। কথায় কথায় সরোজ জানিতে পারিল চন্দ্রভূষণও এক আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে কোন বিশেষ কার্য্যে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

সরোজ বলিল "দাদা তোমার বাড়ী মাধবপুর। ঐ গ্রামেই যে পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ। বল্‌তে পারেন ছেলেটী কেমন ?"

চন্দ্রভূষণ প্রত্যুত্তরে "হুঁ বলব এখন" বলিয়া কথাটা চাপিয়া লইলেন।

সকল লোকেরই ধারণা যে সে একটা মহা চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ; এ ধারণা না থাকিলে বোধ হয় লোকের মনে আদৌ শান্তি থাকিত না ! ইহা সকল দেশের সকল অবস্থার লোকেরই কথা। বলা বাহুল্য, সরোজেরও স্বীয় বুদ্ধিমত্তার উপর বিশেষ একটী আস্থা ছিল, পরন্তু সে দুই দিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়াই কলিকাতার দুমুঠা বালাম চাউল ও দুগেলাস কলের জল গলাধঃকরণ করিয়াই পল্লিগ্রামবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই এমন কি স্বীয় পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনকেও এক একটা বোকা অসভ্য বা মূর্খ প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিত। সুতরাং চন্দ্রভূষণের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মুখে মাত্র "হুঁ বল্‌ব এখন" কথাটী শুনিয়া সরোজ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে নাই, কেবল বুঝিয়াছিল চন্দ্রভূষণ তাহার কথার প্রত্যুত্তর দিল না। প্রত্যুৎপন্নমতি সরোজ তৎক্ষণাৎ ভাবিয়া লইল "পল্লিগ্রামের লোকেরা সব সময়েই বাজে কথা কয় এবং কাজের

কথার সময় মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে।" "হুঁ পরে বলব" এই কথা শুনিয়া সরোজ আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। কত অমঙ্গল আশঙ্কা, কত অভিনব চিন্তা তাহার হৃদয়টীকে অধিকার করিয়া বসিল। সে আর অন্য কোন কথা কহিল না।

(৪)

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চন্দ্রভূষণ কহিল—"রাত্রি প্রায় আটটা বেজেছে। চল সামনে ওই পুষ্করিণী আছে, ঐখানে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করে যাওয়া যাক্।" সরোজও তাহাই চাহিতেছিল। সে আর চলিতে পারিতে ছিল না, সে অবিলম্বে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

যখন তাহারা পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন কি একটা অজানা আশঙ্কায় উভয়ের হৃদয় কম্পিত হইল। তাহারা কতবার এই স্থানে আসিয়াছে, বসিয়াছে। কতবার পুষ্করিণীটির ভগ্ন ও জীর্ণশীর্ণ বাঁধা ঘাট দেখিয়াছে, কতবার ঘাটের দুই পার্শ্বস্থ বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ দেখিয়াছে, কিন্তু কখনও ত হৃদয় এরূপ বিচলিত হয় নাই!

এই বৃক্ষগুলি দিনের বেলাতেও পুষ্করিণীর ঘাটে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে দেয় না। দারুণ গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তপনতাপে দগ্ধ হইয়া এই পুষ্করিণীর ঘাটে যাও, প্রাণ শীতল হইবে। এই পুষ্করিণীটি কোন গ্রামের সীমানায় ছিল না। ইহা একখানি মাঠের পার্শ্বে এক আম্র কাননের মধ্যে ছিল। বাস্তবিক চন্দ্রভূষণ যে পুষ্করিণী ভাবিয়া ইহাতে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিল, ইহা সে পুষ্করিণী নহে! তবে কতকটা সেই পুষ্করিণীর আকৃতির অনুরূপ। হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া চন্দ্রভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাপড় ঝাড়িতে লাগিল। সরোজ কাপড় ঝাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় চন্দ্রভূষণ কহিল "বোধ হয় কাপড়ে পিপীড়া উঠেছে।" বাস্তবিক কথা কিন্তু তাহা নহে। চন্দ্রভূষণ জোছনা রাত্রে মাঠের মধ্যে পথ হারাইয়া ছিলেন, এবং পল্লীগ্রামের লোকের সংস্কার মতে কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু কেন যে তিনি এই সামান্য কথাটা সরোজের নিকট চাপিয়া গেলেন তাহার কারণ মীমাংসা পাঠক করিবেন।

সরোজ আসল কথা কিছুই জানিতে পারিল না।

* * * *

অনেক চিন্তা করিয়াও চন্দ্রভূষণ স্থির করিতে পারিল না যে, তিনি কোন্ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি অগত্যা সন্ধ্যাহ্নিকটা সেই

ঘাটের উপর সারিয়া লইতে মনস্থ করিলেন। তিনি জলে কতকটা নামিয়া গেলেন ও মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া জল লইয়া আচমন্ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা ভীমাকৃতি মসীবর্ণ লোকের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে লোকটা পুষ্করিণীর চারিধারে একটা "পলুই" * লইয়া মাছ ধরিতেছিল বা ধরিবার ভাণ করিতেছিল। লোকটাকে দেখিয়া চন্দ্রভূষণের মনে কি একটা সন্দেহ হইল। তিনি শীঘ্র আচমন্ প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং লোকটার উদ্দেশে ডাকিতে লাগিলেন "ওহে একবার এ ধারে শুনে যাও ত।" লোকটা প্রথম ডাকে কোন উত্তর দিল না, ভাব দেখাইতে লাগিল যেন কত নিবিষ্টচিত্তে স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত আছে। চন্দ্রভূষণ তাহাকে পুনরায় ডাকিল। লোকটা এইবার বলিল "কি মশাই, কারে ডাকছ?"

চন্দ্র। তোমায়।

লোকটা নিকটে আসিয়া বলিল "কি বলছ?"

চন্দ্রভূষণ বলিল "তুমি বল্‌তে পার, এ জায়গাটার নাম কি?"

লোক। তা জানিনা মশাই, এটা দখলপুরের মাঠ।

চন্দ্র। তোমার বাড়ী কোথা, কাছে ত কোন গ্রাম দেখি না।

লোক। এঁজ্ঞে আমার বাড়ী এখান হতে কোশ পাঁচেক তফাতে; একবার ইষ্টিশনে গেছলুম তাই ফেরবার সময় মনে কর্‌লুম গোটাকত মাছ ধরে নে যাই। এ পুকুরে খুব মাছ আছে বাবু মশাই।

চন্দ্র। আচ্ছা বল্‌তে পার এখান থেকে মাধবপুর কতদূর, আর কোন্ রাস্তায় যেতে হয়?

লোক। মশাইয়ের বাড়ী বুঝি মাধবপুরে? সে যে এখান থেকে ৭।৮ ক্রোশ দূর। এই পুকুরের উত্তর দিক দিয়ে মাঠে মাঠে যেতে হয়। মশাই বুঝি পথ হারিয়েছ?

চন্দ্র। না তা' নয়।

লোক। মশাইত ইষ্টিশন থেকে আসছ, তবে এ পথ দিয়ে এলে কেন?

---

* বর্দ্ধমান জেলায় ইহাকে খাঁচা কল, পেকে বলে। ইহা এক প্রকার মাছ ধরিবার কল, দেখিতে পাখীর খাঁচার মত কিন্তু ইহার নিম্ন দেশ খোলা এবং উপর দিকে একটু ফাঁক আছে। মাছের উপর এই কল চাপা দেওয়া হয় এবং ইহার উপরদিক হইতে হাত ভরিয়া মাছ ধরিয়া লওয়া হয়।

চন্দ্র। এই পথে একটু দরকার আছে তাই যাচ্ছি।

লোকটার সহিত আর কোন কথা না কহিয়া চন্দ্রভূষণ সরোজকে নিকটে ডাকিল।

সরোজ এতক্ষণ সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিল। সে নিকটে আসিলে চন্দ্রভূষণ তাহাকে কহিল—"তুমি না কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছ, এস একটু জলযোগ করা যাক্।" সরোজ এবং চন্দ্রভূষণ উভয়ে জলযোগ করিতে বসিল। চন্দ্রভূষণ চুপি চুপি সরোজকে কহিল "শীঘ্র খেয়ে লও, গতিক ভাল বুঝছি না।" সরোজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন, কি হয়েছে?"

চন্দ্র। কথা কহিও না, টুঁ শব্দ করিও না, চুপ করিয়া বসিয়া জলযোগ কর।

চন্দ্রভূষণের কথা শুনিয়া সরোজ বড়ই ভয় পাইল। চন্দ্রভূষণ কিন্তু আদৌ ভীত হয়েন নাই বলিয়া বোধ হইতেছিল। সম্মুখে মিষ্টান্ন রাখিয়া তিনি সেই পূর্ব্ব কথিত লোকটার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন লোকটা অদৃশ্য হইয়া গেল। তাই কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি সরোজকে বলিতেছিলেন "গতিক ভাল বুঝছি না।"

সরোজ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল "যদি গতিক ভাল না বোঝ তবে সরে পড়া যাক চল না কেন।"

কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রভূষণ কতক্ষণ চারিধার দেখিতে লাগিল ও পরে সরোজকে কহিল, "পাগল আর কি, পালাবে কোথা, আমাদের ঘেরেছে। তুমি ভয় করিও না, পুরুষ বাচ্ছা ভয় কি! তোমাকে আমি কোন কথা বল্‌তেম না সবই গোপনে রাখতেম্। কিন্তু কি জানি কি হয় বলাত যায় না। তুমি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে বলেই তোমাকে বল্‌লেম। দেখো ভয় কর না। একদিন ত মর্‌তেই হবে—দেখ্‌বো পাঁচটা বদমায়েসের মুণ্ডু নিয়ে মর্‌তে।"

সরোজ। এত লোক এসেছে না কি?

চন্দ্র। এতলোক কি বলছ, আমিত পনের জন লোক গুণেছি।

সরোজ। এঁ্যা বল কি—সরোজ আরও কি কথা বলিতে যাইতেছিল, চন্দ্রভূষণ একটা ফিস্ ফিস্ আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কহিল "চুপ্"।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

শিল্পাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী আর এক প্রকার যৌথ ব্যবসায়। এ প্রথার পাশ্চাত্যেই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় এবং অস্মদ্দেশে ইংরাজ বণিকদিগের বড় বড় কারখানার প্রায় অধিকাংশ গুলিই এই প্রথায় কার্য্য করিয়া থাকে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীদিগের সম্পদের ইহা একটি প্রধান কারণ।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর প্রথা সম্যকরূপে বুঝাইবার স্থান ইহা নহে। মোটামুটি ইহার প্রথা শিক্ষিত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রথমতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ ঈপ্সিত ব্যবসায়ে কত মূলধন আবশ্যক হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া লইয়া সেই অর্থের সংখ্যাটী একটি নির্দ্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া লন। প্রত্যেক ভাগটিকে মূলধনের এক একটি সেয়ার বা ভাগ বলা হইয়া থাকে। তাহার পর ঐ সেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়। যে সকল ব্যক্তি আপনাপন যোগ্যতা অনুসারে ঐ সকল সেয়ার ক্রয় করে তাহারাই এই যৌথ কারবারের বখরাদার ধনী।

মনে করুন ৫ জন বা ৭ জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটি বস্ত্র-বয়নাগার প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে হিসাব করিয়া দেখিলেন পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা মূলধন থাকিলে একটি লাভপ্রদ ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে। যাহাতে সাধারণেও ইহার সেয়ার ক্রয় করিতে পারে সেই উদ্দেশে তাঁহারা ১০০৲ টাকার মূল্যের পাঁচশত সেয়ারে ইহার মূলধনকে বিভক্ত করিলেন। যিনিই একশত টাকা ব্যয় করিয়া ইহার একটি সেয়ার ক্রয় করিবেন তিনি ইহার লাভের পাঁচশত ভাগের এক ভাগের অধিকারী হইবেন। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হইলে কিন্তু ঐ পাঁচশত বখরাদারকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় না। সাধারণ বখরাদারী ব্যবসায় যেমন বখরাদারের শেষ কপর্দ্দকটির উপর অবধি ব্যবসায়ের পাওনাদারের দাবী থাকে এ প্রথায় ব্যবসায়ের আস্‌বাব প্রভৃতি ভিন্ন সেয়ার ক্রেতাদিগের নিকট কেহ কিছু দাবী করিতে পারে না। সুতরাং যাহারা স্বয়ং ব্যবসায় তত্ত্বাবধারণ করিতে অক্ষম অথবা কর্ম্মচারিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইতে অনিচ্ছুক তাহারা ইহাতে

অর্থ খাটাইতে পারে। যদি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে যে অর্থ সেয়ার ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিক লোকসান হইবে না, ইহা জানিলেও অনেকে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করিবার আশায় অর্থ খাটাইতে পারে।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির সেয়ারের অপর আরও সুবিধা আছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভ হইতেই যাহারা সেয়ার খরিদ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহাদিগকে সমস্ত টাকা একেবারে দিতে হয় না। কারবার যেমন ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদেরও সেইরূপ তিন কিম্বা চারিবারে সেয়ারের মূল্য প্রদান করিতে হয়। তাহার পর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কোম্পানির কাগজের মত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির সেয়ার বিক্রীত হইতে পারে। সেয়ারের যখন যে অধিস্বামী হইবে তখনই সে তজ্জনিত উপকারিতা উপভোগ করিবে। তখন সেই কারবারের অবস্থার উপর সেই সকল সেয়ারেরও মূল্যাদি নির্ভর করে। মনে করুন কোম্পানির কাগজ কিনিয়া সঞ্চিত অর্থ খাটাইলে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদ পাওয়া যায়। কোনও কারবারের একশত টাকার সেয়ার-হোলডার যদি বৎসরে ৭৲ টাকা লাভ পায় তাহা হইলে ১৮০৲ টাকা দিয়া ঐ ব্যবসায়ের সেয়ার কিনিলেও কোম্পানির কাগজের অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যায়। তখন ঐ ব্যবসায়ের সেয়ারের দাম অধিক হয়। আবার উক্ত ব্যবসায়ে যদি শতকরা ২৲ টাকা লাভ পাওয়া যায় তাহা হইলে ১০০৲ টাকা মূল্যের সেয়ার ৫০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিতেও লোকে কুণ্ঠিত হইবে।

প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির সেয়ারের টাকা তিন চারি দফায় দিতে হয় বলিয়া সাধারণ লোকে ইহার উপকারিতা অধিক ভোগ করিতে পারে। যাহারা একেবারে একশত টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে না তাহারা অনেকে সাংসারিক ব্যয়ের হিসাবে চারি মাসে একশত টাকার কোম্পানির সেয়ার কিনিতে পারে। সেয়ার না কিনিলে তাহারা কখনও একশত টাকা সঞ্চিত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। সাধারণ লোকের হৃদয়ে উপস্থিত ভোগ করিবার বাসনা বড়ই বলবতী। অর্থ সঞ্চয় করিতে হইলে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য যে উপস্থিত সুখটুকু পরিত্যাগ করিতে হয় কিন্তু অনেকে সেই সুখটুকু হইতে বিরত হইতে কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং এই প্রথার আশীর্ব্বাদে পাশ্চাত্য প্রদেশে অনেক মধ্যবিত্ত লোক

মাসে মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে সক্ষম হয়। অস্মদ্দেশে এ প্রথায় অনেক সুফল ফলিবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ঐরূপে পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রার পাঁচশত সেয়ার বিলী হইবার পর সেয়ার হোল্ডারগণ (সেয়ার ক্রেতাগণ) সমবেত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে পাঁচ সাতজন ডাইরেক্টার নিযুক্ত করেন। সমস্ত কারবারের ভার এই ডাইরেক্টর সভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহার ঐ বস্ত্র-বয়ন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে তাহাকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে ব্যবসায়টি সুন্দররূপে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার সমস্ত কার্য্য প্রকাশ্য ভাবে হইয়া থাকে। ডাইরেক্টারগণ ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী প্রকাশ করিতে বাধ্য। ইহাতে সেয়ার হোল্ডারগণ কারবার সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব পত্রাদি পরিদর্শন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় এবং যদি কোথাও কোনও ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে।

সুতরাং উপরে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির প্রথায় চালিত যৌথ কারবারের নিম্নলিখিত উপকারিতা আছে।

(১) ইহা দ্বারা কল কব্জা ব্যবহার হইতে পারে এরূপ বৃহদায়তনের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

(২) যে সকল ব্যক্তি সময় বা সামর্থ্যের অভাব কিম্বা অপরাপর কারণ বশতঃ কোনও ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে অনিচ্ছুক, এ প্রথায় তাহাদের সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

(৩) অনেক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি এ প্রথায় অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।

(৪) কতকগুলি ব্যবসায় এরূপ আয়তনের হওয়া উচিত যাহা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি ব্যতীত অপর ধনী দ্বারা পরিচালিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, প্রভৃতির মত বৃহৎ ব্যাপার কয়জনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

(৫) ইহার হিসাব প্রভৃতি প্রকাশ্য বলিয়া অনেক ব্যবসায় এরূপ আছে যাহা এ প্রথা ব্যতীত অপর প্রণালীতে সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রভৃতির কার্য্য সাধারণের বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ সাধারণের গচ্ছিত অর্থ লইয়া কি করিতেছে, ব্যাঙ্কে কত টাকা মজুদ আছে প্রভৃতি সংবাদ যদি সাধারণের

অগোচরে রাখেন তাহা হইলে কেহই বোধ হয় তাহাদিগের নিকট আপন সঞ্চিত অর্থ রক্ষা করিবে না।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির এইরূপ নানা উপকারিতা আছে। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে সাধারণতঃ কতকগুলি অন্তরায় পরিদৃষ্ট হয়। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মকর্ত্তা বা ডাইরেক্টরদিগের সততা ও কার্য্যক্ষমতার উপরেই জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির জীবন নির্ভর করে; যে দেশে লোকের পরস্পরের উপর বিশ্বাস কম, যেথায় যাহার হস্তে সাধারণের অর্থ পড়ে সেই তদ্দ্বারা স্বকীয় উদর পূর্ণ করিতে মনস্থ হয়েন; যে দেশের লোক কোনও কার্য্যের অন্তঃসার অপেক্ষা তাহার বাহ্যিক চাকচিক্যে আত্মহারা হইয়া যায়, সে দেশে এ প্রথায় ব্যবসা করা কতদূর সম্ভবপর, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশের লোকের দ্বারা এ ব্যবসায় ঠিক চলিত না। কিন্তু বোধ হয় আমাদের সময় ফিরিয়াছে, দেশের অনেক কৃতবিদ্য লোক ছোট ছোট সদ্যপ্রসূত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির ডাইরেক্টার হইতেছেন। * ইহা দ্বারা ষোল আনা সুফল না ফলিলেও অসাধুতার হস্ত হইতে যে সাধারণে রক্ষা পাইবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্যবসা করা অধুনা আমাদিগের পক্ষে নূতন ব্যাপার। সুতরাং ব্যবসা নীতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রথমতঃ যে আমরা সম্পূর্ণ লাভবান হইতে পারিব না তাহা আমার বিশ্বাস। কিন্তু ইহা হইতে ভবিষ্যতে যে দেশের মঙ্গল হইবে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রসিদ্ধ জাপানী বীর ইউরোপ প্রদক্ষিণ করিয়া টোকিওতে আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন আমিও তাহাই বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়া দিই—পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হইতে গেলে তাহাদের অস্ত্র সরঞ্জাম, তাহাদের কার্য্য প্রণালী না গ্রহণ করিলে প্রাচ্যের উন্নতির আশা অল্প।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

---

* বাঙ্গালী প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল রেলওয়ে, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে ছোট কোম্পানির মধ্যে কলিকাতা উইভিং কোম্পানি ও বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস্ অনেকগুলি শিক্ষিত ভদ্র লোকের দ্বারা স্থাপিত। শেষোক্ত কোম্পানি দুইটির কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ভগবান

কল্পনার প্রতি।

হায়, কোথা অবসর মোর দেববালা,
একমনে তোমায় সাধিব,
নিঝুম বিরল গেহে লভিয়ে নিরালা,
বসে বসে কবিতা লিখিব।

নিভাইতে চাহি আমি কিছুতে নিভে না,
তীব্র তপ্ত অশান্তি অনল,
জীবনের রণশেষ কভু যে হ'বে না,
লভি' শান্তি আসার বিমল!

দেখি যে উষার ভালে ফোটে নব রবি,
শুনি বনে বিহগ কূজন,
গিরিকুঞ্জে কি সুন্দর প্রকৃতির ছবি,
বিমোহিত করে প্রাণ মন।

মোর তৃষাতুর চিত্ত উন্মত্ত অধীর,
ভাবি সদা ভাবে মজে রই,
ওই রূপ সোমরস প্রখর মদির,
পান করি' আত্মহারা হই।

দৃষ্টিশ্রান্ত চক্ষে মোর কত মধুরিমা,
প্রতারিয়া অলক্ষ্যে লুকায়;
বসন্তের নবদেহে কুসুম কান্তিমা,
ঢেকে মুখ হেসে চলে যায়।

বহে ঘর্ম্ম মৃদু মৃদু ললাট বহিয়ে,
মুছি যবে হইয়ে বিফল,
কোকিল গলায় শুনি দূরে সাড়া দিয়ে,
তেয়াগিয়ে আম্র ছায়াতল।

নব বরষার ধারা অমল শীতল—
শ্যামশষ্পে শোভিতা ধরণী,
মেঘের বিচিত্র রঙে বিমান উজল,
আমি রহি ভুলিয়ে লেখনী।

নাহি অবকাশ!—তবু ক্ষীণ অবকাশে,
ধাই ছুটে সকাশে তোমার,
হৃদয় আতুর, তবুও ঐ দেববাসে
পশিবারে করে হাহাকার।

ঘুচাইয়ে দাও এই কর্ম্মের বন্ধন,
হে ত্রিদিব-বাসিনি কল্পনা!
দেখিছ হৃদয় মোর অধীর এমন,
তবু কেন বুঝিয়া বুঝ না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত কারখানা গুলির উন্নতি সাধন করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। নবপ্রসূত ন্যাসনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিকেও আমরা সাদরে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করি।—লেখক।

বাঙ্গালা নাটকে চরিত্র বিকাশ।

সাহিত্য জগতে নাটকের স্থান বড় উচ্চে। নাটক, বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের ঘটনাবর্ত্তে উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে। নাটক শুদ্ধ শ্রাব্য কাব্য নহে, তাহা দৃশ্য কাব্য। প্রত্যক্ষীভূত কোন ঘটনা হৃদয়পটে যেরূপ অঙ্কিত হয়, শুদ্ধ শ্রবণে সেরূপ সম্ভবে না। স্বতঃই শ্রবণ অপেক্ষা দর্শনে মানবের বিশ্বাস সমধিক। এক খানি নাটকের অভিনয় দেখিলে, তাহার সমাবেশ ও স্মৃতি আজীবন মানসপটে জাগরূক থাকে।

আবার সত্যের প্রতি মানবের আস্থা স্বতঃ। কোন বস্তু কৃত্রিমতা-দুষ্ট হইলে মানবের মন সহজে তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। মানব হৃদয় মিথ্যায় মুগ্ধ হয় না। কৃত্রিম সুরে হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তেমন বাজে না। নাটকে প্রকৃত চরিত্র অঙ্কিত না হইলে তাহা নাটক পদবাচ্য হয় না। নাটকের উদ্দেশ্য তাহাতে সফল হয় না। প্রকৃত নাটকে প্রকৃত চরিত্র চাই, ঘটনাস্থলে তাহার বিকাশ দ্বারা অন্তরে আঘাত করান চাই। সুকুমার বঙ্গসাহিত্যে এই প্রধান অঙ্গটী কতদূর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক কয়খানি বাঙ্গালা নাটকে আমরা কবির অতুল কৃতিত্ব দেখিতে পাই। সত্যের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মান কতকগুলি চরিত্র বাঙ্গালীর মন আন্দোলিত করিয়া অক্ষয় শিক্ষা দিতেছে। প্রেম মানব প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। এই বৃত্তিবীজে কত মরুভূম হৃদয় শ্যামশস্যে সুশোভিত হয়, সুগন্ধ পুষ্পে সুরভিত হয়। এই সত্য বাঙ্গালীর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁহার অমানুষী প্রতিভাবলে কি জলন্ত ভাবে লোক সমক্ষে অঙ্কিত করিয়াছেন!

বারাঙ্গনাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যুবক বিল্বমঙ্গল, প্রেমের রম্য উপবন বোধে বারাঙ্গনা চরণে ভ্রমে আপনাকে বলি দিয়াছিলেন, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্ক মাথার মণি করিয়াছিলেন। সুন্দর বোধে আপনার অস্তিত্ব তাহাতে মিশাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যবধানে প্রবল নদী, আকাশে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত, সহজে যাইবার উপায় নাই, তটে দাঁড়াইয়া প্রিয়াবিরহবিধুর

বিল্বমঙ্গল ভাবিতেছেন "প্রাণ! তোরে আমি তুচ্ছ কত্তুম, কিন্তু যে চিন্তামণিকে দেখ্‌তে পাব না—উঃ কি করি, তারও প্রাণ এমনি হচ্ছে, সে স্ত্রীলোক কি করবে।"

প্রিয়ার যাতনা সে মর্ম্মে অনুভব করিল—রণমুখী নদী আর তাহাকে বাধা দিতে পারিল না।

বিল্বমঙ্গলের হৃদয়মূলে আত্মত্যাগের এই বীজ নিহিত ছিল বলিয়াই একদিন তিনি বিষ্ণুপাদ পদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। কাঞ্চন কুস্থানে পড়িলেও তাহা কাঞ্চনই থাকে। পরের পদতলে একবার আপনাকে বলি দিলে মানব আর কখনও আপনাকে ফিরাইয়া লইতে চায় না, আত্মপূজা আর তাহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে না। যখন তাহার এ ভুল ভাঙ্গিয়া গেল তখন অসত্যের নগ্ন বীভৎস দেহ দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন "চিন্তামণি! বোধ হয় তুমি কখনও কাহাকেও প্রাণ দাও নাই, তাহলে বুঝ্‌তে প্রাণ অতি তুচ্ছ।" পরক্ষণে তাঁহার অতৃপ্ত হৃদয় বলিয়া উঠিল :—

"কোথায় সে প্রেমের পাথার
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যায় হবে লয়।"

প্রকৃত প্রেমবীজের কি সুন্দর বিকাশ!

"হারানিধির" মিত্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড মোহিনী চরিত্রে ও "মুকুল মুঞ্জরার" অসম্পূর্ণ সৃষ্ট মুকুলের চরিত্রেও এই সত্যের প্রতিপন্নতা অতি সুকৌশলে সংসাধিত হইয়াছে। মোহিনী সর্ব্বদোষের আধার হইলেও কন্যাস্নেহে আপনাকে বলি দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ন্যায় ভয়ানক চরিত্রের পরিণাম শুভ হইয়াছিল। আর প্রেমের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অসাধারণ ক্ষমতা, বিবেকহীন মুকুলের "ভালবাসি বলতে নেই" এই কথায় যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা আর কুত্রাপি সম্ভবে না।

আবার এই বৃত্তির অভাবে মানব যে কতদূর দানব হইতে পারে তাহাও "প্রফুল্ল" নাটকে রমেশের চরিত্রে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাহার চরিত্র বীজ তিনি জ্ঞানদার মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন "রামায়ণে শুনেছিলাম যে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাকতো, স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেচে? এ কারণ নয়।"

এই মহা স্বার্থপর হৃদয়ের পরিণাম কত ভয়ঙ্কর তাহা নিতান্ত নির্ব্বিকার হৃদয়ে অনাহারে শিশু হত্যা করিতে প্রয়াস করাইয়া কবি চূড়ান্ত উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

দুর্ব্বল ভিত্তি মূলে অতি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেও তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। তেমনই চরিত্র মূল দুর্ব্বল রাখিয়া তাহার যতই উৎকর্ষ সাধিত হউক না কেন, ফল বড় শোচনীয় হইয়া থাকে। "প্রফুল্ল" নাটকে যোগেশের পদস্খলন ও বলিদানে করুণাময়ের আত্মহত্যা ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। দুর্ব্বল প্রকৃতি উদ্ভূত শোক লজ্জা ভয়ই তাহাদের সর্ব্ব গুণ সত্বেও সর্ব্বনাশ সাধিত করিয়াছিল। আরও বহু চরিত্রে বহু সত্য অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে সকলের আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব।

বাণীর কৃতী পুত্র রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "রাজা ও রাণী" নাটকে চরিত্র বিকাশে অক্ষয় কীর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিভিন্ন হৃদয় প্রবাহিত প্রেম প্রবাহের বিভিন্ন গতি ও তাহার পরিণাম "রাজা ও রাণীতে" বড় সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা রাজা বিক্রমদেবের চরিত্র যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা অতি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন "বিক্রমদেব রাজা হইলেও তাহার প্রকৃতি অনেকটা দুর্দ্দমনীয় বালক প্রকৃতির মত। ইনি প্রেমিক কিন্তু ইহার প্রেম স্বাধীন নহে, তাহা জগৎ বিচরণক্ষম নহে, প্রশান্ত নহে, কেবল মহা সমুদ্রের মত আপন হৃদয়ে ভীষণ তরঙ্গায়িত। তাহার সর্ব্বগ্রাহী আকাঙ্ক্ষা রাহুর মত রাণীর হৃদয় রাকার দিকে ধাবিত, প্রবাহিত। প্রজা উৎপীড়িত, রাজ্য শত্রুহস্তগত, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, রাণী তাহাকে যুদ্ধ করিতে যাইতে বলিলে রাজা বলিতেছেন:—

"ভীম যুদ্ধে যাব আমি, কিন্তু তার আগে
তুমি মান অধীনতা, তুমি দাও ধরা,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসারের কার্য্য,
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল
তবেই ফুরাবে কাজ, তৃপ্ত মন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে!
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যত দিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট সম রব তব সাথে!"

একটী বেগবান হৃদয়ের গতি কিরূপ, কবি বিক্রম চরিত্রে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন*। এ হৃদয় ষোল আনা চাহে তাহার একটী রশ্মি অন্যত্র পতিত

* সাহিত্য ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা।

হয় সহ্য করিতে পারে না। তাই দেশের শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়াও বন্ধু দেব দত্তকে বলিয়াছেন "যোগাসনে লীন যোগীবর তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রণয়?" ত্রিচুরের উদ্যানে বসন্ত ব্রততীর মত নম্র ইলার মূর্ত্তি দেখিয়া রাজার উক্তি—

"একি অপরূপ মূর্ত্তি! চরিতার্থ আমি!
উঠ উঠ—হে সুন্দরি! তব পদ স্পর্শে
যোগ্য নহে এ ধরণী।
তুমি কেন ধূলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমায়?"

তাহার চরিত্র আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে। এখানে তাহার অসহিষ্ণু প্রেম বিহ্বল হৃদয় আত্মবিস্মৃত বালকের ন্যায় সম্মুখে প্রেমের ছবি দেখিয়া মনের আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিতেছে।

সরলা বালিকা ইলাতে কবি বড় সুন্দর প্রেমের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বালিকার প্রেম যেমনই অসীম তাহার বলও অসাধারণ। দুর্ব্বলা বালিকা, কুমার বিপন্ন জানিয়া, বিক্রমদেবকে বলিয়াছিলেন

"তবে পথ বলে দাও অবলা রমণী
আমি, তার তরে সঁপিব জীবন একা।"

বাস্তবিক এই চিত্র দর্শনের পর হইতেই রাজা স্বীয় প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল গতি সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতিভাবান কবি ইহার পর হইতেই তাহার হৃদয় প্রবাহ অন্য পথে চালিত করিয়াছেন। এই শিক্ষার পর রাণীর মৃত্যু দেখিয়াও সংযত হৃদয় প্রেমিক বলিয়াছিলেন:—

"একান্ত অযোগ্য আমি প্রেমের তোমার
তা'বলে কি মার্জ্জনাও করিলে না দেবি!"

কুমার সেন ও সুমিত্রা আদর্শ চরিত্র। ইহাদের হৃদয়ে কোমল ও কাঠিন্যের সুন্দর সম্মিলন। ইহারা প্রেমপ্রবণ হইয়াও আত্ম বিস্মৃত নহেন। প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াও কোথাও আত্মহত্যা করেন নাই বা কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। অবস্থা বিপর্য্যয়েও সর্ব্ব সময়ে কবি তাহাদের এই চরিত্রের সামঞ্জস্য আদ্যোপান্ত সুরক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীউমাচরণ ধর।

দস্যু হস্তে।

(৫)

চন্দ্রভূষণ শুনিল কে দুইজনে বলাবলি করিতেছে "তুই ত দেখিছিস্ আর কথাও কয়েছিস্, বেটার চেহারা কেমন, জোয়ান বটে কি ?"

"আরে রাম! শালা একটা পাকাটীর মত তালপাতার সেপাই। আমি একলাই দুবেটাকে সাবড়াতে পারি।"

কথা শুনিয়া ভয়ে সরোজের মুখ শুখাইয়া গেল।

নিমেষমধ্যে দুইজন লোক আসিয়া চন্দ্রভূষণ ও সরোজের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ও অতি কর্কশ কণ্ঠে কহিল "কোন্ শালারে তোরা ?"

চন্দ্রভূষণ কহিল—"কেন বাপু মিছে গালাগালি দাও, তোমাদের ত আমরা কিছু দোষ করিনি।"

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল "কর্‌বি আবার কিরে শালারা, কোথায় কি আছে বার কর, আর মাথাটী রেখে যা।"

চন্দ্র। ওরে বেটারা তোরা লেঠেল বটে! আচ্ছা তোরা একটু সবুর কর আমরা খাবারটা খেয়েনি।

দ্বিতীয় দস্যু তখন বলিল—"থাম থাম বেটারা যমের বাড়ী গিয়ে খাবি, এই বলিয়া নিজের হস্তস্থিত লাঠি সজোরে ধরিল।"

চন্দ্রভূষণ দস্যুর উদ্দেশে কহিল—"করিস্ কি! জীবন ত এই রকম মানুষ মেরেই কাটালি, আমাদেরও ত মারবি—কিন্তু দেখ আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোরাও হিন্দু,মরবার সময় শান্তিতে জলযোগটা ভাল করে কর্‌তে দে।"কোথা হইতে আর দুইটা দস্যু আসিয়া প্রথম দুই জনের সহিত মিলিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "আচ্ছা, দে বেটাকে খেতেই দে, বেটা খেয়েই নিক্ না কিন্তু দেখিস কাজ হাসিল কর্‌তে দেরী না হয়।"

চন্দ্র। তো বেটাদের রকম দেখে আমার ত আশ্চর্য্য লেগেছে। মার্‌বি ত দুটী পুঁটী মাছের প্রাণ—দুটো রোগা রোগা ছোঁড়াকে, তার জন্ত এত আয়োজন কেন—দশ পঁচিশ জনের দরকার কি, একেলা হলেই ত যথেষ্ট হ'ত।

দস্যু। লে লে বেটা শীঘ্র খেয়ে লে, বেশী বকিস্‌নি, নইলে এক ঘায়েই

সাবড়ে দেব, খাওয়া দাওয়া শিকেয় তুলতে হবে। কি কি আছে শীঘ্র বার কর।

চন্দ্র। আমাদের যা আছে তাত তোরাই নিবি, বলাকলির কুটুম্বিতার দরকার কি।

চন্দ্রভূষণ তখনও স্মিতবদন। সে অম্লান বদনে টপ্‌টপ্‌ করিয়া রসগোল্লা গুলো মুখে দিতেছে। সরোজ কিন্তু ভয়ে ঠক ঠক কাঁপিতেছিল, সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়াও যে চন্দ্রভূষণ স্মিতবদনে আহার করিতে পারে ইহা ভাবিয়া সে কতটা বিস্মিত হইতেছিল ও চন্দ্রভূষণকে একটি আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিতেছিল।

চন্দ্রভূষণ প্রায় সমস্ত—প্রায় পাঁচ ছয় সের—মিষ্টান্ন উদরসাৎ করিল। সরোজকেও দুই একটী খাইবার জন্য অনুরোধ করিলে সে বলিল যে সে কিছু মাত্র মুখে দিতে পারিবে না। ভয়ে সে অজ্ঞান প্রায়। চন্দ্রভূষণ তৎপরে অন্যান্য পুটুলিতে কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে কিনা অন্বেষণ করিতে করিতে কতকগুলি ছোলা দেখিতে পাইল।

প্রথম দস্যু তখন বজ্রমুষ্টিতে চন্দ্রভূষণের হাত ধরিয়া কহিল—চলে আয় বেটা আর গেলা রাখ।

চন্দ্রভূষণ সজোরে দস্যু হস্ত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া অতি শান্তভাবে কহিল—"হ্যাঁরে এইবার হয়েছে একটু জল খেয়েনি।" এই বলিয়া পুষ্করিণীতে এক পৈঠা অবতরণ করিল। জলযোগ করিবার সময় কতকগুলি ছোলা সে পুটুলি হইতে খুলিয়া লইয়া কাপড়ে এমন ভাবে রাখিয়াছিল যে সেগুলি অনায়াসে পড়িতে পারে, কতকগুলি হাতে রাখিয়াছিল এবং বাকী ছোলাগুলি পুটলীসহ সুদূরে জলের মাঝে নিক্ষেপ করিল।

দস্যুরা যেই দেখিল চন্দ্রভূষণ জলে কি ফেলিতেছে অমনি তাহারা লাঠি উত্তোলন করিয়া ছুটিয়া আসিল—এবং একটা দস্যু, (বোধ হয় দলপতি) কহিল "বিটলে বামুন ভারি পাজী, বেটা বোধ হয় আসল মাল জলে ফেলে দিয়েছে, বেটাকে ছোরা দিয়ে কাট আর একটু একটু করে নুন ছিটিয়ে দাও।"

চন্দ্র। দেখ তোরা আমাকেত মার্‌বি, যেমন করে ইচ্ছে মারিস্ তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমাকে আগে মেরে ফেলে তার পর আমার ভায়ের গায়ে হাত দিবি।

দস্যুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা চন্দ্রভূষণের উপর আরও অধিক রাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা আর কোন উত্তর না করিয়া ছয় দিক হইতে ছয় জনে লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। এবং ছয় দিক হইতে ছয় জনেই চন্দ্রভূষণের উপরে লাঠি নিক্ষেপ করিল।

(৬)

দস্যু ছয়জন যখন লাঠি উত্তোলন করিয়া চন্দ্রভূষণের উপর নিক্ষেপ করিল, চন্দ্রভূষণ তখন "গেলুম গো" বলিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িল। এই বিকটশব্দে দস্যুগণেরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! তাহারা ভাবিল সাধারণ লোকেত এরূপ "হাঁকিতে" পারে না, বামুনটা কোন দস্যুদলপতি নয় ত! তাহারা এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে চন্দ্রভূষণ প্রক্ষিপ্ত ছোলাগুলিতে দস্যুরা: সকলেই প্রায় পা পিছলাইয়া পড়িতেছিল তাহার উপর চন্দ্রভূষণ আবার হঠাৎ বসিয়া পড়ায় ছয়জন দস্যুই উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। চন্দ্রভূষণ তখন বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া একজন দস্যুর হস্ত হইতে একগাছি লাঠি ছিনাইয়া লইল এবং দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল "তো বেটারা এই পালোয়ান, একজন শুট্‌কে বামুনকে মারতে ছ ছ বেটা শুয়ে পড়্‌লি তো বেটাদের আর কি বল্‌বো—ওঠ, লাঠি ধর, মার।" ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার করিয়া পরুষ কণ্ঠে এই কথা বলিয়া চন্দ্রভূষণ লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান হইল! তখন তাহার আট ইঞ্চি পরিমিত বক্ষঃস্থল এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইল, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল!

চন্দ্রভূষণ যাহার লাঠিটি কাড়িয়া লইয়াছিল সেই দস্যুটা উর্দ্ধশ্বাসে কোথায় ছুটিয়া পলায়ন করিল! এবং অপর কয়েকজন দস্যু তাহাকে পুনরায় আক্রমণ করিল। চন্দ্রভূষণও অদ্ভুত কৌশলে সেই পাঁচ জন দস্যুর লাঠি হইতে আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে আরও পাঁচজন দস্যু "হারেরে" শব্দ করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পূর্ব্বোক্ত কয়েকজন দস্যুর সহিত যোগদান করিয়া চন্দ্রভূষণের উপর লাঠি বৃষ্টি আরম্ভ করিল। চন্দ্রভূষণ তখন বুঝিল যে সে যদি সকলের লাঠি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং হয়ত তাহার কোনও বিপদও ঘটিতে পারে পরন্তু দস্যুদের মধ্যে কেহ না কেহ হয় ত সরোজের উপরও অত্যাচার করিতে পারে। চন্দ্রভূষণ এইরূপ ভাবিতেছে এবং অপূর্ব্ব কৌশলে লাঠি খেলিতেছে, ইত্যবসরে দুই জন দস্যু তাহাকে ছাড়িয়া সরোজকে

আক্রমণ করিতে ছুটিয়া গেল। সরোজের বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া চন্দ্রভূষণ তখন আর প্রাণিহত্যা না করিয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিল এবং অসুর বিক্রমে আক্রমণকারী দস্যুগণের মধ্যে দুই জন দস্যুকে সাংঘাতিকরূপে মস্তকোপরি প্রহার করিল এবং নিমিষমধ্যে সরোজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

এতক্ষণ দস্যুগণ সরোজের কথা এক প্রকার ভুলিয়াছিল এবং সময় বুঝিয়া সরোজও একটী ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল এবং চন্দ্রভূষণের আশ্চর্য্য লাঠি খেলা দেখিতেছিল। চন্দ্রভূষণের অপূর্ব্ব কৌশল, অদ্ভুত লাঠি খেলা দেখিয়া সরোজেরও প্রতি ধমনিতে উষ্ণ শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল! সে ভাবিল আমিও পুরুষ বাচ্ছা, পুরুষ বাচ্ছা হইয়া কুকুর বিড়ালের মত মরিব? সে আর ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল! তাহাকে সম্মুখে দেখিবা মাত্র যেমন দুই জন দস্যু তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিল, অমনি চন্দ্রভূষণ আক্রমণকারী অন্য দুই জন দস্যুকে ধরাশায়ী করিয়া সরোজের সাহায্যার্থ তাহার নিকট ছুটিয়া গেল। সরোজও ইত্যবসরে এক লম্ফে প্রহৃত দস্যুদ্বয়ের নিকট আসিয়া একগাছি লাঠি সংগ্রহ করিল এবং আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। সরোজকে কিন্তু আর আত্মরক্ষা করিতে হয় নাই, একা চন্দ্রভূষণই এক এক করিয়া দস্যুগুলির কাহারও মাথা ফাটাইয়া, কাহারও পা ভাঙ্গিয়া সকলগুলিকেই ধরাশায়ী করিয়াছিল।

দুই জন দস্যু পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে যাইতেছিল, চন্দ্রভূষণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে উভয়কে দুটী লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং বজ্রহস্তে তাহাদের উভয়ের গলদেশ ধারণ করিয়া মুখ দুটীকে ধরণী চুম্বন করিতে বাধ্য করিল এবং চন্দ্রভূষণের প্রচণ্ড হস্তের সংস্পর্শে দস্যুদ্বয়ের মুখ হইতে শোণিতস্রাব প্রবাহিত হইতে লাগিল।

(৭)

চন্দ্রভূষণ বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়া সরোজকে কহিল—"চল সরোজ এইবার অন্য অন্য দস্যুদের অবস্থাগুলা ভাল করে দেখে সরে পড়া যাক্।"

সরোজ তাহাতে কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি করিল না। উভয়ে চতুর্দ্দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু আহত দস্যুর মধ্যে

কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চন্দ্রভূষণ কহিল "বেটারা সব সরেছে, আমরাও সরে পড়ি চল, মিছে আবার একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে কি হবে!"

সরোজ। আবার হাঙ্গামা কি? তারা ত সব জখম হয়ে পড়েছে।

চন্দ্রভূষণ। তা'রা জখম হলে আর কি হল! এই দখলপুরের মাঠে প্রায় চার পাঁচশ লেঠেল আছে। তা'রা যদি লাঠি নিয়ে আসে তা'হলে আমি নিজের জন্য ভাবি না, কোন রকম করে ঠিক আত্মরক্ষা করে পলাইতে পারি, কিন্তু তোমার জন্যই আমার যত ভয়।

সরোজ। দাদা, তুমি সার্থক লাঠি খেলা শিখেছিলে। আমার ধারণা ছিল, ইতর শ্রেণী দস্যু বা লেঠেল ব্যতীত বুঝি কেহ লাঠি খেলিতে পারে না, তুমি আমার সে বিশ্বাস—"

সরোজের কথা শেষ হইতে না হইতে চন্দ্রভূষণ সরোজের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল "শীঘ্র চলে এস" এই বলিয়া মাঠের পার্শ্বস্থ একটা আইলের পার্শ্বে উভয়ে সটাং শুইয়া পড়িল। দুইটা তীর সমীরণ ভেদ করিয়া "সোঁ সোঁ" শব্দ করিয়া ছুটিয়া গেল!

চন্দ্রভূষণ কহিল "দেখিলে, বেটারা আবার পিছু নিয়েছে। কথাটী কহিও না চুপ করিয়া পড়িয়া থাক।" উভয়ে আর কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল। ইত্যবসরে তিন জন দস্যু তীর ধনুক হস্তে অশ্বারোহণে ছুটিয়া গেল! চন্দ্রভূষণ তখন সরোজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—"দেখ যদি লাঠি লইয়া দস্যুদল আক্রমণ করে তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র কাতর নহি, কিন্তু দূর হইতে তীর ছুড়িলে কি করিতে পারি!" সরোজ কহিল,—"চল, দাদা এইবার মাঠে মাঠে দৌড়ে পলায়ন করি।"

চন্দ্র। পলায়ন করিবে কোথা! দেখিলে না তিনজন দস্যু অশ্বারোহণে অগ্রে চলিয়া গেল। পশ্চাতে যে আরও দস্যু নাই সে কথা কে বলিল। তাহার উপর আবার জ্যোৎস্না রাত্রি আর অজানা পথ। পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে হয়ত দস্যুদের আড্ডায় গিয়াও পড়িতে পারি।

সরোজ। তবে এক কাজ করি চলুন, রাত্রি ত বোধ হয় বারটা বাজিয়া গিয়াছে, ঐ বটবৃক্ষে দুইজনে গিয়া আরোহণ করি চল, প্রভাত হইলে তখন যাওয়া যাইবে।

অন্য উপায় না দেখিয়া চন্দ্রভূষণ বাধ্য হইয়া সরোজের কথায় সম্মত হইল এবং উভয়ে সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিল।

(৮)

অর্দ্ধ রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হইল। তাহার পর প্রায় ২৫।২৬ জন দস্যু সন্নদ্ধ হইয়া এক একটা মশাল হস্তে সেই পথে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল,—"শালা গেল কোথা? আগে ত জন তিনেক ঘোড় সওয়ার পাঠায়েছি তারাও ত ফেরে না,—ব্যাপারটা কি!"

দ্বিতীয় দস্যু। তাই ত হে শালা গেল কোথা! কর্পূরের মত যেন উপে গেল!

১ম দস্যু। শালা নিশ্চয় "রণপা"* পায়ে দিয়ে গেছে নইলে যাবে কোথা? শালাকে যদি একবার পেতুম তা হলে এই মশাল দিয়ে পোড়াতেম।

২য়। নারে না.সে তত সহজ লোক নয়,লোকটা ভারি খেলোয়াড় নইলে বেটা একেলা আমাদের এতগুলোকে ঘাল করে গেল।

"ওরে শালা থাম থাম, তো বেটারা কি খেলতে জানিস্, থাকতুম্ যদি আমি—"

প্রথম দস্যুটা দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া এই কথা বলিল।

২য়। লে লে তুই বেটা সব কর্‌তিস্—আমরা এতজনে ত সব কল্লুম্, আর তুই থাকলেও সব কর্‌তিস্।

১ম। দেখ শালা মেধো, মুখ সাম্‌লে কথা কস্—জানিস্ বেটা আমার ওস্তাদ কে? আমি কার চেলা? একবার ওস্তাদজীর নাম করে দাঁড়ালে আমি ছশো বেটার মোয়াড়া নিতে পারি!

২য়। রেখে দেরে রেখে দে তোর ওস্তাদজীর মত আমিও ছশো বেটার মোয়াড়া নিতে পারি।

পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রথম দস্যুটী প্রথম আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিল না। সে এখন নিজের গৌরব করায় দ্বিতীয় দস্যু ও দলের মধ্যে অপর দশ বার জনের হৃদয়ে তীব্র ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিতেছিল। একে তাহারা চন্দ্রভূষণ কর্ত্তৃক উত্তম মধ্যম রূপে প্রহৃত

* ইহাকে চলিত কথায় "থাট্‌মো" বলে। চারি পাঁচ হাত পরিমিত দুইটী বাঁশের লাঠির প্রত্যেকটীতে পা রাখিবার স্থান থাকে। ঐ দুইটী স্থানে পা রাখিয়া লাঠির উর্দ্ধদেশ হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুত পদ উভয় পরিচালনা করিয়া রণপা ব্যবহার করিতে হয়। যাহারা ইহা ভাল ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত তাহারা ইহাতে বাইসাইকেলের মত বেগে চলিতে সক্ষম। লেখক।

হইয়াছে, তাহার উপরে আবার তাহাদের দলেরই একজন তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে—ক্রোধে তাহারা প্রায় সকলেই কম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই জন্যই দ্বিতীয় দস্যুটা প্রথম দস্যুর ওস্তাদজীর অবমাননা করিল।

প্রথম দস্যুটা যখন গুরুনিন্দা শুনিল, সে আর সহ্য করিতে পারিল না; তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, সে বজ্রহস্তে লাঠি উত্তোলন করিয়া পরুষকণ্ঠে কহিল "আয় বেটা মেধো এগিয়ে আয়—তোর গায়ে কত রক্ত, একবার ভাল করে দেখে নি—"

দস্যুদলের মধ্যে পাঁচজন প্রথম দস্যুর সাথরেৎ ছিল, তাহারা তাহাদের ওস্তাদজীর পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অবশিষ্ট সকল দস্যুই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রথম দস্যু তখন ওস্তাদজীর উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তে ভূমি স্পর্শ করিয়া—তাহার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া দম্ভভরে দণ্ডায়মান হইল।

চন্দ্রভূষণ বৃক্ষের উপর হইতে সবই দেখিতেছিল এবং যখন সে প্রথমে বুঝিল প্রথম দস্যুটী তাহারই সাথরেৎ 'লখনা' তখন তাহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। হর্ষের কারণ তাহাকে দেখিয়া, বিষাদের কারণ তাহাকে দস্যুদলভুক্ত হইতে দেখিয়া!

প্রথমে চন্দ্রভূষণ ভাবিতেছিল যে সে আর লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না, কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহাকে ১৫।২০ জন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখিল, যখন দেখিল তাহার প্রিয় শিষ্য তাহারই উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে নমস্কার করিতেছে তখন চন্দ্রভূষণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। সরোজকে বৃক্ষোপরেই থাকিতে বলিয়া স্বয়ং ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ হইতে ঝম্প প্রদান করিল।

চন্দ্রভূষণকে লাঠি হস্তে উপস্থিত দেখিয়া দস্যুদলের মধ্যে একজন কহিল "ওরে এই সেই বিট্‌লে বামুন বেটা"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দস্যুদল চকিতে প্রকৃতিস্থ হইল। তখন মেধো লক্ষ্মণকে বিদ্রূপের স্বরে কহিল,—"দেখারে লখ্‌না এইবার একবার ভালকরে তোর বাহাদুরীটা দেখা।"

লক্ষ্মণ তখন গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল "আচ্ছা আগে ঐ বামুনবেটাকে মেরে তোদের দেখাই, তার পর তোরেটাদের সকলের মাথা ভেঙ্গে

বাহাদুরীটা একবার ভাল করে দেখাব।" লক্ষ্মণ তখন দলের সকলকে ও নিজের পাঁচটী সাথরেৎকে কহিল "আমি জীবিত থাকিতে আমার সহিত একযোগে তোমরা এই বামুনকে আক্রমণ কর না, যদি আমি মরি আমার মরবার পর যা ইচ্ছা কর।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ লাঠি ধরিল। চন্দ্রভূষণ বুঝিল লক্ষ্মণ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এবং সাথরেতের সহিত লাঠি খেলিবার তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সে ভাবিল যদি সে লাঠি ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে লক্ষ্মণ তাহাকে চিনিতে পারিবে এবং চিনিতে না পারিলেও তাহার বিশ্বাস ছিল লক্ষ্মণ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না।

চন্দ্রভূষণ তখন লাঠি ফেলিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল "আয় লখ্ণা মার, কেমন লাঠি খেল্‌তে শিখেছিস্ দেখি।"

লক্ষ্মণ চন্দ্রভূষণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল এবং লাঠি দূরে ফেলিয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "ওস্তাদজি, আপনি! আপনি আমায় মাফ্ করুন আমি বড্ড ভুল করেছি।" পরে অন্যান্য দস্যুদের লক্ষ্য করিয়া কহিল "ওরে শালারা তোরা করেছিলি কি? আমার ওস্তাদজীকে মারতে গিয়েছিলি। ওস্তাদজী যে ইচ্ছে করলে তোদের মত ৫।১০ টা কেন দু'শ জনের মাথা নাবিয়ে দিতে পারতেন—তোরা একেই মারতে যাচ্ছিস্! ভাই মেধো তোর কথাই ঠিক হ'ল। আমি বড্ড ভুল করেছিলুম। আয় সব চলে আয়, পায়ে ধরে মাপ চা।"

অন্যান্য দস্যুগণ অনেকবার লক্ষ্মণের মুখে চন্দ্রভূষণের কথা শুনিয়াছিল এবং নিজেরাও তাহার কতকটা পরিচয় কিছু অগ্রে পাইয়াছিল, সুতরাং তাহারাও চন্দ্রভূষণের নিকট আসিয়া শির নত করিল। দস্যুদের আত্মবিবাদ মিটিল!

চন্দ্রভূষণও সকলকে যথাবৎ আপ্যায়িত করিল এবং লক্ষ্মণকে এই জঘন্য দস্যু ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিল। লক্ষ্মণ তাহাতে স্বীকৃত হইল।

* * * *

চন্দ্রভূষণকে সম্মান দেখাইবার জন্য দস্যুদল নিজেরা বাহক হইয়া দুইখানি পাল্কীতে চন্দ্রভূষণ ও সরোজকে লইয়া তাহাদের স্ব স্ব গ্রামে পৌঁছাইয়া দিল।

* * * *

যখন সরোজ আর চন্দ্রভূষণে ছাড়াছাড়ি হয় তখন সরোজ চন্দ্রভূষণকে

স্বীয় বাটীতে ভগ্নীর বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলে নাই। চন্দ্রভূষণও আসিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

(৯)

তালপুকুরে সরোজের বাটীতে মহা ধুম। আজ তাহার ভগ্নীর বিবাহ। চন্দ্রভূষণ তাহার জীবনদান করিয়াছে,তাহার জন্য সরোজের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। সে সকালে তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল কিন্তু বেলা ৪টা বাজিয়াছে চন্দ্রভূষণ কিম্বা তাহার প্রেরিত লোকটী কেহই আসিল না দেখিয়া সরোজ স্বয়ং মাধবপুরে যাত্রা করিল এবং পথে তাহার প্রেরিত লোকটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সরোজ চন্দ্রভূষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকটী কহিল যে, সে তালপুকুরে গিয়াছে; সুতরাং সরোজ বাটীতে ফিরিয়া আসিল কিন্তু চন্দ্রভূষণকে দেখিতে পাইল না।

সরোজের পিতা সরোজকে দেখিয়া কহিল "বাড়ীতে বিবাহ, কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেল, আর তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমি একলা মানুষ ক' দিক সামলাই—যাও সব বন্দোবস্ত কর।"

সরোজ "আজ্ঞা যাই" বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং বাটীর চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথাও চন্দ্রভূষণকে দেখিতে পাইলনা। এমন সময় তাহার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সরোজকে দেখিয়া কহিলেন "কি ভাই, নূতন একজন এসেছে তাকে কি একবারও দেখ্‌তে নাই—পাকা দেখার সময় তুমি কলিকাতায়, পাত্র বাড়ীতে এলে তুমি গ্রামছাড়া—ব্যাপারটা কি! কোলের মাগটী কেড়ে নিচ্ছে বলে কি এতই রাগ কর্‌তে হয়।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ স্বয়ং সরোজকে লইয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করিল। সরোজ গৃহাভ্যন্তরে যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট এবং আমোদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, দেখিল তাহারই আদরের চন্দ্রভূষণ তাহারই আকাঙ্ক্ষিত চন্দ্রভূষণ বরবেশে তথায় উপবিষ্ট!

সরোজ বলিল "কি, দাদা নাকি! তোমারই বিবাহ!"

এই কথায় বাসর ঘরের সমবেত মহিলাবৃন্দ হাসিয়া উঠিল।

চন্দ্রভূষণ সপ্রতিভ ভাবে কহিল "হাঁ আমিই পিতাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।"

চন্দ্রভূষণের বিদ্রূপোক্তিতে সরোজ চুপ করিয়া রহিল! ঠাকুরদাদা মৃদু হাস্য করিয়া সরোজের কাণ মলিয়া দিল।

সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

প্রতাপ ও জাতীয় জীবন।*

এই ভারতবর্ষের উপর দিয়া যে কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রত্যেক বারেই হিন্দুদিগের অসীম ধৈর্য্যবলে ও ধর্ম্মপ্রাণতায় সেই মহা ঝটিকাকে শান্তভাব ধারণ করিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট জন্মিবার কিছু পূর্ব্বে এবং কিছু পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, যখন বৌদ্ধ শ্রমণদিগের ধর্ম্মপ্রাণতায় ও দেশ বিদেশে প্রচারক প্রেরণে এসিয়া মহাপ্রদেশের প্রায় অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছিল এবং যখন দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিম ভারতে মহাবীর সম্প্রদায়ের আধিপত্যও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল তখন শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মার্থ সকলকে বুঝাইয়া দিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎপরে মহম্মদীয়েরা আবার আমাদের দেশে আসিয়া যখন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য হিন্দুদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখনও হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ও ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের চতুর্দ্দিকস্থ আট ঘাট বাঁধিয়াছিলেন এবং অসীম স্বার্থত্যাগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই পুণ্যচেষ্টা রাজপুতানায় সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। রাজপুতনার নৃপতিরা এই সকল শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সম্মানের প্রত্যাশায় ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মুসলমান সম্রাটদিগের সহিত নানা প্রকার অতি নিকট আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে যেরূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ ধর্ম্মবিপ্লব ভারতবর্ষে অতি অল্পই সংঘটিত হইয়াছে। যদিও এই সময়ে সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবরের সুশাসনে ভারতবর্ষে বাহ্যিক ভাবে কোনও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয় নাই, যদিও আকবর হিন্দুদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য নানা প্রকার উৎপীড়ন করেন নাই, যদিও তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম বলিয়া

---

* শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ সোম এল্, এম্, এস্, মহোদয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাধনা-সমিতির অষ্টাদশ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত। সহঃ সম্পাদক।

অভিহিত করেন নাই, তথাপি তিনি যাহা করিয়া ছিলেন তাহা কেহই করেন নাই, তাহা ঔরঙ্গজেব করিতেও সমর্থ হন নাই এবং তাহা করিবার বুদ্ধিশক্তি আলাউদ্দীনেরও ছিল না!

আকবর সমস্ত প্রধান হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া স্বীয় রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের যাহা সনাতন ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম, তাহাতেই কুঠারাঘাত করিয়া ছিলেন।* অম্বরাধিপতি মানসিংহ এবং তৎপূর্ব্বে তদীয় পিতৃব্য ভগবানদাস স্বীয় ভগিনী ও কন্যাকে মুসলমান সম্রাটদিগের অঙ্কশোভিনী করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মান্য (?) রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ চতুরতাপূর্ণ ও হিন্দুধর্ম্মের বিনাশজনক কৌশলের দ্বারা আকবরসাহ যখন হিন্দু নরপতিদিগের নিকট অতি সামান্যই প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্যপিপাসা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং কালে ঐ যে ক্ষুদ্র মিবার রাজ্য যাহা আপনার সুখে আপনার দুখে আপনিই ব্যস্ত ছিল, তাহারই প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মিবারবাসীরা নিজ অর্জ্জিত কুটীর অপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ প্রাসাদকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে নাই, তাহারা নিশ্চয়ই জানিত যে নিজ সঞ্চিত শাকান্নে যত তৃপ্তি, যত শান্তি, যত বিমল আনন্দ, এমনতর আনন্দ, শান্তি ও তৃপ্তি বহু আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের নিমন্ত্রণেও পাওয়া যায় না। সেই জন্য যখন আকবর ভবিষ্যতের স্বর্ণলেখা-অঙ্কিত চিত্রপট আনিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন, তখন তাহারা সেই চিত্রের সোণার আখর গুলিকে প্রকৃত সোণা বলিয়া জানিয়াও তাহার মায়ায় মুগ্ধ হয় নাই, তাহারা বুঝিয়া ছিল পিঞ্জর সোণার হইলেও তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে হয়, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা তথায় সফল হয় না। তাহারা জানিত, মুক্ত গগন তলে দাঁড়াইয়া মুক্ত হৃদয়ের যে সেই উদার অনন্ত সাম্যগান—যাহা কখনো বা মানবকে সকল সুখ দুঃখের উপর দাঁড় করাইয়া বিধাতার চরণ তলে বারেকের তরে আনিয়া দেয়, আবার কখনো বা শোকাতুর হৃদয়ে শোকের স্থানে সান্ত্বনা, দুঃখের স্থানে সুখ এবং হিংসার স্থানে প্রীতিকে আনিয়া অঘটন ঘটাইয়া দেয়—তাহা কখনই পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না; সেই জন্য তাহারা আকবরের মায়া মরীচিকার ঘোরে উন্মত্ত না হইয়া আপনার মনে, অতি সহজ ভাষায়

* টড কৃত রাজস্থানের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সংগ্রথিত, তাহাদের সেই সরল ভাবপূর্ণ গান অতি সাধা সুরে গাহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের বিষাদপূর্ণ সমবেত হৃদয়যন্ত্র হইতে

'স্বাধীনতায় হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?"

এই কলকাকলীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং যখন আকবরের সেই অগণন দিগ্বিজয়ী ফৌজ চতুর্দ্দিকে আপনার যশসৌরভ বিতরণ করিতে করিতে দর্পভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চিতোরের দুর্গদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, তখন মিবারবাসীরা অশ্রুভারাবনত হৃদয়ে বিষাদক্লিষ্ট মলিন মুখে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির জন্য বক্ষের তপ্ত শোণিত দানে বিরত হইল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, মিবারের তদানীন্তন নৃপতি মহারাণা উদয়সিংহ তাদৃশ সাহসী ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত ছিল এবং তিনি একটী বারবনিতাকে রক্ষিতা রূপে রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সদা সর্ব্বদা এই বারবনিতার গৃহেই দিনযাপন করিতেন এবং অন্তঃপুরের আশ্রয়ে থাকিয়া বিলাস সাগরের সুখময় স্বপ্নে সারাদিন নিমগ্ন রহিতেন। অতএব যখন মিবারবাসীরা যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে তাহাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের একমাত্র দেবতা, মাথার মুকুটমণি মহারাণা উদয়সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়া অন্তঃপুরের এক নিভৃত কক্ষে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন, যখন তাহারা দেখিল যে মহারাণা উদয়সিংহ তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ দিতেছেন না, যখন তাহারা বুঝিল যে মহারাণার জলদগম্ভীর স্বর তাহাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সজীব হৃদয়ে একটা উন্মাদিনী শক্তি আনিয়া দিতেছে না, তখন তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল, তখন তাহাদের আশা ভরসার উজ্জ্বলদীপ্ত আলোক সকল সহসা একেবারে নিবিয়া গেল।

এই ঘটনাটীর বিবরণ যখন মিবারেশ্বরের রক্ষিতা বারবনিতার কর্ণ-গোচর হইল, তখন তাঁহার হৃদয়ে সহসা প্রেমের রুদ্ধ উৎস উছলিয়া উঠিল, তখন তাঁহার মনে হইল, "হায় হায়! আমি কি রাক্ষসী, আমার জন্ম কি কেবল মাত্র চিতোরের অমঙ্গল সাধনের জন্যই হইয়াছিল ? আমি জন্মগ্রহণ করিয়াই কেন মরিলাম না ? কেন বাঁচিয়া রহিলাম ?" তখনই আবার তাঁহার মনে হইল, "আজ তো মরিতে পারি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত

করিব, তাহার পর মরিব।” তৎক্ষণাৎ তিনি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। যে পাষাণ প্রাণ মহারাণার আত্মসমাহিত দানেও দ্রবীভূত হয় নাই, সেই প্রাণ আজ সহসা দেশের জন্য ও দেশবাসীর জন্য ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যে কাননে পূর্ব্বে এরণ্ডের ফুলই শোভা পাইত, আজ সেই কাননে বিধাতার নির্ব্বন্ধে আপনা হইতেই পারিজাত ফুটিল! যে মরুভূমিতে পূর্ব্বে কেবল মরীচিকা ও বালুর কণা মাত্রই পথিকের নয়নগোচর হইত, সেই মরুভূমিতে আজ নির্ঝর ছুটিল! যে শ্মশানে পূর্ব্বে কেবলমাত্র মৃত মনুষ্যের পাংশু মুখ বিকট দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিয়া খেলিয়া গিয়াছিল, সেই শ্মশানে আজ চন্দ্রের সুখসেবিত শীতল জ্যোৎস্না দেখা দিল।

তাঁহার সেই উৎসাহব্যঞ্জক বদন, স্বদেশহিতৈষিতাপূর্ণ বাক্য সমূহ এবং জলন্ত অঙ্গারপূর্ণ আত্মগ্লানি সৈন্য সকলকে এরূপ উৎসাহিত করিয়াছিল, যে তাহারা মনে করিয়াছিল বুঝি বা চণ্ডী স্বয়ংই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং তাহারা এরূপ মহাবেগে মোগল সৈন্য সমূহকে আক্রমণ করিয়াছিল, যে ক্ষণকালের মধ্যেই মোগল সৈন্সেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। বারাঙ্গনা ঘৃণ্য হইলেও আমরা ইঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারি না। আমাদের হৃদয় ইঁহার মহত্ত্ব ও স্বদেশহিতৈষা অনুভব করিয়া স্বতঃই ইঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া যায় এবং ইঁহাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কে বলে আমাদের দেশে স্বদেশহিতৈষণা ও জাতীয়তা ছিল না?* যে বলে সে মহামূর্খ, মহাদম্ভী। আমার কেবলমাত্র এই নিবেদন যে, সে আসিয়া এই মহীয়সী বারাঙ্গনাচরিত্র অবলোকন করুক এবং তৎসঙ্গে স্বীয় ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহার জীবনের একটা মহা-কলঙ্ক মুছিয়া ফেলুক।

যদিও আকবর এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি—যে অধ্যবসায় তাঁহাকে পারস্য প্রদেশ হইতে কুমারিকা অবধি বিশাল মহা প্রদেশের সম্রাট করিয়া দিয়াছিল, যে অধ্যবসায় তাঁহাকে অদম্য স্বাধীনচেতা রাজপুত রাজন্যবর্গের অধিপতি রূপে পরিণত করিয়াছিল, যে অধ্যবসায় তাঁহার চরণপ্রান্তে ত্রিশ কোটী কিম্বা তদূর্দ্ধসংখ্যক মানবের শুভাশুভ ন্যস্ত

* "জাতীয়তা" ও Nationality শব্দ দ্বয়ে অর্থগত পার্থক্য বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাঁহারা জাতীয়তা শব্দে Nationality বুঝিবেন, তাঁহারা ভুল বুঝিবেন। লেখক।

করিয়া দিয়াছিল—সেই অধ্যবসায়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেইজন্ত তিনি "আজিকে বিফল হলো হতে পারে কাল" এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় শুভ অবসরের সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে জয়লাভের পর মিবার প্রদেশের সামন্তবর্গেরা যখন শুনিল যে মহারাণার বারবনিতার দ্বারাই এই যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিয়াছে, তখন তাহাদের ঈর্ষাবহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল এবং অবিলম্বে তাহারা ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া পূর্ব্বোক্তা বারবনিতার বিনাশ সাধন করিল। আকবর তাহাদের এই গৃহবিবাদের কারণ অবগত হইয়াই ভীমবেগে চিতোর দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং অসীম শৌর্য্য ও বীর্য্যের দ্বারা মিবারবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মিবারবাসীরা যেরূপ স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাস্তবিকই জগতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই যুদ্ধে যে প্রলয়ঙ্কর লোকক্ষয় ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আজিও ৭৪॥০ শপথ দিতেছে, এবং আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেক হিন্দুই এই শপথের উৎপত্তির বিবরণ অবগত আছেন।

চিতোর দুর্গ হৃত হইবার চারি বৎসর পরে, উদয়সিংহ তাঁহার ঘৃণ্য জীবনলীলা সমাপন করিয়াছিলেন। উদয়সিংহ যে কেবলমাত্র ভীরু, কাপুরুষ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন, তাহাই নহে; নৃপতির যাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়,—যাহা থাকিলে নরপতি নরপতি নামেরই যোগ্য নহেন, যে বিষ এমন কি সময়ে সময়ে রাজ্যের ধ্বংস সাধনও করিতে পারে—উদয়সিংহ সেই পক্ষপাত বিষে জর্জ্জরীভূত ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পক্ষপাতিত্ব হেতু জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও প্রিয়পুত্র যোগমল্লকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত প্রতাপ পিতার এই নির্ব্বাচনের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসপর হন নাই। তিনি দেশকে আপনার অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, কিন্তু পিতাকে তদপেক্ষা ভক্তি করিতেন। রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা পালনার্থ প্রাণ অপেক্ষা যে প্রিয়তর, বাল্যকালের যে শুকতারা ও যৌবনের যে আশা ভরসা সেই মাতা ও স্ত্রীর অসহ্য ক্লেশ ও অশেষ অশ্রুবারিধারও নীরব বক্ষ প্রাণে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি পিতার আজ্ঞা অমান্য

করিতে পারেন নাই। আমাদের মুখোজ্জলরবি প্রতাপও তদ্রূপ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বদেশের অবনতি দেখিয়া বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি পিতার আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং যখন যোগমল্ল রাজা হইবার জন্য কুসোরা নগরে প্রবেশ করিলেন তখন প্রতাপ অশ্বারোহণে নগরের অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি কিছু প্রতিবন্ধকতা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু পিতৃভক্তির আধিক্য হেতু তদ্রূপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

তিনি রাজা হইবার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্রতা বা ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও মিবারবাসীরা তাঁহাকে তাহাদের রাজা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উদয়সিংহের শবদেহ যখন সৎকারার্থ শ্মশানস্থলে আনীত হইল, তখন তাঁহার শবাধারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রতাপের মাতুল ঝালোর রাও সালুম্ব্রাধিপতি কৃষ্ণরাওৎকে কহিলেন, "আপনি থাকিতে এরূপ অবিচার হইল কেন? আপনি থাকিতে জ্যেষ্ঠ প্রতাপ রাজা না হইয়া যোগমল্ল রাজা হইলেন কেন?" ইহার উত্তরে কৃষ্ণরাওৎ কহিয়াছিলেন, "যখন কোন পীড়িত ব্যক্তি তাহার চরম অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যদি তখন সে দুগ্ধ পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তখন তাহাকে তাহা দিবার আপত্তি কি?" উক্তরূপ কথোপকথনের পর তাঁহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যোগমল্লকে কহিলেন, "মহারাজ, আপনার ভ্রম হইয়াছে, এই সিংহাসন আপনার নহে, ইহা প্রতাপেরই ন্যায্য প্রাপ্য, অতএব আপনি সিংহাসন হইতে অবতরণ করুন।" সভায় উপস্থিত সকল সামন্ত ও সভাসদ্ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে যোগমল্ল সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন, এবং কৃষ্ণরাওয়ৎ প্রতাপের কটীদেশে একখানি অসি লম্বমান করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন।

প্রতাপ একণে প্রজাপ্রদত্ত এই মুকুটকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, এই মণিময় মুকুট স্বীকার করিলেও পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মিবারের রাজসিংহাসন কেবলমাত্র তাঁহার পিতার আসনের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই, প্রত্যেক প্রজার

শোণিতের দ্বারা ইহার প্রত্যেক কণা কণা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যদি এই মুকুটের ও সিংহাসনের উপর কাহারও প্রকৃত বিধাতাপ্রদত্ত দখল থাকে, তবে তাহা সমগ্র মিবারবাসীদের। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিংহাসন যাহাকে ইচ্ছা দিবার ক্ষমতা তাঁহার পিতার আদৌ ছিল না। অতএব তিনি প্রজাবর্গের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যতদিন তাঁহার কটীদেশে সালুম্ব্রাপতি প্রদত্ত অসি লম্ববান থাকিবে, ততদিন তিনি কখনই মুসলমানদিগের নিকট মস্তক অবনত করিবেন না এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে মিবারবাসীদের সুখ শান্তি ও তৃপ্তিতেই তাঁহার সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি নির্দ্ধারিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

শিল্পাগারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বাঙ্গীন শুভফলপ্রদ অনুষ্ঠান যখন পৃথিবীর কোনও বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন স্বার্থময় ব্যবসায়-জগতে আদর্শ অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সুতরাং জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি অশেষ প্রকার সুফলপ্রসূ হইলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধাও আছে। সাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণীর যৌথ ব্যবসায় বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা চালাইতে হইবে। বখ্‌রাদারী কারবারে যেমন ধনী স্বয়ং কার্য্য করিতে পারে এবং যথাসম্ভব পরিশ্রম করিয়া দিবানিশি কারখানার উন্নতি বিষয় চিন্তা করিয়া শিল্পাগারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে, বেতনভোগী ভৃত্যচালিত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানিতে সেরূপভাবে শিল্পাগারের শ্রীবৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিবার কেহ থাকে না। অনেক বিষয়ে প্রভু ও ভৃত্যের স্বার্থ একপথগামী হইলেও কোন কোন বিষয়ে উভয়ের স্বার্থ অনুরূপ নহে। সুতরাং চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু পরিশ্রম বা যে পরিমাণে উদ্যম করা আবশ্যক, যৌথ কারবারের কার্য্যাধ্যক্ষ তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিবে কিনা সন্দেহ। তাহার পর যে সকল লোক ব্যবসা ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে

সততার জ্ঞান তত বেশী পরিস্ফুট হয় নাই, সে সকল দেশে এই কুফলটির পরিণাম কি হইবে তাহা নির্ণয় করা নিষ্প্রয়োজন। অস্মদ্দেশে ডাইরেক্টর এবং কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার ভ্রম হইতে কেবল যে অযোগ্য ব্যক্তি চালিত কারখানাটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এরূপ নহে, ফলতঃ এ বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে এই প্রথায় যৌথ কারবার করিবার উদ্যম এবং প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

মিল্ সাহেব এই প্রথার অপর একটি অসুবিধা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, কার্য্যাধ্যক্ষদের কারখানার সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নাই বলিয়া তাহারা স্বল্প লাভকর বিষয়গুলির প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখেন না। নিজের কারখানা হইলে লোকে যেমন প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্য্যটি হইতে কিছু লাভ করিয়া লইবার চেষ্টা করে, সাধারণ যৌথ কারবারের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ সেরূপ ভাবে সকল কার্য্য হইতে লাভ করিবার প্রয়াস করে না।

কিন্তু ইহার উপকারিতা স্মরণ করিলে এ প্রথার উপরোক্ত অনুপকারিতা-গুলি তাদৃশ গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ অর্থনীতি গুরু আদম স্মিথ সাধারণ যৌথ কারবারের তাদৃশ বহুল প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। আদম স্মিথের সময় সাধারণ যৌথ ব্যবসা অধিক ছিল না বলিয়া তিনি এ বিষয়টি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী সকল লেখকই প্রায় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রথা প্রবর্ত্তনের পক্ষ সমর্থন করিয়া-ছেন। আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মার্শাল সাহেব বলেন— অধুনা ব্যবসায় জগতে যেরূপ সাধুতার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইয়াছে। তিনি আশা করেন ব্যবসায় জগতে উত্তরোত্তর সততার বৃদ্ধি হইবে।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অনুপকারিতা কতক পরিমাণে দূর করিবার জন্য কো-অপারেটিভ সোসায়েটি বা সহায় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এ প্রথা ঠিক জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর প্রথার মত। কেবল কর্ম্মচারিগণ বেতনের পরিবর্ত্তে বা নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপরেও লাভের একটি হার পাইয়া থাকে। ইহাতে ব্যবসায়ের উন্নতি অবনতির সহিত কর্ম্মচারী-দিগের স্বার্থ জড়িত থাকা নিবন্ধন তাহারা কর্ম্মে অনাসক্ত হইতে পারে না। অধিক পরিশ্রম করিলে নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত অধিক লাভ পাওয়া যাইবে এই আশা প্রণোদিত হইয়া সকলেই অধিক পরিশ্রম করিতে

যত্নবান হয়। আমার বিশ্বাস এদেশে অধুনা যত যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে সকল কর্ম্মচারীকে না হউক, অন্ততঃ কার্য্যাধ্যক্ষকে লাভের অংশীদার করিলে ব্যবসায়ে সুফল ফলিবে।

স্থলবিশেষে স্বল্প মাত্রায় বস্তু নির্ম্মাণ

করিবার প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করিব। সাধারণতঃ বৃহদায়তনের কারখানা খুলিয়া একেবারে অধিক পরিমাণে বস্তু উৎপাদন করিলে স্বল্পব্যয়ে বস্তু নির্ম্মাণ হয় তাহা বুঝাইয়াছি। কিন্তু কতকগুলি ব্যবসায় এরূপ আছে যে তাহা উপরোক্ত নীতি অনুসারে চালাইতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেস্থলে দ্রব্যাদি স্বল্পমাত্রায় উৎপাদন করিতে পারিলেই ব্যবসায়ী লাভবান হয়।

প্রথমতঃ অস্মদ্দেশের প্রধান ব্যবসায় কৃষির বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যৌথ মূলধনে স্থাপিত বৃহদায়তনের কৃষি ব্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে সুবিস্তৃত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইলে বাষ্পীয় হাল প্রভৃতি ব্যবহারে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার কৃষিজীবিদিগের মধ্যে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে সামান্য যন্ত্রাদি লইয়া বলদ সাহায্যে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। কৃষকেরা প্রায়ই আপনাপন ক্ষেত্রের মালিক। জমিদারকে কর দেওয়া বা অংশীদার ধনীকে শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়া ব্যতীত প্রত্যেক কৃষক আপনাপন পরিশ্রম উদ্ভূত পদার্থের আপনিই স্বামী। সেই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়, নিদাঘের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রৌদ্রে বা অর্দ্ধনগ্নদেহে দারুণ শীতকালের উষার সময় শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সে আপনার ক্ষেত্রটির উন্নতির আয়োজন করিতেছে। ইহাতে কার্য্য যে অত্যন্ত ফলবতী হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি দেবতার বাদ আমাদের পরিশ্রমক্লিষ্ট হতভাগ্য ক্ষেত্রজীবির উপর সাধিত না হইত এবং জমির সার দিবার বা যন্ত্রের উন্নতি করিবার দুই একটি প্রথা অবলম্বনে বাঙ্গালী কৃষক কার্য্য করিতে শিখিত, তাহা হইলে তাহাদের লাভের হার অত্যন্ত অধিক হইত।

আর এক কথা। যে জমির উপর কার্য্য করিতেছি সে জমিটি আমার এই যে জ্ঞান, ইহা শ্রমজীবিকে গর্ব্বিত করে, ইহাতে তাহার সম্মান বৃদ্ধি হয়। গৃহশূন্য, ভূমিশূন্য শ্রমজীবিতে এবং আপনার ভূমি আছে এমন

শ্রমজীবিতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্তের একটা মর্য্যাদা আছে যাহা ঠিকা মজুরের নাই। পরিশ্রম বোধ হয় কৃষককে অধিক করিতে হয় কিন্তু তাহা হইলেও তাহার পরিশ্রমে তাহার একটা সুখ আছে, পরিশ্রমের সময় মধুরভাষিণী আশা আসিয়া নগ্নদেহ কৃষ্ণচর্ম্ম রৌদ্রপক্ক কৃষকের কর্ণে মধু বর্ষণ করে।

সমগ্র জমিসংক্রান্ত আইনাদি বিচার করিবার স্থান এ নয়। মোটের উপর বলিতে পারি, কৃষিকার্য্য নিজ জোতে কৃষকদিগের দ্বারা স্বল্পমাত্রায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোনও বুদ্ধিমান নবীন জমিদার যদি বিলাতী কল কব্জা লইয়া বৃহদায়তনের খামার প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু অস্মদ্দেশের শ্রমজীবি কৃষকদিগকে উৎখাত করিয়া তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি একত্রিত করিয়া বৃহদায়তনে কৃষিকার্য্য করিলে দেশে অমঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা।

আবার কতকগুলি ব্যবসায় আছে যাহাতে অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। সে কার্য্যগুলিও স্বল্প মাত্রায় হওয়া উচিত। আমাদের দেশে যেমন পানের বরুজ। পানের লতাগুলি অত্যন্ত যত্নের সহিত বর্দ্ধিত করিতে হয়। বৃহদায়তনের পানের বরুজ খুলিলে তাহাতে অধিক যত্ন সম্ভবপর হয় না। আমার বোধ হয় যাহারা রেশম কীট পালন করে তাহাদের পক্ষেও অল্প মাত্রায় কার্য্য করা আবশ্যক। পলুপোকা গুলিকে লালিত ও বর্দ্ধিত করা যে কি কঠিন কার্য্য, যাহারা এ ব্যবসায় দেখিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারে। প্রথমে রেশম কীটের ডিম্ব গুলিকে কাগজে বা কাপড়ের উপর যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। এই সঙ্ক বা ডিম অনেক বিপদের আগার। পিপীলিকায় ইহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে বা তাহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগের জীবাণু থাকিলে সমস্ত সঙ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিয়া ব্যাধিগ্রস্ত সঙ্ক নষ্ট করিতে হয়। পরে তুঁতার জলে ধৌত করিয়া তবে সঙ্ক অপর গৃহে রাখিয়া দিতে হয়। তথায় ডিম ফুটিয়া পলুপোকা বা রেশম কীট জন্মায়। এই পলুপোকার মধ্যে আবার সংক্রামক পীড়া হইলে বা গৃহে মক্ষিকা প্রবেশ করিলে সমস্ত কীট নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যদি কোনও রূপে অসাবধানতা বশতঃ একবার সঙ্ক বা পলু ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সমস্ত গুলিই নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণে কীট পালন করা ও কার্য্য করা কি শ্রেয়ঃ নহে?

বিলাতে কুক্কুট প্রভৃতির চাষ আছে। ঐ সকল কার্য্যও অল্প মাত্রায় করা আবশ্যক। মোট কথা, যে ব্যবসায়ে, অধিক শ্রমবিভাগের সুবিধা বা আবশ্যকতা নাই সে ব্যবসায় বৃহদায়তনের না হইলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিল্পাগারের স্থান নির্ণয়।

উপরোক্ত প্রথানুসারে নূতন নূতন কল কব্জা ব্যবহার করিয়া শ্রমবিভাগ করিয়া কো অপারেটিভ প্রথায় সুন্দর বনের মধ্যে একটি বস্ত্র বয়নাগার খুলিলে শীঘ্রই শিল্পখানা বন্ধ করিতে হইবে, এ সাধারণ জ্ঞান সকলেরই আছে। কিন্তু এই নীতিরই সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবহেলার জন্য কত ব্যবসাদারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? শিল্পাগারের প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে শ্রমবিভাগ যেমন অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই পরিমাণে না হইলেই শিল্পাগারের উপযোগী স্থান নির্ণয় করিয়া লওয়াও একটী আবশ্যকীয় কর্ম্ম। যে স্থানে যে দ্রব্যের অধিক আবশ্যক, সেই স্থলে সেই বস্তু নির্ম্মাণের জন্য শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়েও হিসাবের আবশ্যক। কলিকাতা সহরে যে পরিমাণে বস্ত্রের আবশ্যক, কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম গুলিতে তাহার বহু সহস্র ভাগের এক ভাগও আবশ্যক নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কলিকাতায় বস্ত্রের কারখানা স্থাপন করা অপেক্ষা দমদমায় বস্ত্র বয়নাগার স্থাপিত করা অধিক সুবিধাজনক। কলিকাতায় কারখানার গৃহের ভাড়ায় যে অর্থ ব্যয় হইবে, দমদমায় স্থাপিত কারখানা গৃহের ভাড়া এবং সেই কারখানা প্রস্তুত বস্ত্র কলিকাতায় আনিবার ব্যয় যোগ করিলে কলিকাতার বাটি ভাড়া অপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং সুলভে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য দমদমায় শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করাই শ্রেয়ঃ।

তাহার পর অনেক সময় স্থান বিশেষে কোনও কোনও শিল্প সুন্দর রূপে হইতে পারে এবং স্থান বিশেষে কোনও কোনও পদার্থ একেবারে নির্ম্মিত হইতে পারে না। স্থানের জল হাওয়া এবং সময়ে সময়ে শিল্পজাত বস্তুর উপকরণের বাহুল্য বশতঃ এক একটি স্থান শিল্পের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। মৃদ্‌পাত্র রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থলে উত্তমরূপে হয়। আবার খনিজ পদার্থ লইয়া যে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিতে হয় সে সকল বস্তু খনির নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইলে ভাল হয়।

শিল্পজাত পদার্থ বিক্রয় স্থলে লইয়া যাইবার সুবিধা হয় বলিয়া প্রচুর সলিল স্রোতস্বতীর তীরে বা রেলপথের সন্নিকটে শিল্পাগার খোলা আবশ্যক।

শিল্পাগারের স্থান নির্ণয় করিবার পক্ষে অপর একটি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থল এমন আছে যেখানে বহু পূর্ব্বাবধি একটি বিশিষ্ট শিল্পের প্রচলন আছে, যেমন মুর্শিদাবাদ রেশমের জন্য, কৃষ্ণনগর মৃদ্‌পুত্তলিকার জন্য, ঢাকা মস্‌লিনের জন্য, সিমলা ফরাশডাঙ্গা প্রভৃতি বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। ব্যবসাদারের কর্ত্তব্য ঐ সকল বিশিষ্ট শিল্পের জন্য ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠা করা। তাহা হইলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

কোনও একটি বিশেষ ব্যবসায় বহুদিন একস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলে তথাকার শিল্পিগণ পুরুষানুক্রমে সেই শিল্প শিখিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারে। সে শিল্পের রহস্যগুলি যেন সেস্থলের জল হাওয়ার সহিত মিশিয়া যায়, বালকগণ স্বাভাবিক অনুকরণ করিবার বৃত্তি অনুসারে বৃদ্ধদিগের কার্য্য অনুকরণ করিতে শিখে। এরূপ বাল্যাবধি শিক্ষার জন্য যে কার্য্যের দক্ষতা বৃদ্ধি হয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? কৃষ্ণনগরে দেখিয়াছি ছোট ছোট কুম্ভকার বালকগণ যেরূপ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে অনেক স্থলের বৃদ্ধ কুম্ভকার সেরূপ পারে না। কাঞ্চন নগরে লৌহ ও ইস্পাতের কার্য্য সকলে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া শিখে, তাই তথাকার ইস্পাতের কার্য্য এত সুন্দর হয়।

ইহা ব্যতীত উপযুক্ত স্থলে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করার অপর উপকারিতা আছে। শিল্পের একটি নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হইলে সকলে তাহা শিক্ষা করিয়া দক্ষতা বাড়াইতে পারে এবং এইরূপ পরস্পরের সহায়তায় ও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় শিল্পের উন্নতি হয়। একস্থলে কোনও বিশেষ দ্রব্য নির্ম্মাণ সুবিধাজনক হইলে তথায় সেই দ্রব্যের উপকরণাদি বিক্রয়েরও বাজার হইয়া উঠে। মুর্শিদাবাদ জেলার যে সকল গ্রাম রেশমী বস্ত্র বয়নের জন্য বিখ্যাত, তথায় হাটের দিন দূর দূরান্তর হইতে দোকানদারগণ রেশমের সূতা লইয়া আসিয়া বিক্রয় করে।

উপসংহার।

পদার্থ বিজ্ঞানের মত অর্থনীতি বিজ্ঞান ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাদের প্রথার দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়া যে উপায়টিতে সর্ব্বাধিক উপকারজনক ফললাভ করা যায়, অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সেই গুলিকেই উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ

সম্বন্ধে মানবের দৃষ্টি বা বিবেচনা শক্তি একান্ত নির্ভুল হয় না বলিয়া এক শতাব্দীর অর্থনীতিজ্ঞেরা অপর শতাব্দীর অর্থনীতির মত খণ্ডন করে, মনুষ্য চরিত্র জটিল। যেখানে মনুষ্যের স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করিতে হয় সেখানে তাহার চরিত্র দুর্ব্বোধ্য। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য মানব নিত্যই নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিতেছে। সুতরাং মোটের উপর অর্থনীতির সার তত্ত্ব চিরকাল সত্য হইলেও তদ্বর্ণিত বিশেষ বিবরণ গুলি পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে।

উপরোক্ত নীতিগুলি অনুসারে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া যে সকল বিষয়ে কার্য্য করিবার জন্য বিশিষ্ট উপায় অবলম্বনে ব্যবসাদার লাভবান হয়েন সে সকল উপায় যথাসম্ভব উপরোক্ত সাধারণ নীতি বজায় রাখিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মক্ষেত্রে দেশ কাল বিশেষে কিরূপ প্রতিবন্ধক পাওয়া যাইতে পারে তাহা যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। যদি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি খুলিবার অর্থ কোনও দেশে সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব মূল ধন লইয়া কারখানা খুলিয়া তাহাতে শ্রম বিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহার যতদূর সম্ভব হয় সেই পরিমাণে করা উচিত। বিজ্ঞানে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক বলা হইয়াছে, সুতরাং জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি খুলিতে না পারিলে অন্য উপায়ে ব্যবসার চেষ্টা না করা অবিধেয়। অপর উপায়ে কার্য্য করিলে লাভ কম হইতে পারে কিন্তু যত দিন না দেশময় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন অন্য উপায়ে ব্যবসা করিলে একেবারে ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে না, তবে জয়েণ্ট ষ্টক খুলিতে পারিলে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-সমাচার।

উপাসনা।—বৈশাখ, ১৩১৪। সর্ব্বপ্রথমে "বেদান্ত বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক "জীবাত্মারই জন্য এই সৃষ্টি ও মুক্তির ব্যবস্থা" বুঝাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা বিশেষজ্ঞের নিকট তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট ইহা অত্যন্ত "কণ্টকিত" বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। লেখক যদি আরও

বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। "বন্ধ্যা নারীর পুত্রস্নেহ" একটী গল্প। ইহার মূল ঘটনা অত্যন্ত সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু লেখকের লিপিনৈপুণ্য-হীনতায় ইহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই এবং অনাবশ্যক স্ফীত কলেবর হইয়া পড়িয়াছে। এবার উপাসনায় "মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে" চারিটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতাগুলি শোকোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করিব না, তবে কবিতা হিসাবে সকল কবিতা গুলিই প্রকাশযোগ্য হয় নাই। "আলোকের চাপ" সম্বন্ধে লেখক যাহা লিখিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও, ইহাতে সাধারণ পাঠকের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "সায়েস্তা খাঁ" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। সায়েস্তা খাঁর সময়ে ইংরাজেরা রাজ্য বিস্তার করিতে যাইয়া সায়েস্তা খাঁর দ্বারা কিরূপ উত্যক্ত হইয়াছিল, লেখক তাহার আভাস এই প্রবন্ধে দিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিবেন এরূপ আশ্বাস প্রদানও করিয়াছেন। "আত্মহত্যায়" সম্পাদক মহাশয় এবার, বৎসরের কোন্ মাসে, মাসের কোন্ বিভাগে, বিভাগের কোন্ দিবসে, দিবসের কোন্ অংশে কিরূপ সংখ্যায় আত্মহত্যা হয় তাহারই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, "আত্মহত্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘটে প্রাতে ৬টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত" এবং মঙ্গলবারেই আত্মহত্যার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শনিবারে আত্মহত্যার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

অঙ্কুর।—বৈশাখ। 'অবতার ও ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক "অবতারের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন" এই কথা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের সহজ বোধ্য হয় নাই। এরূপ প্রবন্ধ একটু বিশদরূপে লেখাই বাঞ্ছনীয়। 'কৃষি' প্রবন্ধে মনু, পরাশর হইতে আরম্ভ করিয়া ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদ সকলই আছে—আবার বিষয় হিসাবে কিছুই নাই। লেখক কি মনে করেন যে বিবিধ গ্রন্থ হইতে রাশি রাশি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সেই সঙ্গে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে বসাইয়া দিলেই একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ হইল? 'রত্নমালায়' ৭টী সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থ বাঙ্গালা কবিতায় লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই—কবিতা পদবাচ্য নহে। অনুবাদ যথাযথ হইয়াও যদি নীরস হয় তাহা হইলে নিন্দনীয় হইয়া থাকে; কিন্তু 'ভাবার্থ' যদি উক্ত দোষে দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহা নিন্দনীয় হওয়া দূরে যাক্—গ্রহণীয়ই হয় না। লেখকের এ পণ্ডশ্রম কেন? 'পথিক'—কোন মুসলমান লেখকের রচনা। প্রবন্ধটি আধ্যাত্মিক ভাবে লিখিত হইয়াছে—মন্দ হয় নাই। 'ভিক্ষা'—কোন মহিলা রচিত একটী কবিতা। এই কবিতার ফুটনোটে সহঃ সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থই এই কবিতাটি প্রকাশিত হইল।" কবিতাটী যে প্রকাশযোগ্য নহে

সেকথা সহঃ সম্পাদক মহাশয় প্রকারান্তরে নিজের কথাতেই স্বীকার করিতেছেন। আমাদের মতে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অনুরোধে পড়িয়া কবিতাটী প্রকাশিত না করিয়া লেখিকাকে কবিতার মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ দিলে উৎসাহদাতার অধিকতর পুণ্য লাভ হইত। 'কবির স্বপ্ন'—লেখক বলিতেছেন, "স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাকে ভালবাসার বাসনা বড়ই বলবতী হইয়া উঠে।" বেশ কথা! লেখক স্ত্রীলোকদিগকে খুব ভাল বাসুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ উন্মাদের 'স্বপ্নের' অঙ্কুর যত উদ্গম না হয় ততই মঙ্গল। আর এক কথা, এই প্রবন্ধ যখন অপর কোন মাসিক পত্রে স্থান পাইয়াছিল তখন আবার নূতন করিয়া পুনঃ মুদ্রিত করিবার আবশ্যক কি? সহঃ সম্পাদক মহাশয় কি ইহারও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছেন? "মক্কাতীর্থ" প্রবন্ধটি বেশ চলিতেছে।

The Light—প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। আমরা এই পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটী মহৎ। আমরা বিধাতার নিকট এই নবজাত ইংরাজী মাসিক খানির সফলতা কামনা করি। বর্ত্তমান সংখ্যায় সর্ব্ব প্রথমেই Noble Deeds "নোবল্-ডীডস্" নামধেয় এক কবিতা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমরা ইহাতে কিছুমাত্র কবিত্ব রস আস্বাদন করিতে পারিলাম না। Pilgrimage to Paramatman "পিল্গ্রিমেজ্ টু পরমাত্ম" নামক প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা ও প্রেমের দ্বারা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইতে পারা যায়। কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল না। "প্রেয়ার অ্যাজ্ এড্ টু রাইট্ থিঙ্কিং" ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। সুতরাং এ সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু মতামত প্রকাশ করা অবিধেয়। "দী ওল্ড ফুল্"—নাট্যাকারে লিখিত একটা নক্সা। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের কতগুলি কার্য্যকে 'কুসংস্কার' বলিয়া অভিহিত করিতেন, এবং বঙ্গ ভঙ্গের পর সেই কুসংস্কারকেই উকীল খাড়া করিয়া যাঁহারা বিদেশী চিনি, লবণ পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন, এই নক্সায় তাঁহাদেরই নিন্দা প্রকটিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে। আমরা কিন্তু লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আজ আমরা যাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিলাম, কাল হয়ত বিরুদ্ধবোধে উহা পরিত্যাগ করিতে পারি। ইহা সকল দেশের সকল অবস্থার লোকেরই কথা। মানব মাত্রেই এই নিয়মের অধীন। আমরা যদি ভ্রমক্রমে কোন কার্য্য করিয়া থাকি এবং পরিশেষে তাহা সংশোধনে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে সেই বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করিয়া একটা নক্সার অবতরণা করা অবিধেয়। "To err is human" এবং "মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম" এই উক্তিদ্বয় কি লেখক মহাশয় ভুলিয়াছিলেন? তিনি কি জানেন না অনুশোচনাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

প্রতাপ ও জাতীয় জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রতাপ যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন তিনি ধনহীন, জনহীন, জানপদহীন ও সম্পূর্ণ সহায়বিহীন। তখন তিনি দেখিলেন রাজভাণ্ডার অর্থ শূন্য, দেশ শস্যশূন্য, দেশবাসীরা অবসাদগ্রস্ত, আত্মীয়েরা তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ব্যস্ত এবং মিত্ররাজ্যেরা শত্রুপক্ষাবলম্বী। তখন তিনি দেখিলেন যে চতুর্দ্দিকে বিপদের দাবানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কোথাও আশ্রয় স্থান নাই! তখন চিতোর গিয়াছে—চিতোরের জয়ঢক্কা পড়িয়া আছে, তন্ত্রী গিয়াছে—এস্‌রাজ পড়িয়া আছে, সুদৃশ্য প্রাসাদ গিয়াছে—চূর্ণাবশিষ্ট ইষ্টক পড়িয়া আছে, মনোমোহিনী জ্যোৎস্না গিয়াছে—যাতনাপ্রদ নিশা অবশিষ্ট আছে। কিন্তু প্রতাপ অসাধারণ ধীশক্তি বলে এই সকল বিপদজালকে একে একে অপসৃত করিয়াছিলেন। এই বিপদসাগরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও তিনি কিছুমাত্র মুহ্যমান হ'ন নাই, বরং সমুৎসাহে এই বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহার সকল যত্ন, সকল চেষ্টাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফলের জন্য তিনি তাঁহার মানসনেত্রে কেবলমাত্র দুইটী পদার্থকেই ধ্রুবতারা স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দুইটী পদার্থ, ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তি। এই উভয়ের সম্মিলনই তাঁহাকে দেবমূর্ত্তি করিয়া তুলিয়াছে, এই উভয়ের সম্মিলনই তাঁহাকে জগতের ইতিহাসে অন্যতম অতুল্য করিয়া রাখিয়াছে।

প্রতাপ সিংহাসন অধিকার করিয়াই বুঝিলেন যে, অমিতপরাক্রমশালী মোগলসম্রাট আকবরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে নিজের ঘরের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। সুতরাং, তিনি সর্ব্বপ্রথমে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কমলমীর ও গোগুণ্ডা এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় দুর্গ সকলকে সুদৃঢ় করিয়া মিবারবাসীদিগকে স্বদেশভক্তির সেই অমৃতময়ী হৃদয়োন্মাদকারিণী বাণীর দ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি যখন দেখিলেন যে, অসংখ্য শিক্ষিত এবং নানা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত মোগল-

দিগের সহিত সমতল ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা তাঁহার ন্যায় ধনহীন, জনহীন নৃপতির পক্ষে একান্ত অসম্ভব, তখন তিনি প্রজাসমূহকে সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের আশ্রয় লইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রচার করিয়াছিলেন যে, যাহারা তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিবে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। বলা বাহুল্য, তাঁহার আদেশ সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল। যে গৃহ বাঙ্গালীর, হায় শুধু বাঙ্গালীরই কেন, সকলেরই নিকট স্বর্গের নন্দনকানন, প্রেমময়ী মাতার আনন, সংসারের কুহক, জীবনের ভেল্কী ও সংসার হ্রদের সুখময় পদ্ম, সেই জগতের সার গৃহকেও মিবারবাসীরা অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমের বলে ত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের হৃদয় তখন স্বদেশ-প্রেমের মহান উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিয়া উঠিয়াছিল, "তোমারে যে ছেড়ে যাই, সে তোমারি প্রেমে।" হায়, পূর্ব্বে যেখানে সারঙ্গের ও এস্‌রাজের সহিত চারণদিগের স্বরকাকলী সপ্তমে উঠিয়া সকলকে মোহিত করিত, যেখানে পূর্ব্বে পুরসুন্দরীরা বীণাবেণুর বিনোদ নিঃস্বনের দ্বারা অন্তঃপুরকে নন্দনকানন তুল্য সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিত, যেখানে পূর্ব্বে অশ্বের হ্রেষারবে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় বীরদিগের হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিত, সেই স্থান আজ প্রতাপের আদেশে শৃগাল, শার্দ্দূল ও শ্বাপদ প্রভৃতির আবাসস্থল হইয়া লোক নয়নগোচর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

যদিও প্রতাপ প্রজাবর্গের সহিত মিবারের সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সমতল ক্ষেত্রের প্রতি যে আজন্মজাত মায়া ও মমতা তাহা তো ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সন্ধ্যাকালে একাকী পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সমতল ক্ষেত্রের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেন এবং বোধ হইত যেন তাঁহার সেই নীরব অশ্রু রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাই বলিতেছে, "দাও প্রাণেশ দাও, আমার চিতোর দাও, আমি ধন চাই না, জন চাই না, মান চাই না, যশেও আমার কাজ নাই, আমার চিতোর দাও, যা করিতে বলিবে প্রভো তাহাই করিব, আমায় চিতোর দাও।" জড়জগতের সহিত প্রাণের এত সম্বন্ধ, হৃদয়ের এত সংযোগ, এত আন্তরিকতা আর কোনও মহাত্মার জীবনীতে পরিদৃষ্ট হয় কিনা জানি না। স্বদেশভক্ত ইংরাজ কবি মুর আত্মীয় কুটুম্বের সহিত, পত্নী পুত্রের সহিত মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া সুন্দরতর প্রদেশে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশের মানবেরা স্বদেশ অপেক্ষা অন্য কোন দেশকে সুন্দরতর

দেখেন নাই। ইহাই ভারতবাসীর বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব প্রতাপেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

কথিত আছে, প্রতাপ তাঁহার আজ্ঞা সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাই দেখিবার জন্য অনুচরগণের সহিত অশ্বারোহণে সমতলভূমি সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন যখন তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন দেখিলেন যে একটী মেষপালক বুণা নদীতীরবর্ত্তী ওণ্টাগো নামক চারণভূমিতে মেষ চরাইতেছে। তৎক্ষণাৎ প্রতাপ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া যখন সদুত্তর পাইলেন না, তখন অবাধ্যতার জন্য, তাহার হত্যাসাধন করিলেন এবং পরিশেষে অপরকে ভীত করিবার জন্য তাহার দেহ বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। এই কার্য্যটীর জন্য কতিপয় বৈদেশিক ঐতিহাসিক প্রতাপের চরিত্রের উপর নিষ্ঠুরতার আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎসাময়িক অবস্থা স্মরণ করিলে কখনই আমরা ইহাকে "নিষ্ঠুরতা" আখ্যায় আখ্যাত করিতে পারি না। তখন কে শত্রুপক্ষীয় আর কে মিত্রপক্ষীয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অপিচ, যে দুরাত্মা সামান্য শস্যের লোভে মহামান্য দেশনায়ক মহারাণার আজ্ঞা অমান্য করিতে পারে, সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে, স্বদেশের দুর্গতি যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে না, সেই নরাধম যে অধিকতর অর্থ লাভের প্রত্যাশায় দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না, তাহারই বা স্থিরতা কোথায়? সে কেবলমাত্র রাণার প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নাই, সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে সে আঘাত করিয়াছিল, পূজ্যতমা মাতৃভূমির প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সুতরাং নিধনই তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছিল।

প্রতাপ রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্যসমূহের সংস্কার করিয়াই মোগলদিগের অনিষ্ট সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা যে তাঁহার সোণার চিতোর কাড়িয়া লইয়াছে, এ অপমান তাঁহার তেজস্বী প্রাণে সহ্য হইল না এবং তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবার মানসে, সুরাট হইতে মিবারের মধ্য দিয়া দিল্লীতে যে সকল বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি আনীত হইত, তাহাই লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সুতরাং আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অগণিত সুশিক্ষিত সৈন্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া আজমীরে তাঁহার প্রধান সৈন্যাবাস স্থাপন করিলেন।

ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা না ঘটিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে জাতিগত ও আচারগত পার্থক্য আছে, তাহা ক্রমশঃই ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইত। কিন্তু প্রতাপ এই সময়ে অসাধারণ দূরদর্শিতার বলে হিন্দুসমাজের রক্ষা সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অম্বরাধিপতি মানসিংহ যখন সোলাপুর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি মিবাররাজ প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপও হিন্দু যেমন অতিথিসৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি কমল্মীর হইতে উদয়সাগর অবধি অগ্রসর হইয়া বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। পরিশেষে আহার প্রস্তুত হইলে মানসিংহ যখন আহার করিতে বসিলেন, তখন প্রতাপের জ্যেষ্ঠ তনয় অমরসিংহ কহিলেন যে, তাঁহার পিতা শিরঃপীড়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তজ্জন্য মানসিংহ যেন মনে কিছু না করেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন রাণার এই অভ্যর্থনা স্বীকার করেন। ইহা শ্রবণ করিয়াই মানসিংহ কহিলেন, "আমি তাঁহার শিরঃপীড়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। রাণাকে বল, যে ভুল হইয়াছে, তাহার আর এখন সংশোধন হয় না; তিনি যদি আমার সম্মুখে পান পাত্র না দেন তো কে দিবে?" তখন রাণা বাহিরে আসিয়া ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে ব্যক্তি তুর্কীর সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত আহার করে, তাহার সহিত রাণা আহার করিতে পারেন না। ইহাতে মানসিংহ কেবলমাত্র কতকগুলি অন্ন উষ্ণীষে গুঁজিয়া লইলেন এবং গমনকালে কহিলেন, "রাণা তোমারই সম্মানরক্ষার জন্য আমরা আমাদিগকে, আমাদের ভগ্নী কন্যাকে তুর্কীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি যদি তোমার এইরূপই প্রতিজ্ঞা হয়, তবে বিপদে অবস্থান কর, তোমার দেশ তোমাকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।" এবং তৎপরে অশ্বারোহণ করিয়া উদ্ধত মানসিংহ কহিয়াছিলেন, "যদি যুদ্ধে তোমার গর্ব্ব বিনাশ না করিতে পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" ইহাতে প্রতাপ উত্তর করিলেন যে, তিনি সদাসর্ব্বদাই তাঁহার সহিত যুদ্ধে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একজন সামন্ত কহিয়া উঠিল, "যুদ্ধকালে তোমার ফুপা আকবরকে আনিতেও ভুলিও না।" মানসিংহ চলিয়া গেলে পর, মানসিংহের সংস্পর্শে সেই স্থানটী

ও পাত্রস্থ অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি অপবিত্র হইয়াছে এইরূপ ভাবিয়া অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই স্থানটী ধৌত করা হইয়াছিল।

এই ঘটনাটী উপলক্ষ করিয়া অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই ঘটনাটী উপলক্ষ করিয়া, তাঁহার রচিত "সৎনাম" নামক নাটকে প্রতাপের চরিত্রের উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রতাপ যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা ভেদবুদ্ধি হেতু। যখন বীরবর অম্বর ঈশ্বর মানসিংহ রাণার আলয়ে আসিয়া অতিথি হইলেন, তখন রাণা বাদসাহে ভগিনীঅর্পণের জন্য মানসিংহের সহিত একত্রে আহার করিতে অস্বীকার করিলেন ; এই অভিমানে বন্ধু ভেদ হইল, হলদিঘাটে রাজপুত রাজপুত প্রতিবাদী হইল। কিন্তু যদি মহারাণা অভিমান ত্যজিয়া মুসলমান-দিগের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ রাজপুতগণকে সম্মান দান করিতেন তাহা হইলে তাহারা রাণাকে নেতৃপদে বরণ করিত, এবং পুরে একত্র হইয়া মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিত। যদি মুসলমানের সংস্পর্শে সত্যই পাপের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে মহারাণা তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মোক্ষ অধিকারী হইতে পারিতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবুর মতের সহিত আমাদের মতের আদৌ ঐক্য নাই। আমরা নিঃসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি যে প্রতাপ মানসিংহের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, সেই ব্যবহারের জন্য প্রতাপের "মোক্ষ অধিকার" কিছুমাত্র কমিয়া যায় নাই এবং সেই ব্যবহারের জন্য সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় আজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। ইহাও বলিতে প্রস্তুত আছি, যে এই ঘটনাটী তাঁহার চরিত্রকে আরও মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে, এবং আমাদের চক্ষের সম্মুখে অধিকতর পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। কেবলমাত্র এই ঘটনাটীর দ্বারাই আমরা প্রতাপের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতার, অসীম ধর্ম্মানুরাগের, অত্যধিক সামাজিক আচার-পালন-প্রিয়তার ও অলোকসাধারণ স্বদেশভক্তির চরম পরিচয় পাইয়া থাকি। এই স্থলেই আমরা প্রতাপকে ভারতবর্ষের, হিন্দুর প্রতাপ বলিয়া জানিতে পারি।

গিরিশবাবু যে কহিয়াছেন, "যদি বাদশাহে ভগিনীঅর্পণ রাণার ঘৃণার

কারণ না হইত এবং যদি প্রতাপ মানসিংহের সহিত একত্রে আহার করিয়া মুসলমানদিগের সহিত সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ রাজপুতগণকে সম্মাননা দান করিতেন, তাহা হইলে তাহারা রাণাকে নেতৃপদে বরণ করিত এবং একত্র হইয়া মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিত"—এই কথায় আমাদের আদৌ আস্থা নাই। আমাদের বিশ্বাস "হলদীঘাটে যে রাজপুত রাজপুত প্রতিবাদী" হইয়াছিল, তাহার কারণ প্রতাপের "ভেদবুদ্ধি" নহে, তাহার যদি কোনও কারণ থাকে তবে সেই কারণ, তখনকার রাজপুতদিগের হৃদয়-হীনতা, প্রাণের সঙ্কীর্ণতা ও স্বদেশভক্তির দীনতা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তখনকার জাতীয় জীবনের সহিত আমাদের আধুনিক জাতীয় জীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে। এখনকার ন্যায় তখনকার হিন্দুরা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, সম্মান লাভ করিবার জন্য, মুসলমান সম্রাটদিগের পদলেহন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না, কিন্তু কোনও স্বাধীন হিন্দুনরপতির নিকট অবনতি স্বীকার করিতে তাহারা মরমে মরিয়া যাইত। হায়! এই রূপই তাহাদের আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল। যে মানসিংহ আকবরকে "শাহান সা" প্রভৃতি শ্রুতিমধুর সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না, যে মানসিংহ "শাহান সার" সম্মুখে করযোড়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিতেন না, যে মানসিংহ "শাহান সা"দের তৃষা নিবৃত্তির জন্য আপনাদের কুলললনাকে ডালি দিয়া আত্মসম্মানরক্ষা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, সেই মানসিংহ আজ, প্রতাপ তাঁহার সহিত আহার করিলেন না বলিয়া, আত্মসম্মানে আঘাত পাইলেন! হায়, মানসিংহ, এত আত্মসম্মানজ্ঞানের শিক্ষা কোথায় পাইয়াছিলে?

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

কালীঘাটের ইতিবৃত্ত।

বঙ্গদেশে—শুধু বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি কালীঘাটের নাম শুনেন নাই বা তথায় যান নাই। ইহা

হিন্দুদের একটী মহাতীর্থ বলিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ স্বীয় পরিবারবর্গ লইয়া বৎসরে অন্ততঃ একবারও তথায় গিয়া দেবীদর্শন ও তাঁহার পূজা দিয়া থাকেন। হিন্দুগণ কোন শুভকার্য্য উপলক্ষে বা নিজ অভিলাষ সিদ্ধ হইবার মানসে মানসিক করিয়া সফলকাম হইলে তাঁহার পূজা দেওয়ার নিয়ম করিয়াছেন। কলিকাতা বা তাহার উপনগরনিবাসীদের তো কথাই নাই, বঙ্গদেশের অতি দুর প্রদেশ হইতেও বঙ্গবাসিগণ আসিয়া দেবীর পূজা ও বলির ব্যবস্থা করেন। কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ, অথবা বিষয় আশয় সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বা ফৌজদারী অভিযুক্ত মোকদ্দমায় জয়লাভ প্রভৃতি বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে ত হিন্দুস্থানের মধ্যে কালীর পূজা দেওয়া প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীদের বিবাহের পর গাঁটছড়া খুলিবার সময় কালীর সম্মুখে আসিয়া খুলিবার নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্র কন্যার অন্নপ্রাশন দিতে হইলে কালীর অন্নপ্রসাদ আনাইয়া তাহাই পুত্র কন্যার মুখে দিবার রীতি হইয়াছে। পীড়া আরোগ্য হইলে কালী সম্মুখে হোম জাগ করা ও কালীর জবাপুষ্প দ্বারা পূজা দেওয়াও নিয়ম হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পুত্র কন্যার মাথার জট ফেলিতে হইলে কালিঘাটে গিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ অনেক ব্যাপার বঙ্গবাসীরা কিছু নিয়মিত রূপে করিয়া থাকেন। কেবল বঙ্গদেশবাসী নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসিগণ এমন কি সুদূরস্থিত নেপাল, কাশ্মীর, লাহোর, পাতিয়ালা, আগ্রা, দিল্লী, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মহীশূর হইতেও যাত্রী আসিয়া কালীর পূজা দিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, সকলেই কালীঘাটকে একটী মহাতীর্থ বলিয়া জানেন। কিন্তু এই তীর্থের ইতিহাস অর্থাৎ ইহা কেন মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল, কালীর প্রতিমূর্ত্তি কে নির্ম্মাণ করিল ও প্রতিষ্ঠা করিল, এই মূর্ত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত কি, কালীর কি প্রকারে ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, ইহার কোন দেবোত্তর বিষয় আছে কিনা, যদি থাকে তাহা কে করিয়া দিল ইত্যাদি তথ্য বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। এই সকল তথ্য জানিবার জন্য ব্যক্তি মাত্রেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। তাহাদের সেই কৌতূহল নিরাকৃত করিবার জন্য এবং এরূপ একটী তীর্থের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীদের বিশেষ আদরণীয় হইবে জানিয়া আমি নিজের সাধ্যমত ও যত্নসহকারে এ বিষয় সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি পাঠকবর্গ ইহার মধ্যে কোন স্থল অসংলগ্ন বা বিসদৃশ বোধ করেন, তাহা জানাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিব।

কালীঘাট বা কালীর ঘাট দ্বারা কালীর মন্দিরের সম্মুখস্থ নদীতে যে ঘাট আছে, তাহাই বুঝায়। এই ঘাট হইতেই এই স্থানের নাম কালীঘাট হইয়াছে। কালীঘাট অভিধেয় স্থানটী কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার চতুঃসীমাই বা কি তাহা লিখিতে হইলে বলা উচিত যে, পূর্ব্বকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার উত্তর সীমা ভবানীপুর, পূর্ব্ব সীমা বেলতলা, দক্ষিণ সীমা সাহনগর এবং পশ্চিমে আদি গঙ্গা বা টলির নালা। এই চতুঃসীমাবদ্ধ জমীর পরিমাণ প্রায় ৬০০ বিঘা এবং তাহা দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি। তন্মধ্যে ১ বিঘা ১১ কাঠা এবং ৩ ছটাক জমীর উপর দেবীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন কতকগুলি অন্যান্য গৃহ অবস্থিত। এই মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ১০০ ফুটের মধ্যে কালিকুণ্ড হ্রদ আছে। মন্দিরের তোরণ বা বহির্দ্দার গঙ্গার ঘাটের ঠিক সম্মুখে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই তোরণের উপরে নহবৎ খানা নির্ম্মিত। মন্দিরের ঈশান কোণে ৩০০ ফুট অন্তরে নকুলেশ ভৈরব একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দালানে বিরাজিত আছেন। দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তরময়, কেবল জিহ্বা ও হস্তচতুষ্টয় স্বর্ণময়।

কালীঘাট ৫১টী পীঠস্থানের মধ্যে একটী। ইহা পীঠস্থান বলিয়া কেন পরিগণিত হইল তাহার বিবরণ পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি হিমালয় পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী গঙ্গোপকূলে অবস্থিত হরিদ্বার নামক স্থানে বৃহস্পতি উৎসব নামক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞোপলক্ষে সমগ্র দেবগণ ও ঋষিগণকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাঁহার কন্যা সতী পিতৃযজ্ঞে যাইবার জন্য শিবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শিব প্রথমে অসম্মত হইলেও, অবশেষে তথায় যাইতে সতীকে অনুমতি দিয়াছিলেন। সতী যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সকলকেই অর্ঘ প্রদান করা হইয়াছে, কেবল শিবের অর্ঘ রাখা হয় নাই। সতী পিতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অর্ঘ প্রদান করা দূরে থাকুক, শিবের অত্যন্ত নিন্দাবাদ এবং তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্যপ্রয়োগও করিয়াছিলেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যজ্ঞে নিজদেহ পরিত্যাগ করিলেন। সতীর মৃত্যুতে শিব ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিলেন এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া পাগলের ন্যায় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহা সন্দর্শনে ত্রিভুবনে এমন কি দেবতারাও পর্য্যন্ত

স্তম্ভিত ও ভীত হইল। সকলের শঙ্কা দূরীকরণার্থ বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতী-দেহ ৫১ অংশে বিভক্ত করিলেন। শিব সেই অংশগুলি যথেচ্ছাক্রমে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে সতীদেহের এক এক অংশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানগুলি এক একটী পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা শক্তি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এক এক পীঠস্থানে এক এক মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং শিব স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ প্রত্যেক পীঠস্থানে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞের বিবরণ কোন পুরাণে নাই, কেবল মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ২৮৪ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। বরং তথায় পার্ব্বতী হিমালয়ের কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর সতী যে দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নারদ-পঞ্চ-রাত্রের ৩য় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সতীর প্রাণত্যাগ সত্যযুগে ঘটিয়াছিল, কেবল এইমাত্র আভাষ আছে। যাহা হউক, ইহা কিম্বদন্তীমূলকই হউক বা জন-সাধারণের স্বকপোল কল্পিতই হউক, স্থূল কথা এই যে, সতীদেহের ৫১ অংশে যে ৫১ পীঠ সমুদ্ভূত হইয়াছে, হিন্দুগণ তাহা বিশ্বাস করেন। ঐ ৫১ অংশের মধ্যে সতীর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কালীঘাটে পতিত হইয়াছিল, সেই কালীঘাট একটী পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তথায় কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং শিব নকুলেশ-ভৈরব নামে অভিহিত হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তিতে তথায় অবস্থান করিতেছেন। কালীঘাটের যে অংশটী পবিত্র ভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে তাহা ত্রিকোণাকার। উহা দক্ষিণেশ্বর হইতে কালীঘাটের দক্ষিণ প্রদেশস্থিত রাজ-পুরের অগ্নিকোণে আকুনা গ্রামের সমীপবর্ত্তী বেহুলা বা বোলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সতীর চরণাঙ্গুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাস এতদূর প্রবল যে, তাঁহারা বলেন যে উহা এখনও পর্য্যন্ত অবিকৃতভাবে রক্তমাংসবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য বলিতে পারি না; কিন্তু প্রতি বৎসর ৺জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিবস ও অম্বুবাচীর দিবসে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উহায় অভিষেক হয়। ইহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা বিবেচনাধীন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, অতি পুরাকাল হইতেই হিন্দুরা মিসরবাসীদের ন্যায় মৃতদেহ অবিকৃতভাবে দীর্ঘস্থায়ী করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিল অর্থাৎ উক্ত কৌশল তাহাদের অবিদিত ছিল না। দেবীভাগবত গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষও লক্ষিত হইয়া থাকে।

কালীঘাট কোন্ সময়ে তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সাধারণের নিকট কালীঘাট ও দেবীর বিষয় পরিচিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলময় ও হিংস্রক জন্তুর আবাসভূমি ছিল। কিন্তু এই স্থান লোকের পরিজ্ঞাত হইবার পর ইহা যে কালীঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে তাহা নিসংশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে। মনুর সময়ে আর্য্যগণ এলাহাবাদ অর্থাৎ প্রয়াগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু লোকের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে এলাহাবাদের পূর্ব্বপ্রদেশ লোকের আবাসভূমি হইয়াছিল। বঙ্গ দেশের পুরাতন নাম পৌণ্ড্র। তথায় জাতিচ্যুত ক্ষত্রিয়গণ বাস করিত। মনুর পর বঙ্গদেশের উত্তরাংশ আর্য্যগণের অধিকারভুক্ত হয় নাই। রামায়ণে গঙ্গাসাগরের কপিলাশ্রমের বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু রামায়ণ মনুর পরে লিখিত। সুতরাং ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুর পর আর্য্যগণ সাগর অর্থাৎ যাহাকে বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal) বলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকারে আনিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা ঈক্ষাকু অযোধ্যা-রাজ্য স্থাপন করেন এবং সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ অনার্য্যদিগকে তাহাদের নিবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহাদেরই শাসনকালে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণ সাগরের উপকূলে আপনাদের আশ্রম সংস্থাপন করেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৩০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ভীম তাম্রলিপ্তের (তমলুক) পূর্ব্ব প্রদেশস্থিত রাজন্যবৃন্দকে পরাভূত করেন। এই তাম্রলিপ্ত সাগরের সমীপবর্ত্তী। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সেই সময়ে বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রদেশে মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল। কিন্তু যদিও কপিলাশ্রম ও তাম্রলিপ্ত কালীঘাটের অতি সন্নিকটে অবস্থিত এবং যদিও রামায়ণে কপিলাশ্রমের ও মহাভারতে তাম্রলিপ্তের বিবরণ আছে, তত্রাচ উক্ত পুস্তকদ্বয়ে কালীঘাটের বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয় তখন ঐ স্থান জঙ্গল ও জলা ভূমিতে আকীর্ণ ছিল। বঙ্গদেশ সমতট বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে। তাহা হইলে কালীঘাট সমতটে অবস্থিত।

ইউরোপীয় ভূবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রদেশ নিম্নভূমি ছিল। কালসহকারে ক্রমে ক্রমে উহা ভরাট হইয়া উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এস, এ, হিল (S. A. Hill) কৃত প্রাকৃতিক ভূগোলের ৪৪ পৃষ্ঠায় এবং ব্লানফোর্ড (Blanford) কৃত প্রাকৃতিক ভূগোলের ৫৩ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় ইহার

সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশ সমুদ্রের সমতল হইতে বহুকালে উচ্চ ভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নদীর বালুকাময় ধোয়াট ও পলি অল্পে অল্পে এ প্রদেশে একত্রীভূত হইয়া ইহাকে পুষ্ট করতঃ ইহার উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। সুতরাং উহা অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং কপিলাশ্রম ও তাহার বিবরণ মহাভারতে থাকিতে পারেনা এবং পুরাণ প্রবর্ত্তিত সময়ে জঙ্গল ভূমিরও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মগধদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু অবরোহপ্রণালী ক্রমে ইহার পঞ্চবিংশতি পুরুষ। রাজা অজাতশত্রুরই রাজত্বকালে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। সেই সময়ে উত্তর বঙ্গে রাজা সিংহবাহু রাজত্ব করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ প্রজাদিগের অত্যন্ত পীড়ন করিতেন। সেইজন্য রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ ও সভাসদবর্গ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহ অর্ণবপোত আরোহণ পূর্ব্বক ভাগীরথী নদী পার হইয়া সমুদ্রপথে সিংহলদেশে গমন করেন এবং খৃষ্টাব্দ ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তথাকার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বৎসরেই বুদ্ধদেব 'নির্ব্বাণ' প্রাপ্ত হন। এই বিবরণ সিংহলের ইতিহাসে লিখিত আছে। কিন্তু বিজয় সিংহের ভাগীরথী পার হইয়া সমুদ্র যাত্রার বিবরণে বঙ্গদেশের কালীঘাট নামক কোন নগর বা গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, সে সময়ে কালীঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

মগধরাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবার পর পালবংশীয় নৃপতিগণ খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও এ সময়ে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করাতে বৌদ্ধধর্ম্ম মগধরাজ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তান্ত্রিক ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ধর্ম্মের ভিত্তি নির্ব্বিবাদে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কারণ পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই; বরং তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণকে দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি পালবংশীয় নৃপতিগণ আপনাদের মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন *। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, তান্ত্রিক পূজা এই সময়ে বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

* See Asiatic Researches vol. I. page 131 and vol. V. page 132.

উপপুরাণ ও তন্ত্রোক্ত কালীক্ষেত্র কালীঘাটের নামান্তর মাত্র। স্থূলকথা এই যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ও তান্ত্রিক পূজা প্রচার, এই দুই ঘটনার অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে কালীঘাট বা কালীপীঠ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মগধ ও বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নৃপতিগণের রাজত্বকালে ভারত বাণিজ্য-বহুল দেশ ছিল এবং ইহার বাণিজ্য বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে সময়ে হিন্দু বণিকগণ ভাগীরথী দিয়া নির্ভয়ে জলযানে গমনাগমন করিত এবং সিংহল, জাভা, সুমাত্রা দ্বীপে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিত। তাহারা বিপত্তিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই কালীক্ষেত্রের মহামায়ার পূজা দিত। * হিন্দুরা স্বভাবতঃ বড়ই ধর্ম্মভীরু। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রশস্ত দিন দেখিয়া থাকেন এবং দেব দেবীর পূজা দিয়া থাকেন। এ নিয়ম এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

কালীঘাট নদীতটে অবস্থিত সুতরাং তাহারা এই স্থানে দেবীর পূজা সমাধান করিয়া জাহাজে আরোহণ করিত। নাবিকগণ জাহাজ নঙ্গর করিয়া যে স্থান দিয়া অবতরণ করিত সেই স্থানটী কালীর ঘাট বা কালীঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এই রূপেই কালীঘাটের নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে কালীঘাটের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কেবল মাত্র মন্দির ও তৎসংলগ্ন সামান্য জমীকেই কালীঘাট বলা যাইত।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক লোক কালীঘাটের সম্মুখস্থ গঙ্গা বা আদি গঙ্গায় স্নান করিয়া পাপক্ষয় করিবার জন্য তথায় আগমন করিত। এখনও পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত আছে। উত্তর বা পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিবাসিগণ কোন পর্ব্বের দিন বা বিশেষ কোন যোগের দিন আদিগঙ্গায় ডুব দিয়া পাপ ধ্বংস করিবার মানসে এখনও কালীঘাটে আসিয়া থাকেন। গৌড়ের সেনবংশীয় নৃপতিগণ শৈব ও শক্তি মন্ত্র উপাসক ছিলেন। বল্লালসেন কৃত বঙ্গদেশের পঞ্চ বিভাগের মধ্যে বাগ্রী বিভাগে কালীঘাট অবস্থিত। সুতরাং বল্লাল সেনের সময়ে কালীঘাট জঙ্গলময় ছিল না এবং সে সময়ে উহা লোকের অবিদিতও ছিল না। † ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

---

* See Vincent's Commerce and Navigation of the Ancients vol. II. page 283.

† শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাধনা-সমিতির উনবিংশ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় ও সত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক পঠিত।—সহঃ সম্পাদক।

নীল কুঠী।

(১)

প্রভাতে এরূপ বিপজ্জনক টেলিগ্রাম পাইয়া কালবিলম্ব না করিয়াই পটলডাঙ্গায় ভূপেনকাকার বাসায় ছুটিলাম। মহেশপুরের বাবুদের বাড়িতে ভূপেনকাকা বহুদিন কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বিষয় তিনি যত জানেন, এমন কেহও জানে না। নানারূপ সমস্যা আমারও মনের মধ্যে স্থান পাইতেছিল। সুতরাং একেবারে পটলডাঙ্গায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীর নিকটস্থ হইয়া দেখি ভূপেনকাকার দারোয়ানকে ঘিরিয়া কতকগুলা বালকবালিকা তাহার চতুর্দ্দিকে হাত তালি দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া ঘুরিতেছে আর বলিতেছে "তোমারা টিকিমে রাধাকিষণ"। প্রায় নগ্নদেহে লোটা হস্তে দারোয়ানজি এক এক বার এক একটি বালকের দিকে ধাবিত হইতেছে ও পুরবী ভাষায় বিড়বিড় করিয়া বকিতেছে। আমাকে দেখিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অভিবাদন করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবু উঠেছেন?" অর্দ্ধ হিন্দি অর্দ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পাঁড়েজি বুঝাইয়া দিল যে কি একটা জরুরি কার্য্যে বাবু প্রভাতে উঠিয়া শিয়ালদহ ষ্টেসনে গেছেন। মফঃস্বল থেকে আসিতে বাবুর তিন চারি দিন বিলম্ব হইবে।

আমি বিস্মিত হইলাম। কি এমন প্রয়োজনে তিনি প্রত্যূষেই মফঃস্বলে চলিয়া গেলেন! দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ জায়গায় তিনি গিয়াছেন বলিতে পার?" সে বলিল, "আমরা নোকরলোক বাবু, এত কথা কি জানি?"

এমন সময় দেখিলাম নরেন্দ্র আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। আমাকে দেখিয়া বলিল—যোগিন্ দা' তুমি মহেশপুর যাও নাই? ব্যাপারটা বড় লোমহর্ষণকর ব'লে বোধ হয়।

আমি বলিলাম—ওঃ তবে তোমরাও খবর পেয়েছ? ভূপেন কাকা বুঝি মহেশপুরেই গেছেন?

নরেন্দ্র বলিল—হ্যাঁ; ট্রেণের এখনও আধ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে। বাবার অভ্যাস ত জান, আগে থেকে ষ্টেসনে গিয়ে বসে থাকেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সংকল্প করিলাম আর বৃথা সময়াতিবাহিত করা অবিধেয়। যে কার্য্য করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া

কি করিব? এ উপস্থিত বিপদের কাছে ত সে কার্য্য কিছুই না। সুতরাং তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বাসা হইতে জিনিস পত্র লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ষ্টেসনে গেলাম। গাড়িতে উঠিয়াই ভূপেন কাকাকে দেখিতে পাইলাম।

ভূপেনকাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে ব্যাপারটা কি বল্‌তে পার?

আমি বলিলাম—কিছুই ত বুঝিতে পারি নাই, হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইলাম, তিন দিন হইতে অবনী হারাইয়াছে; কোনও খবর নাই।

মহেশপুরের জমীদার গিরিশ রায়, মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি আপন পৌত্র অবনীর নামে উইল করিয়া যান। আপন পুত্রদ্বয় পুরুষোত্তম রায় ও বৃন্দাবন রায় একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুরুষোত্তম যৌবনাবধি কুসংসর্গে পড়িয়া বিলাস ব্যসন শিক্ষা করিয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন বাল্যাবধি ধর্ম্মচর্চ্চা লইয়া এক প্রকার সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিষয়ী গিরিশ রায়ের বহু অনুনয়েও কোন মতে পুত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। গ্রামের প্রান্তস্থিত ঠাকুরবাটিতে বৃন্দাবন বাস করিতেন এবং বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া আপনার শাস্ত্রাধ্যয়ন লইয়া থাকিতেন।

বৃদ্ধ যখন ইহলীলা সম্বরণ করেন তখন পুরুষোত্তমের পুত্র অবনীর বয়স তিন বৎসর। তাহার পর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। গিরিশ রায়ের উইল অনুসারে পুরুষোত্তম পৈত্রিক অট্টালিকায় বাস করিতে পাইতেন। পিতৃ উইল অনুসারে তাঁহার যে মাসিক দুই শত টাকা নিজস্ব আয় ছিল তাহাতে বিলাসী পুরুষোত্তমের কোনও অভাবই মোচন হইত না। ম্যানেজার ভূপেন বসুর সহিত তাঁহার এজন্য নিত্যই মনোমালিন্য হইত এবং আজ বারো মাস কাল আমি তাঁহার পদে সমাসীন হইয়া, অবধি বড় বাবুর নানা অত্যাচার সহ্য করিতেছিলাম। দশম বর্ষীয় পুত্র অবনীও পিতৃপক্ষ সমর্থন করিয়া মাঝে মাঝে আমার সহিত কলহ করিত। আমি কিন্তু কোনও মতেই কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের বজেটের অধিক খরচ করিয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারিতাম না।

সমস্ত পথ ভূপেনকাকা এক প্রকার মৌনভাব ধারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম তিনি নিশ্চিন্ত নহেন, আপনার মনের মধ্যে সমস্ত ঘটনাবলী পূর্ব্বাপর ভাবিতেছেন ও সে গুলিকে মনে মনে বিচার করিতেছেন।

(২)

তখন সন্ধ্যা হইতে সামান্য মাত্র বিলম্ব আছে। আমি ক্রমশঃ ভূপেনকাকার উপর শ্রদ্ধা হারাইতেছিলাম। ছেলে চুরি হইয়াছে তজ্জন্য লোক জন ঘুরিতেছিল, দেশ বিদেশে খবর গিয়াছিল, স্বয়ং কালেক্টর সাহেব পত্রে আমাকে তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন, দারোগা মহাশয় কয়দিন ধরিয়া চব্যচুষ্য আহার করিতেছিলেন, এ সব ত বেশ হইতেছিল। এ সকল স্বত্বেও ভূতের মত যত অগম্য স্থানে ঘুরিয়া কি লাভ তাহা ভূপেনকাকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না।

ভূপেনকাকা বলিলেন—ওহে রোসো রোসো, অত হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি করিলে কাজ হয় না, ও দরজাটার দিকে যেওনা।

আমি অপরাধী বালকের মত ভয়ে দরজার নিকট হইতে সরিয়া আসিলাম, ভূপেনকাকার মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন—দেখিতেছ ?

আমি বলিলাম—মাথামুণ্ড কিছুই ত দেখিতেছি না।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—এ দরজাটি কখনো খোলা হয় না, তা জান ত ?

আমি বলিলাম—তা ত' জানি। এখনও ত দেখ্‌ছি চাবি দেওয়া রয়েছে।

তিনি বলিলেন—এর চাবি ত' তোমার কাছে থাকে, একবার চাবিটা আনো দেখি।

আমি চাবি আনিলাম। তিনি সেই গোধুলির আলোকে বেশ করিয়া চাবিটিকে পরীক্ষা করিলেন। শেষে তালাটি পরীক্ষা করিয়া চাবি খুলিলেন।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কাকা এ পোড়ো দরজাটার উপর এত ঝোঁক কেন ?

তিনি বিরক্ত হ'য়ে বলিলেন—তোমার বুদ্ধিটা ঠিক্ ঐ পুলিশের দারোগাটার মত। বাড়ী হইতে বাহির হইবার এইটি লইয়া চারটি মাত্র পথ। তিনটি ফটকেই বিশ্বস্ত দ্বারবান থাকে এবং এ বাড়ীর রীতি অনুসারে রাত্রি দশটার পর ফটক বন্ধ হইয়া যায়। বেশ কথা। বউমা স্বয়ং দশটার পর অবনীকে তাহার স্বয়ং গৃহে দেখিয়াছেন। বড় বাবু কখন বৈটকখানা বাড়ী হইতে এবাড়ীতে এসেছেন বলিলে ?

"রাত্রি আন্দাজ একটার সময়।"

"আচ্ছা, রাত্রি আন্দাজ একটার সময়। এই আন্দাজ কথাটা তোমাদের বড় খারাপ। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু নিবারণ বাবু বৈঠকখানা

বাড়ীতে একটা বাজিতে শুনিয়াছেন। সুতরাং একটার কিছু পরেই তিনি এসেছেন।"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ না-হয় তাই হল, তার সঙ্গে এ দরজার সঙ্গে সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্ক যথেষ্ট আছে। তিনি যখন শুইতে আসেন তখন ফটকে চাবি বন্ধ ছিল। চাবি খুলিতে বিলম্ব হয় বলিয়া তাঁহার মোসাহেব নিবারণের সহিত দ্বারবানের বচসা হয় তাহা তোমার দপ্তরের মুহুরিরা শুনিয়াছে। রোসো, তাহার পর গোলমালের সময় তোমার নায়েব হারাধন বাবু স্বয়ং অপর দুইটি ফটক বন্ধ থাকিতে দেখিয়াছে।"

আমি তাঁহার গবেষণার মর্ম্মটা কথঞ্চিৎ বুঝিলাম। বলিলাম—"হ্যাঁ, বড় বাবু আসিলেই বউমা দেখিলেন অবনী শয্যায় নাই।"

ভুপেনকাকা একটু হাসিয়া বলিলেন—"তবে কোন্ মুর্খ এই দরজাটার উপর সন্দেহ না করিবে?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"হ্যাঁ তাও ত বটে। দুই দিন ধরিয়া দারোগা অন্ন ধ্বংস করিতেছে, আর এ সামান্য কথাটা বুঝে নাই?"

ভুপেনকাকা হাসিয়া বলিলেন—"এই দেখ আরও চিহ্ন। এই মাকড়সার জালটা দুই দিকে রহেছে মাঝখানটা নাই। যখন দরজাটা বহুদিন হ'তে অব্যবহৃত হ'য়ে পড়েছিল তখন মাকড়সা এখানে জাল নির্ম্মাণ করে, তার পর সেরাত্রে দরজা খোলা হ'য়েছে ব'লে জালটা ছিঁড়ে গেছে।"

আমি ভুপেনকাকার বুদ্ধিমত্তার মনে মনে একটু একটু প্রশংসা করিতেছিলাম। কিন্তু জাল যে সে দিনে ছেঁড়া হয়েছে তারই বা প্রমাণ কি? পূর্ব্বেও ত ছিঁড়িতে পারে।

ভুপেনকাকা হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ তা পারে। কিন্তু তালাটা তোমায় দেখাতে ভুলে গেছি। তালা খুলিবার জন্য যে স্থানে চাবি প্রবেশ করাইতে হয়, দেখিতেছ না তার উপর একটি দরজার মত ঢাকা রহিয়াছে। অনেক তালায় এরূপ থাকে আবার অনেক তালার একেবারে নাভি দেখা যায়। যখন তালাটি বহুদিন পূর্ব্বে তোমরা বন্ধ করিয়াছিলে তখন এই দরজাটিও টানিয়া নাবাইয়া দাও। অনেকদিন সেই অবস্থায় ছিল বলিয়া ইহার চারিদিকে মরিচা পড়িয়াছিল। সম্প্রতি তালাটি খোলা হইয়াছিল বলিয়া এই জঙ্গে রগড়ান দাগ হইয়াছে। সুতরাং এই দরজা যে সম্প্রতি ব্যবহৃত হ'য়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বাহিরে গেলে আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে।

(৩)

গিরিশ রায়ের অন্তঃপুর বাটীর পশ্চাতে একটা দশ বারো বিঘা ব্যাপ্ত নাবাল জমী। তাহার পর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র নদী। বর্ষাকালে বন্যার জল আসিয়া যখন ক্ষুদ্র নদীটির উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দেয় তখন উত্তরে নদীর সীমা আমাদের এই আলোচ্য দরজাটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। গিরিশ বাবুর আমলে বৃদ্ধারা এই দরজা দিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইতেন বলিয়াই এই নদীর সৃষ্টি। গিরিশ বাবুর গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতেই প্রায় এ দরজাটি বন্ধ থাকে। বর্ষার সময় কদিচ কখন পুরুষোত্তমের স্ত্রী এই দরজা খুলাইয়া নদীতে স্নান করিতেন। ইহার চাবি আমারই নিকটে থাকিত।

দরজা খুলিয়া বাহিরে বাহির হইয়াই ভূপেনকাকা জমী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তিন চারিদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন অনায়াসে তাহা পাইলেন। দরজার বাহিরেই কতকগুলা অস্পষ্ট পদ-চিহ্ন। তাহার পরেই প্রাচীরের পার্শ্বে বরাবর পূর্ব্ব দিকে পদ-চিহ্ন পাওয়া গেল। ভূপেনকাকা এক একটি পদ-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, আর আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমারও তাহাতে বেশ কৌতুক বোধ হইতেছিল।

হাত দশ বারো অগ্রসর হইয়া ভূপেনকাকা বলিলেন—দাঁড়াও, হয়ত আমরা ভুল করিতেছি। একবার দেখে আসি এ পায়ের দাগগুলা পশ্চিম দিকে আছে কি না।

পশ্চিমে কোনও পদ-চিহ্ন পাওয়া গেল না। আবার আমরা পূর্ব্ব দিকে ফিরিয়া আসিলাম। এবার ভূপেনকাকা নিজে নিজে বলিলেন—একজন বাবু আর একজন চাকর। হুঁ! রোসো। বাবুর জুতার গোড়ালিতে লোহার ঠোকর বাঁধান। হুঁ, দুই দিকে দুটো। বাবু আগে, চাকর পিছনে। চাকর পিছনে খালি পা। হুঁ, রোসো।

এক স্থলে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, সে স্থলে খালি পায়ের চিহ্নটা বেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত ছিল। ভূপেনকাকা পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া ঠিক তাহার প্রতিকৃতিটা তুলিয়া লইলেন। পরে জুতার চিহ্নটাও তুলিলেন। যে স্থলে জুতার তলায় লৌহের ঠোকর ছিল বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন, তাহারও একটা চিহ্ন লইলেন।

আবার হাত দুই অগ্রসর হইয়া মৃত্তিকায় পদ চিহ্নের মধ্যে যে স্থলে

ঠোক্করের জন্য একটু গভীর চিহ্ন হইয়াছিল তথায় S T দুইটি হরফ্ দেখিতে পাইলেন। আনন্দে অধীর হইয়া তিনি বলিলেন—হ্যাঁ! Star মার্কা ঠোক্কর। পাড়াগাঁয়ে কয়জনের আছে? বাবু বড় বোকা, এমন চিহ্নও রাখিয়া যায়!

এই পদ-চিহ্ন গুলিতে অপর একটি বিশেষত্ব দেখিলাম। পূর্ব্বে জুতা-ওয়ালা পায়ের এবং তাহার ঠিক ২ ফিট্ ৯ ইঞ্চ পশ্চাতে খালি পায়ের চিহ্ন। এই ২ ফিট্ ৯ ইঞ্চ মাপিতে মাপিতে ভূপেনকাকা যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন যদি দুইটি লোক কেবল শুধু হাতে হেঁটে যায় তা'হ'লে তা'রা নিজেদের মধ্যের ব্যবধানটা ঠিক সমান রাখ্‌তে পারে না। একটা জিনিস দুই জনে ধ'রে যাচ্ছিল ব'লে ব্যবধানটা ঠিক আছে। জিনিসটা কি? অবনী প্রায় ৩॥০ ফিট হ'বে। হ্যাঁ, তাহলেই ঠিক হ'য়েছে। বাবু পিঠের দিকটা ধ'রেছেন আর ভৃত্য ধরেছেন জানুর দিকটা। কোমরটা একটু মাটির দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে। সুতরাং দুই জনের মধ্যে ব্যবধান ২ ফিট ৯ ইঞ্চ।

আমি বলিলাম—আচ্ছা চাকর আগে গেছে কি বাবু আগে গেছেন, তার ঠিক কি?

ভূপেনকাকা হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ তুমি আমাদের দেশের পুলিস দারোগা হ'বার উপযুক্ত। দেখ্‌ছ না বাবুর পায়ের চাপটা গোড়ালির দিকেই বেশী আর চাকরের পায়ের চাপটা সামনের দিকে বেশী। তাহা ভিন্ন অন্য প্রমাণও আছে। গন্তব্য স্থানটা বোধ হয় ভৃত্য ভাল জানিত না।

আরও দুই চার হাত অগ্রসর হইয়া ভূপেনকাকা লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"রোসো, রোসো, অত শীঘ্র না অত শীঘ্র না। দাঁড়াও দাঁড়াও।" সে স্থলে রায়েদের দ্বিতলের বারান্দার দক্ষিণ মুখো একটা জানালা ছিল। জানালার নিম্নকার অংশটা একেবারে বন্ধ তজ্জন্য জানালার গরাদে ছিল না। উপরকার জানালাটা প্রায় বন্ধ থাকিত, কিন্তু সেদিন দেখিলাম খোলা রহিয়াছে। সময়ে সময়ে সেটা খোলাও থাকিত, সুতরাং তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ ছিল না, তাহা ভূপেনকাকাকে বলিলাম।

তিনি বলিলেন—খোলা ছিল তা' আশ্চর্য্য নয় জানি। কিন্তু খোলা ছিল বলিয়া বড় একটা উপকার হ'য়েছে। তাই ত! একেবারে যে অন্ধকার হ'য়ে এল। আজ ত' আর হয় না দেখছি। আচ্ছা কাল ভোরেই হ'বে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ সব কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

(৪)

যে সকল দার্শনিক গলাবাজী করিয়া জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে মানবের সাধারণ প্রবৃত্তি স্বার্থপরতা, সমগ্র মানব মণ্ডলী স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পৃথিবীর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতেছে নিজের স্বার্থের জন্য, আমার বিশ্বাস সে সকল দার্শনিক পণ্ডিত জগতকে অধ্যয়ন করেন নাই। ইংরাজ যেমন নীচ শ্রেণীর ভৃত্যাদির চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর চরিত্রের ধারণা করিয়া লয়, ঐ সকল দার্শনিক তেমনি কতকগুলি স্বার্থান্ধ নীচমনা অনুদার প্রকৃতির পাষণ্ডকে দেখিয়া সাধারণতঃ মনুষ্যকে স্বার্থপর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে দেখিতাম পুরুষোত্তম রায় পুরুষের অধম। নীচ প্রকৃতির সঙ্গী সহিত সর্ব্বদা পশুপ্রকৃতি চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন কাহারও ইষ্টের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না। অথচ স্ত্রী কিম্বা পুত্রের দ্বারা স্বকার্য্য সাধিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার করিত। যখনই স্ত্রীর প্রতি অসাধারণ অনুরক্তি দেখাইয়া বড় বাবু উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন অন্তঃপুরে বাস করিতেন, তখনই বুঝিতাম কিছু অর্থ হস্তগত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অবনী হারাইবার পর মহেশপুরে আসিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার উপর কতকটা শ্রদ্ধা আসিয়াছিল। এ কয়দিন তিনি তাঁহার জঘন্য সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন অবধি করেন নাই এবং তাহার মদ্য পান জনিত লাল মুখ খানি একেবারে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ধন্য পুত্রস্নেহ, ধন্য মানব প্রকৃতি! আপনার প্রিয় পুত্র হারাইয়া কুচরিত্র পুরুষোত্তমও আজ সকলের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর তদন্ত শেষ করিয়া আসিয়া ভূপেনকাকা বলিলেন—আশু, এখন চল অন্দরে একবার বড় বৌমার সঙ্গেদেখা করে আসি, তাঁর মুখে দু'টা একটা কথা শুন্‌লে আমাদের তদন্তের আরও কিছু সুবিধা হইতে পারে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পুরুষোত্তমের স্ত্রী ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শুইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রদীপের আলোকে দেখিলাম তাঁর চক্ষু দু'টি ক্রন্দন স্ফীত।

ভূপেনকাকা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—বৌমা আপনি স্থির হউন, আমি সাত দিনের মধ্যে আপনার পুত্র এনে হাজির করব।

অতি কাতর স্বরে গৃহিণী বলিলেন—"বাছা কি আর বেঁচে আছে যে আর ফিরিয়ে আন্‌বেন। এত চাকর এত দ্বারবান, তবু বাড়ীর ভিতর হ'তে ছেলে চুরি গেল! সে কি আর ফিরে আসবে!" এই কথা বলিয়া তিনি অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে ভূপেনকাকার মুখের দিকে চাহিলেন। ভূপেনকাকার মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলাম তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। দরজার নিকট পুরুষোত্তমের খাস্ খানসামা নবীন দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—ম্যানেজার বাবু, বেলপুকুরে রামা নাপিত মস্ত গুনিন্। একবার তাকে ডেকে দেখ্‌লে হয় না?

ভূপেনকাকা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—রামা নাপিত কি কর্‌বে রে ব্যাটা?

নবীন বলিল—এটা আর বুঝছেন না হুজুর? ভট্টচায্যি মশায়ের কাজ। দাদাবাবুকে কি সে কম্ ভালবাসিত?

যোগেশ ভট্টাচার্য্য এ বাড়ীর একজন মৃত গোমস্তা। অবনীকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। সুতরাং ভৃত্যদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভৌতিক।

নবীনের অনুমান শুনিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ ভূপেনকাকাও সেই পুত্রশোকাতুরার সম্মুখে হাসিয়া ফেলিলেন। গৃহিণী বলিলেন—না ম্যানেজার বাবু কথাটা নেহাৎ হাসিবার নয়। আপনি যদি সে রাত্রে জ্যাকের কাণ্ড দেখিতেন তা' হ'লে বুঝতে পারতেন ব্যাপারটা আসাধারণ। আহা সেদিন সমস্ত রাত্রি কুকুরটা অনবরত চেঁচিয়েছে আর ছুটোছুটি করেছে।

জ্যাকের কথায় ভূপেনকাকার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হইল। তিনি বাহিরে বিশেষ আগ্রহাতিশয্য না দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ দক্ষিণের বারান্দার জানালার কাছে জ্যাক বুঝি বাঁধা থাকে?

নবীন বলিল—হ্যাঁ হুজুর, কিন্তু সে রাত্রে ভয়ে বেচারা লোহার শিক্‌লিটা অবধি ছিঁড়ে ফেলেছিল। নয় মা?

গৃহিণী কিছু উত্তর করিলেন না। তিনি নীরবে জানুর উপর কপোল রক্ষিত করিয়া বাম হস্তে মেজের উপর আঁক কাটিতেছিলেন।

ভূপেনকাকা বলিলেন—জ্যাক কোথা নিয়ে আয়ত দেখি।

নবীন হাসিয়া বলিল—সে অবলা সে কি কথা কহিতে পারে যে কিছু বলতে পারবে। কিন্তু সেদিন থেকে কুকুরটা এক রকম ক্ষেপে গেছে। তাকে মোটা চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। বড় বাবু ব'লেছেন না সার্‌লে সেটাকে গুলি করা হ'বে।

ভূপেনকাকা বলিলেন—না না অমন কাজও করে!

তারপর বড় বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তার সঙ্গে কিছু কথা বার্ত্তা কহিয়া ভূপেনকাকা ফিরিলেন।

বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন—"আশু একবার জ্যাককে না দেখে যাওয়া হবে না। তা'র দ্বারা বিশেষ উপকার হ'বে।" আমি তাহার কথায় বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

ভূপেনকাকাকে দেখিয়া কুকুরটা একেবারে লাফাইতে লাগিল। ভূপেন কাকা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে ছিলেন। মাঝে মাঝে জ্যাক শুইয়া পড়িয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, এবং এক একবার পিছনের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ভূপেনকাকাকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আমি মনে মনে ভাবিলাম—সাপের হাসি বেদেয় চেনে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

প্রতিভা।

"দুই আর দুই-এ পাঁচ"—একথা যদি কেহ বলে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মূর্খ বা পাগল বলিবে। কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে কত শত ব্যাপার হইয়াছে ও হইতেছে যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আমরা তর্কশাস্ত্রের সীমা পদে পদে অতিক্রম করি। শেষে ভ্রান্ত যুক্তির সাহায্যে আপনাদিগকে বাতুল আখ্যা না দিয়াও গণিতের বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। মানব-জ্ঞানের আশৈশব ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীতে যখনই প্রতিভার আলোক প্রকাশ পাইয়াছে, অজ্ঞানতার মায়াবিনী শক্তি তখনই তাহাকে একবার মেঘাচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির কার্য্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। অল্প মেধাবিশিষ্ট সাধারণ মানব সে কার্য্য দর্শনমাত্রে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতেরা তাঁহাকে শয়তানের সহচর মনে করিয়া কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত না গেলিলিও শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না কিন্তু সূর্য্য

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ততদিন তাঁহাকে কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রচলিত ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে প্রতিভাশালী ব্যক্তি যতই কেন যুক্তিপূর্ণ কথার অবতারণা করুন না, প্রতিভাবিহীন বিদ্যাভিমানিগণ আপনাদিগের ভ্রান্ত যুক্তি অনুসরণ করিয়া তাঁহার বাক্য মিথ্যা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন না। কিন্তু সত্যের জয় চিরকাল। প্রতিভার অপলাপ হওয়া অসম্ভব। গেলিলিওর নির্য্যাতনকারীদিগের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু পৃথিবীতে যতদিন বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে ততদিন গেলিলিও ও তাঁহার আবিষ্কারের কথা কেহ বিস্মৃত হইবে না।

প্রতিভার প্রতিমা আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্পী গঠন করিয়াছেন কিনা জানি না। যদি কেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে চিরনূতন পরিচ্ছদে সে প্রতিমাকে আবৃত করিয়া না রাখিলে প্রতিভার সৌসাদৃশ্য রক্ষা হয় নাই বলিব। চিন্তা-রাজ্যে নূতন জ্ঞানের অবতারণা করাই প্রতিভার কার্য্য। ফল সুপক্ক হইলে আপনা হইতে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই যে জড়জগতে এমন একটি শক্তি আছে যদ্দ্বারা বৃন্তচ্যুত ফল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত না হইয়া পৃথিবীর দিকে পতিত হইবে। বৃক্ষ হইতে ফল, ফুল ও পত্রের পতন চিরকাল মানুষ দেখিয়া আসিয়াছে, হয়ত কেহ এই ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুও হইয়াছেন। কিন্তু ইহার রহস্য ভেদ করিতে নিউটনের পূর্ব্বে কেহ সক্ষম হয়েন নাই। কল্পনার চক্ষে কত কবি উপমার রাজ্যে পুষ্পান্বিত বৃক্ষ রোপন করিয়া মানব জীবনের অবসানের সহিত পুষ্পজীবনের মৃত্তিকা শয্যার সাদৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন। বিরহ-কাতরা কত রাজকন্যা পাদপমূলে উপবেশন করিয়া বায়ু প্রক্ষিপ্ত কুসুম স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়াছেন ও ঊর্দ্ধনেত্রে বৃক্ষের প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু যে শক্তির প্রভাবে প্রাকৃতিক জগতের একটি নিত্য ঘটনার মধ্যে মধুর ভাবনিচয়ের সমাবেশ সম্ভবপর হইয়াছিল সেই অদ্ভুত শক্তির অস্তিত্বের বিষয় নিউটনের পূর্ব্বে কেহই আলোচনা করেন নাই। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ আধুনিক বীরমাত্রেই অবগত আছেন যে যুদ্ধে স্থিরলক্ষ্য হওয়া প্রত্যেক সৈনিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তমরূপে স্নান করিলে যে সৈন্যগণের দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত ও লক্ষ্যস্থির হয়, সে বিষয় টোগো ব্যতীত আর কেহই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অবধারণ করিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষায় বর্ণমালার সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্র

যে অলক্ষিত ভাবে সংযোজিত ছিল তাহা মাইকেল ব্যতীত অপর কেহ কল্পনা করিতেও সক্ষম হয়েন নাই।

রক্ত, মাংস, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত জীব ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা যায় না। সেই কারণে যখন কেহ একটি নূতন সত্যের আবিষ্কার করেন আমরা তাঁহার কার্য্যে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না। বহু শতাব্দীর বিদ্যাবুদ্ধির সমষ্টি নিমেষের মধ্যে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অল্প বুদ্ধি মানবের ভ্রমপূর্ণ যুক্তির অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যথার্থ জ্ঞানীর প্রতি আমাদিগের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়! কোন বিশেষ গুণে, কোন বিশেষ শক্তির প্রভাবে, জ্ঞানীর চক্ষে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হইল, তাহা নির্ণয় করিতে আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যাহারা প্রশংসা কাহাকে বলে জানে না তাহারা আবিষ্কৃত সত্যের নূতনত্ব অস্বীকার করিয়া আবিষ্কারকের কোনই গুণ দেখিতে পায় না। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা চিরাগত মতের পক্ষপাতী হইয়া নূতন সিদ্ধান্তের অলীকত্ব প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হয়েন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা নিত্য। অল্প সময়েই হউক বা বহুদিনেই হউক, যখন সত্য একবার আপন ক্ষমতা বিস্তার করিয়া মানবের মন হইতে ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিয়া দেয়, তখন জ্ঞানীর মহত্ত্ব আপনা হইতেই প্রচার হইয়া পড়ে। যে গুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বলে মনুষ্য সত্যের অনুসন্ধানে জগতের সৃষ্টিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ব্যগ্র সেই বলবতী ইচ্ছা জ্ঞানীর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে যে অসাধারণত্ব, যে বিশেষত্ব আছে তাহার পরিচয় পাইবার প্রয়াস পায়।

কোন্‌টি অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়—আবিষ্কার প্রণালী না আবিষ্কারক? দুইটিই নূতন। তবে যাহা সত্য তাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকিবে। আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাই দেখিতে পাই না। আবিষ্কারকের চক্ষু কি নূতন উপাদানে গঠিত? জ্ঞানীর মস্তিষ্ক কি পৃথকভাবে প্রস্তুত? তাঁহার ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা কি পাঁচের অধিক? বিষয়টি বড়ই গুরুতর, বড়ই রহস্যপূর্ণ। চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট কিন্তু আবিষ্কার প্রণালী যতই আশ্চর্য্য-জনক হউক না কেন, আবিষ্কারক তদপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। ভাবুক যখন সৃষ্ট জগতের একটি ক্ষুদ্রতম পদার্থের রচনা কৌশল ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সমুদয় অস্তিত্ব সেই অচিন্ত্য, সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, কার্য্যকারণের

সমস্তার মধ্যে কার্য্য অপেক্ষা কারণের মূল্য অধিক। কার্য্য যতই সুন্দর হউক না, এবং যতই হিতকর হউক না, যে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, যে কারণ ফল প্রসব করে তাহা সুন্দরতর। সাহিত্য জগতে লেখনী প্রসূত কাব্যই বলুন আর দর্শনই বলুন, যত কেন মনমুগ্ধকর হউক না, যে কবি সুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন, যে চিন্তাশীল জ্ঞানী দর্শনের জন্ম দিয়াছেন, সেই কবি ও সেই দার্শনিক অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। কুমারসম্ভব অপেক্ষা কালিদাস উচ্চতর কাব্য। কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আভাস মাত্র কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয়। দার্শনিকের ধারণাশক্তির পূর্ণ পরিচয় তাঁহার দর্শনে পাওয়া যায় না।

কালিদাস, সেক্ষপীয়র, নিউটন, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, নেপোলিয়ন, টোগো, মানব সমাজে এক একটি অতুলনীয় প্রভাশালী আলোক। সূর্য্যকিরণের সহিত যেমন খদ্যোতালোকের তুলনা হয় না, ইহাঁদিগের সহিত সেইরূপ সাধারণ মনুষ্যের তুলনা হয় না। অথচ উভয়ই আলোক, উভয়ই মনুষ্য। এত আলোক সূর্য্যে কোথা হইতে আসিল ? এত অধিক ধী-শক্তি মহাত্মারা কোথা হইতে পাইলেন ? কেহ কেহ বলেন, কোন বিষয়ে বহুক্ষণ ব্যাপী মনঃ সংযোগ করিবার ক্ষমতার নাম প্রতিভা। সাধনা ও অধ্যবসায় মানুষের চিন্তাশক্তি এত দূর বৃদ্ধি করে যে তদ্দ্বারা মানুষ সাধারণের অসাধ্য কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা পৃথিবীতে কি আর একজন কালিদাসের আবির্ভাব সম্ভব ? একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে প্রকৃতি কখনও দ্বিতীয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সৃষ্টি করিবেন না। সেই জন্য বোধ হয় অপর মতাবলম্বীরা বলেন যে, যখন আমরা কোন মনুষ্যে অসাধারণত্ব দেখি তখন আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সেই অসাধারণত্বের হেতু দৈবশক্তি। দৈবের দোহাই দিতে কিন্তু আবার অনেকে সম্মত নহেন, ইহাঁরা কর্ম্মফলের উপর প্রতিভার ভিত্তি স্থাপন করেন। ফলে, লোক বিশেষের যে এক এক বিষয়ে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা থাকে তাহা নিশ্চয়। এসম্বন্ধে একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্ট হয়। মানুষ যেমন আপনার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারে না সেইরূপ মহৎ ব্যক্তি আপনার মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা যে কেবল মহৎ ব্যক্তির বিনয়ের পরিচায়ক তাহা নহে, ইহা তাঁহার মানসিক শক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি জানি না

জনসাধারণ আমাকে কি ভাবে দেখেন। আমি নিজেকে মনে করি যেন একটি ক্ষুদ্র শিশু বেলায় খেলা করিতেছি, আর কখন বা একটি বালুকণা লইয়া, কখন বা শুক্তিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইতেছি। কিন্তু সত্যের অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্র দিগন্ত ব্যাপিয়া আমার সম্মুখে প্রকাশমান রহিয়াছে।"

সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা মানসিক বৃত্তিগুলির ক্রমোন্নতি হয়। কিন্তু মহত্ত্ব বা দৈবশক্তি স্বভাব-সিদ্ধ। নায়াগ্রার জলপ্রপাতের তুলনায় শিল্প কৌশলে প্রস্তুত প্রস্রবণ যেমন একটি সামান্য বস্তু, প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত তুলনায়, সাধনা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে উন্নত মানুষ তেমনি একটি সামান্য পদার্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিদ্বান ব্যক্তি ও একজন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রভেদ খুব কম। একজনের মস্তিষ্ক অপরের মস্তিষ্কের তুলনায় একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডার মাত্র। কিন্তু মহতের মনই বলুন আর মস্তিষ্কই বলুন অসামান্য, অভূতপূর্ব্ব, অসীম গুণ ও শক্তির আধার। সে গুণ, সে শক্তির উৎস হিমালয় শিখরে জাহ্নবীর উৎপত্তি স্থানের মত মানব সাধারণের অজ্ঞেয়। আমরা কেবল তাহার বাহ্যিক কার্য্য কলাপ দেখিতে পাই।

অকপটতা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির একটি প্রধান গুণ। কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি কখনই কুটিলতা অবলম্বন করেন না। গেলিলিও কারামুক্ত হইয়াই বলিয়াছিলেন যে, তিনি শপথ করা সত্বেও পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নির্ভীকতা, প্রতিভাবান মনুষ্যের আর একটি প্রধান গুণ। সমস্ত জগত একদিকে হউক না কেন তত্রাচ তিনি ভীত হইবেন না। দরিদ্র মার্টিন লুথার প্রবল পরাক্রান্ত পোপের বিরুদ্ধে যে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন তদ্দর্শনে সমগ্র ইউরোপ স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রের প্রতিভূ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন দ্বীপান্তরিত হইয়াও হীনতা স্বীকার করেন নাই। একাগ্রতা প্রতিভাশালী ব্যক্তির কার্য্যে স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়। নিউটনের একজন জীবন চরিত লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি সৌর জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে আজীবন এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আদৌ মনমধ্যে স্থান পায় নাই। প্রতিভান্বিত মানবের চরিত্রে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মোৎসর্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত পৃথিবীতে প্রতিভার শুভাগমন হয় না। মানবদেহ প্রতিভার আশ্রয় মাত্র।

ঐতিহাসিক সমালোচকের নিকট কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তি সময়ের দাস মাত্র। তাঁহার মতে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে প্রতিভার জন্ম হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে সেক্ষপীয়রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নাট্যাকাশে সে সময়ে অনেকগুলি দীপ্তিমান গ্রহ বিরাজ করিতেছিলেন। সমালোচকের চক্ষে সেই কারণে সেক্ষপীয়রের নাটক তৎকালিক ইংরাজ সমাজের চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুখের বিষয় যে সমালোচনার সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া সকলকে প্রতিভার অনুসন্ধান করিতে হয় না। সেক্ষপীয়রের চিত্র গুলি যদি সাময়িক ভাব প্রকাশক হইত তাহা হইলে এতদিনে তাঁহার চিত্রশালা

ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদের আবাস ভূমিতে পরিণত হইত। উল্কার মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী ক্ষীণ রশ্মির ন্যায় প্রতিভার আলোক দৃষ্টি গোচর হয় না। যে স্বর্গীয় ক্ষমতা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সে ক্ষমতার লোপ হয় নাই। প্রতিভালব্ধ স্বদেশানুরাগের বীজ বপন করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও স্বদেশহিতৈষিগণ আর কিছু দিন পরে সাধারণের স্মরণাতীত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু যে "বন্দে মাতরং" মন্ত্র আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যাহার অস্ফুট পরিব্যক্তি সুদূর জাপান ও ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছে, সেই পবিত্র মাতৃ বন্দনা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিভার রাজ্যে অমরত্ব অর্পণ করিবে।

চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ কেবলমাত্র প্রতিভার ভাগ্যে ঘটে। প্রতিভাবিহীন ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাষায় মনভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলেও মানব সমাজে কখন উচ্চতম স্থান অধিকার করিতে পারেন না। গ্রীসবাসী সুলেখক এন ক্রিয়নের নাম সেই কারণে অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সক্রেতিশের গুণ গরিমা মানব জ্ঞানের বিস্তৃতির সহিত দিন দিন বর্দ্ধিত ব্যতীত হ্রাস হইতেছে না। সমালোচক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, পৈত্রিক স্বত্বে রাজমুকুট প্রাপ্ত নরপতিগণ, প্রতিভাশালী ব্যক্তির সেবক ও শিষ্য স্থানীয়। ইহাঁরা প্রতিভা প্রদর্শিত পথে বিচরণ করেন, প্রতিভা নির্দ্দিষ্ট বিধি পালন করেন এবং নর সমাজে প্রতিভার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে সহায়তা করেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে মানব জ্ঞানের প্রবর্ত্তক, মানব ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু এবং মানব সমাজের যথার্থ নেতা। যে জাতির মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, সে জাতি অসভ্য। আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সভ্যতার আলোক কখন প্রকাশ পায় নাই। তাহার কারণ ইহাদিগের মধ্যে প্রতিভান্বিত কোন ব্যক্তি কোন কালে আবির্ভূত হন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যেরা এই সকল জাতিদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাদিগের নিকট ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, নীতি, সমাজ বা শিল্প বিষয়ক কোন শিক্ষা লাভ করেন নাই। সভ্য জাতিদিগের সংস্রবে আসিয়া অনেক অসভ্য জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। বিজিত অসভ্য জাতিদিগের কথা ছাড়িয়া দি.. বিজিত সভ্য জাতিদিগের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাহুবলে সভ্য জাতিগণ অসভ্যদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াও পুনরুত্থান করিয়াছেন। রোমানগণ ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। যে অসভ্য জাতিরা রোমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহারাই কিছু কাল পরে বিজিত সভ্য রোমানদিগের সহিত এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল যে, এখন আর তাহাদিগের পৃথক অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্য্যগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি হিন্দুস্থানের অনার্য্য জাতিরা অসভ্যতার আদিমত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ ভারতের অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ

করেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে জাতি বিশেষ আর্য্যগণের রীতি নীতি অনুকরণ করিয়া হিন্দু সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাতি বা সমাজ বিশেষের মধ্যে প্রতিভাবিশিষ্ট মহাত্মাগণের আবির্ভাব সেই জাতি বা সেই সমাজের উন্নতির হেতু। আবার যখন জাতি বা সমাজ বিশেষ প্রতিভার নিকট প্রাপ্ত শিক্ষা ভুলিয়া যায়, তখন সেই জাতি বা সেই সমাজের অবনতি হয়। বাস্তবিক, জাতি বা সমাজ বিশেষের মধ্যে যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা সেই জাতি বা সেই সমাজের আদর্শপুরুষ। আদর্শ-পুরুষকে যতদিন দেবতার ন্যায় পূজা করা যায়, যতদিন তাঁহার উপদেশ ও অনুজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তত্দিন জাতীয় অবনতির সম্ভাবনা হয় না। যখনই কোন জাতির আদর্শ-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয় তখনই সেই জাতি আপন ইষ্টদেবতার সহায়তা লাভে বঞ্চিত হয়। এরূপ অবস্থায়, ঝটিকা-সঙ্কুল সমুদ্রে কর্ণধার-বিহীন-তরণীর ন্যায় সেই জাতি ভ্রমে পতিত হইয়া বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে, ক্রমে উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া কার্য্য করিতে করিতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আদর্শ পুরুষ জাতীয় জীবনের ধ্রুবতারা। যখন আমরা স্বর্গীয় আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে বিরত হই, তখনই আমাদিগের জাতীয় অধঃপতন হয়। এমত অবস্থায় অনুকরণেচ্ছা বলবতী হয় এবং জাতীয় জীবনে উদ্ভাবনী-শক্তির লোপ পায়। তখন আমরা প্রতিভা ভ্রমে উপদেবতার আরাধনা আরম্ভ করি এবং সদজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া পাপের প্রশ্রয় দিতে থাকি। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ এ বিষয়ের জাজ্বল্য উদাহরণ।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল্।

সাহিত্য-সমাচার।

অঙ্কুর।—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। এই সংখ্যার প্রথমেই "শিল্প" শীর্ষক প্রবন্ধ। ইহার প্রথমাংশে লেখক ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গোটা-কতক মামুলী কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। শেষাংশে "সামান্য বেতনে দাসত্ব স্বীকার অপেক্ষা মোটামুটি শিল্প কার্য্যে স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কতিপয় সাধারণ শিল্প প্রণালীর উল্লেখ" করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিয়াছেন। তিন পৃষ্ঠার মধ্যে "দর্পণ বা আর্সি" হইতে আরম্ভ করিয়া "তুবড়ী বাজী" অবধি ত্রিশ রকম শিল্পের "উল্লেখ" দেখিলাম! বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, লেখকের উল্লিখিত সকল প্রকার শিল্প প্রণালীরই উল্লেখ বটতলা হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক সেগুলি উদ্ধৃত করিয়াও "উদ্ধৃত" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বৃথা বটতলার "অন্ন মারিবার" যোগাড় না করিয়া লেখক যদি এক একটী বিষয় লইয়া বিশদরূপে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে সাধারণের কতকটা উপকার হইতে পারিত। বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় কি প্রবন্ধটী না দেখিয়াই প্রকাশিত করিয়াছেন? আমাদের ভয় হয় কেহ হয়ত একখানি পঞ্জিকা হইতে দুই চারি খানি পাতা উদ্ধৃত করিয়া অঙ্কুরে প্রকাশার্থ

প্রেরণ করিলে তাঁহারা উহা ছাপাইয়া বসেন। "কবির স্বপ্ন" এইবার শেষ হইল। আমাদের একান্ত অনুরোধ, লেখক যেন বাছিয়া বাছিয়া এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া আর অঙ্কুরের পৃষ্ঠা নষ্ট না করেন। "মশক"—কবিতা। কবিতা-কুঞ্জে এতদিন মধুপকেই বিরাজ করিতে দেখিতাম, এখন সম্পাদক মহোদয়ের কৃপায় "মশককে" প্রবেশ করিতে দেখিলাম। এইবার—ছারপোকা, আরসুলা, টিকটিকি, মাকড়সা প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করিলে যাহা হউক আরও কিছু কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাইব। 'সাহিত্য সভার' সংহিতা—শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক উক্ত সভা ও সভার পত্রিকার অবনতি সম্বন্ধে এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। কিন্তু লেখককে কতিপয় সম্রান্ত ব্যক্তির প্রতি অতি অশিষ্ট ভাষার প্রয়োগ করিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। লেখকের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার একটু পরিচয় লউন। তিনি একস্থলে বলিতেছেন যে "সাহিত্য-সংহিতার" বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন—এম, এ, বি, এল; এফ্, আর, জি, এস্। সহযোগী সম্পাদক শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র। সম্পাদকের নাম অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং সহযোগী সম্পাদকের নাম গ্রেট টাইপে ছাপা হইয়া থাকে।" লেখকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির দৌড়টা দেখিলেন! সম্পাদকের নামে উপাধির সহিত উনত্রিশটী অক্ষর আছে সুতরাং উহা গ্রেট অক্ষরে ছাপাইতে হইলে এক ছত্রের পরিবর্ত্তে কয় ছত্রে নামটী পূর্ণ লিখিত হইতে পারে সে কথা অঙ্কুরের ছাপাখানা "মণিকা প্রেসে"র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসু মহাশয়কে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া লিখিলে ভাল হইত না কি? তাহা হইলে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া লোকে হাসিত কি? লেখক একস্থলে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"এই বাতুল লেখকের প্রবন্ধ 'সাহিত্য সংহিতার' কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া আছে।" লেখক শুধু উমেশ বাবুকে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ পণ্ডিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া 'সময়' সম্পাদককে অবধি দুই একটা কথা বলিতে ছাড়েন নাই। উমেশ বাবু প্রভৃতি লেখকগণ যতই মূর্খ এবং 'বাতুল লেখক' হউন না কেন, আমরা কিন্তু লেখক মহাশয়কে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি ইঁহাদের নিকট এখনও নীতি শিক্ষার প্রথমভাগ শিক্ষা করিতে পারেন। লেখক একজন সম্রান্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এই কথা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য একস্থলে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন "এক্ষণে আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছি।" তিনি মুখসটী উন্মোচন করিয়া "শ্রী—"র অন্তরাল হইতে আত্ম প্রকাশ করিয়া নিজের স্বরূপ মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিতে এত ভীত কেন? আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর পক্ষে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি লেখাও কি গবর্ণমেণ্টের আইনে নিষিদ্ধ? অবশেষে তিনি বলিয়াছেন,—"এরূপ নিকৃষ্ট ভাষায় সাহিত্য-সংহিতা প্রকাশিত হইলে গ্রাহকগণ ইহা গ্রহণ করিবেন কি?" আমরা লেখকের উক্তি 'অঙ্কুর' সম্পাদকদ্বয়ের প্রতি প্রয়োগ করিতেছি এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যে পত্রিকার ভদ্র সমাজে গতি বিধি আছে তাহাতে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রিকা কলঙ্কিত করিবেন না। কেবলমাত্র পত্রিকা ও প্রবন্ধাদির সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত না থাকিয়া ভাষা ও রচনার ভাব প্রকাশ প্রণালীর সংস্কারের প্রতি কি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নহে?

আমাদের বিশেষ অনুরোধ অঙ্কুরের বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয়ও "শিশু শিক্ষা"র গোপালের মত (গোপাল যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে—সেইরূপ) যাহা পান তাই ছাপেন। যা পান তাই রাখেন" এই অভ্যাসটী পরিত্যাগ করুন। অঙ্কুরের সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্দ্য আছে সুতরাং ইহার ত্রুটী আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে—সেই জন্য বাধ্য হইয়া কয়েকটী অপ্রিয় সত্য কথার অবতারণা করিতে হইল।

প্রতাপ ও জাতীয় জীবন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই ধর্ম্মকে একটা জড়বৎ তুচ্ছ পদার্থ জ্ঞানে দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল এবং হিন্দু নৃপতিরা অর্থপিপাসায় ও সম্মান লাভের প্রত্যাশায় সারাদিন অধীর রহিয়া—ধর্ম্মের যে সেই গগনভেদী বিরাট মাহাত্ম্য—তাহাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলারা অর্থের জন্য আত্মবিক্রয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইত না এবং হিন্দু নরপতিরা স্বীয় রূপসী ভার্য্যাকে খুশরোজের দিনে "রূপের হাট" খুলিবার জন্য নবাব অন্তঃপুরে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। আর যদি সৌভাগ্য-ক্রমে (?) কোনও রাজপত্নী রমণীর সাররত্ন সতীত্ব বিক্রয় করিয়া বিনিময় প্রাপ্ত অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তখন সেই স্বামী ভার্য্যার রূপের জন্য গৌরব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিত না। এই সময়ে ভারতবর্ষে যেরূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল এবং হিন্দুদিগের অবনতি যেরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, সেইরূপ ধর্ম্মবিপ্লব ও অবনতি যে ভারতবর্ষে অতি অল্পই সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদানীন্তন হিন্দুদিগের অবনতি অধঃপতনের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, যে প্রতাপ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সেই অবনতির পথ হইতে ফিরাইতে পারেন নাই। হিন্দুদিগের এই দুর্দ্দিনে কেবলমাত্র একা প্রতাপ হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষার্থ হিন্দু ধর্ম্মের অমৃতভাণ্ড লইয়া অটল অচল হিমগিরিবৎ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতাপ অসাধারণ পৌরুষের দ্বারা সেই সমগ্র প্রতিকূলাচরণকে ধূলিবৎ তুচ্ছজ্ঞানে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। যদিও বহু মেঘ আসিয়া প্রতাপ-দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে সেই সকল মেঘকেই জলে পরিণত হইতে হইয়াছিল এবং দিবাকররশ্মি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া জানপদবর্গের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। প্রতাপ কখনও স্বদেশকে ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ স্থান দেন নাই। তিনি জানিতেন যে, যখন কোন জিনিষ আপনার আধিপত্য ক্রমশঃ বিস্তার

করিতে করিতে আসিয়া অবশেষে ধর্ম্মকে আঘাত করে, তখন ধর্ম্ম তাহার এই ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারে না এবং তৎক্ষণাৎই তাহার বিনাশ সাধন করে। তিনি বুঝিতেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং যদি একবার তাঁহার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। সেইজন্য যখন মানসিংহ তাঁহার সহিত আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি সাদরে ও দুঃখের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি আরও জানিতেন যে, মানসিংহের সহিত আহার করিলেও মানসিংহ তাঁহার ন্যায় নিঃস্ব নৃপতির পক্ষ কখনই অবলম্বন করিবেন না। তিনি অসাধারণ লোকচরিত্র অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিলেন যে, মানসিংহ মহাপুরুষদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অনেক গুলি গুণ পরিত্যাগ করিলেও রাজপুতদিগের স্বভাবজাত গুণ যে বিশ্বাস রক্ষা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যে আকবর মানসিংহকে অশেষ সম্মান দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, যে মোগল সম্রাট আকবর মানসিংহের সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, যে মোগল-মুখোজ্জ্বলরবি আকবর মানসিংহের প্রতি আপনার অসীম বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কতক পরিমাণে নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিতেন, সেই আকবরের সহিত যে রাজপুত "অম্বরঈশ্বর" মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রতাপের পক্ষ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইবে, এ কথা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি যাহাদের হয় হউক, প্রতাপেরও হয় নাই, আমাদেরও কখনও হইবে না। এখনও যদি প্রতিপক্ষ দলেরা কহিতে থাকেন যে, "না মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুতেরা নিশ্চয়ই প্রতাপের অধীনতা স্বীকার করিত, কেবলমাত্র প্রতাপের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই তাহা হইল না," তবে আমরা শুধু এই কথাই বলিব যে, "যে হীনচেতারা কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ক্রুদ্ধ, বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া স্বদেশের অমঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই স্বদেশ-কুলদ্রোহীদের স্বদেশসেবারূপ মহৎ কার্য্যের অংশভাগী না করিয়া প্রতাপ উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ ইহাদের স্বদেশ-সেবার নেশা পদ্মপত্রস্থিত জলকণার ন্যায় অতীব চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী।" সুতরাং এক্ষণে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, "হলদীঘাটে যে রাজপুত রাজপুত প্রতিবাদী হইয়াছিল" তাহা প্রতাপের "ভেদ-বুদ্ধি" হেতু নহে, তাহা মানসিংহের অবিমৃষ্য-কারিতার ফলেই হইয়াছিল।

এস্থলে কেহ কেহ শিবাজী যশোবন্ত সিংহ সম্বন্ধীয় ঘটনাটী উল্লেখ

করিয়া আমাদের মতের অযাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে কৃতযত্ন হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, শিবাজীর হৃদয়হারী স্বদেশহিতৈষণা পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াও এবং ঔরঙ্গজেবের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও যশোবিন্ত ঔরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই—কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, মানসিংহের বংশধর জয়সিংহ শিবাজীর প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, বিশ্বাসঘাতকতাকে পূর্ণমাত্রায় ঘৃণা করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই হিন্দুনরপতিরা মুসলমান পক্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তখন যে আকবরের সময়ে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও, মুসলমান নরপতিদিগের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াও তাহারা কিরূপে মুসলমান পক্ষ ত্যাগ করিতে পারিত, তাহা উক্ত মতাবলম্বীরাই কহিতে পারেন—আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা ত ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ভট্ট কবিরা মানসিংহের এই আতিথ্য গ্রহণের মধ্যে মানসিংহ ও আকবরের দুরভিসন্ধির ছায়া অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রতাপের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষাকে খর্ব্ব করিবার জন্যই মানসিংহ অবনতি স্বীকার করিয়াও প্রতাপের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, প্রতাপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ দূরদর্শিতার বলে, এই আতিথ্য গ্রহণের মধ্যে মানসিংহ ও আকবরের দুরভিসন্ধির ছায়া দেখিয়াছিলেন। নতুবা তিনি স্বদেশহিতৈষীর চরম আদর্শ হইয়াও, একটী রাজ্যের কর্ণধার হইয়াও, আকবরের ন্যায় প্রতিভাশালী বুদ্ধিমান নরপতির প্রতিপক্ষ হইয়াও, যাহা বিংশ-শতাব্দীর বাঙ্গালী বুঝিতে পারে, তাহা যে বুঝিতে পারেন নাই—এরূপ স্পর্দ্ধা করিবার প্রবৃত্তি যাহাদের হয় হউক, আমাদের ত অন্ততঃ নাই।

ক্রমে ক্রমে ভারতের চিরস্মরণীয় ও চির গৌরবের দিন ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই শ্রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দলে দলে রাজপুত ও মুসলমানেরা মানসিংহ, সেলিম ও মহাবেত খাঁ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মিবারের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া আপনাদের শিবির সন্নিবেশ করিল। মিবারবাসীরাও নিশ্চেষ্ট ভাবে দিন যাপন করিতেছিল না, তাহারাও প্রতাপ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রণক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শত্রুদিগকে রাজধানীতে আসিতে হইলে একটি অতি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বতীয় পথ দিয়া আসিতে হইত। এই পথটীর পরিসর এত অল্প যে কেবলমাত্র দুইখানি যান পাশাপাশি যাইতে পারে এবং এই পথের দুই পার্শ্বে একেবারে

সুউচ্চ ঢালুবিহীন পাহাড় উঠিয়াছে। প্রতাপ দেখিলেন যে, অল্প সৈন্য লইয়া অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করার পক্ষে এই স্থানই প্রশস্ত। সুতরাং তিনি দ্বাবিংশ সহস্র সুশিক্ষিত রাজপুত সৈনাগণকে উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন এবং অসভ্য বিশ্বাসী ভীলগণকে পর্ব্বত শিখরের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া অবসরক্রমে তীর নিক্ষেপ করিতে ও পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। প্রতাপের এই সৈন্যসজ্জা যে প্রতাপের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ও রণকৌশল্যের পরিচয় দিতেছে. সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৭ই শ্রাবণের প্রাতঃকাল হইতেই মহাবেগে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপ আজ সম্পূর্ণ আত্মহারা। তিনি আজ মানসিংহের প্রতিজ্ঞার সেই ভীষণ বাণী স্মরণ করিয়া মানসিংহ অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। কিন্তু সাগরবৎ সৈন্য-রেখা ভেদ করিয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার হওয়ায় তিনি পরিশেষে আকবর নন্দন সেলিম অভিমুখে আপনার অশ্বকে চালনা করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতাপের অব্যর্থ বর্ষাঘাতে সেলিমের হস্তীচালক নিহত হইলে, হস্তী যেন তাহার প্রভুর সমাগত বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াই সেলিমকে লইয়া পলায়ন করিল। আজ প্রতাপের অব্যর্থ বর্ষাঘাতে ভারতবর্ষের ভাবী-সম্রাট সেলিমকে শমনভবনে যাইতে হইত, কিন্তু শুভাদৃষ্ট বশতঃ প্রতাপনিক্ষিপ্ত বর্ষা সেলিমের মস্তক চূর্ণিত না করিয়া হাওদায় লাগিয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে মুসলমানেরা ভীমবেগে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মিবারবাসীরা অসাধারণ বীরত্বের সহিত তাঁহাকে তিন বার এই বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ প্রতাপ উন্মত্ত, মুসলমানের শোণিত পিপাসায় আজ তাঁহার শাণিত কৃপাণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আজ তাঁহার প্রাণ—প্রাণময় চিতোরের জন্য পুড়িয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি আবার সৈন্যরেখা ভেদ করিয়া শত্রুপক্ষীয়দের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এবার মুসলমানেরা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা এবার মিবারের সাররত্ন, ভারতের উজ্জ্বলতম কণ্ঠহার, বীরত্বের পূর্ণ অবতার প্রতাপকে হত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। দূর হইতে প্রভুভক্ত ঝালা সর্দ্দার মান্না ইহা দেখিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রতাপকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি ভীমবেগে মুসলমান সৈন্য-রেখা ভেদ করিয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইয়া অতুলনীয় আত্মত্যাগের দ্বারা

রাজকেতন নিজ মস্তকোপরি ধারণ করিলেন এবং অসীম সাহসের সহিত রাণার প্রাণ রক্ষা করিয়া আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। রাণা ঝালার এই আত্মত্যাগ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন যে, কেবলমাত্র আট সহস্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি আর বৃথা যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তখন তিনি সেনাগণকে পলায়ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং নিজেও একা সঙ্গীবিহীন হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও এই যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তথাপি এই পরাজয় যে তাঁহার অভ্রভেদী উজ্জ্বল যশকিরীটে কিছুমাত্র মালিন্য লিপ্ত করিয়া দেয় নাই, সে কথা আমরা দ্বিধাবিহীন হইয়া কহিতে পারি। সময়ে সময়ে যুদ্ধে জয়লাভও যেমন রাজমুকুটকে কলঙ্ককালিমায় লিপ্ত করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্যকে মলিন করিয়া দেয়, তদ্রূপ সময়ে সময়ে পরাজয়ও রাজমুকুটকে কিছুমাত্র মলিনীকৃত না করিয়া আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। হলদীঘাটে যে মিবারবাসীরা পরাজিত হইয়াছিল, তাহার কারণ মিবারবাসীদের শৌর্য্য ও বীর্য্য হীনতা কিম্বা "ভেদবুদ্ধি" নহে, তাহার কারণ মোগলদিগের অসংখ্য জনবল ও "অভাগী ভারতভাগ্যে যবন প্রবল।"

প্রতাপ, দেহের সপ্তস্থানে আঘাত পাইয়া, যখন রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহার স্বজনত্যাগী-ভ্রাতা শক্তসিংহ মোগল শিবির পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যদিও পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তথাপি আজ শক্তসিংহের হৃদয় ভ্রাতার মহত্ত্বে এতদূর পূর্ণ, ভ্রাতার উদারতায় এতদূর প্রশস্ত, ও ভ্রাতার বীরত্বে এতদুর উন্নত হইয়াছিল, যে তিনি কিছুমাত্র ভাব বিপর্য্যয় দেখাইলেন না, তাঁহার কৃপাণ যেমন কোষবদ্ধ ছিল, তেমনই রহিল, এবং তিনি করজোড়ে আসিয়া ভ্রাতার চরণতলে উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে তাঁহার চরণ দুখানি ধুইয়া দিলেন। প্রতাপ তখন বুঝিলেন যে, যে দুইজন সেনানায়ক তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল, শক্তসিংহই তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং প্রতাপ শক্তসিংহকে উঠাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ রহিয়া স্বর্গসুখ অপেক্ষা যদি কোন সুখ বড় থাকে, তবে সেই সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হায়, জীবনের যে সার, প্রাণের যে সুসার সেই ভ্রাতার বক্ষের সহিত যে আপনার বক্ষ না

মিশাইল, সংসার-সাগরের যে সুখময় বন্দর, সংসার-মরুভূমির যে সুখকুঞ্জ সেই ভ্রাতার দুঃখে যে আপনার দুঃখ না জানাইল, সংসার-পথের যে অনন্ত বৃক্ষানাতপ, জীবনতরীর যে কর্ণধার, সেই ভ্রাতার রোদনে যে আপনার সহানুভূতি না দেখাইল, তাহার ন্যায় অভাগা জগতে আর কে আছে? প্রতাপ আজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজ বহুদিন বিচ্ছেদের পর যখন ভ্রাতার সহিত হৃদয় মিশাইয়া, ভ্রাতার মস্তক আপনার বক্ষে রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পরাজয় ও সপ্তস্থানে আঘাত অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইল এবং তখন তিনি যেরূপ আনন্দের অমৃত উপভোগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অমৃতলাভ জীবনের আর কোনও মহামুহূর্ত্তে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল কিনা জানি না।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

নীল কুঠী।

(৫)

সোণার বরণ মাখিয়া উষাদেবী ধীরে ধীরে জল স্থল সজীব করিতেছিলেন। নদীর দুই দিকের বৃক্ষরাজি হইতে সুন্দর সুললিত সঙ্গীত বায়ুক্রোড়ে ভাসিয়া যাইতেছিল। কুটিলহৃদয় প্রভাত মলয় কভু দ্রুত কভু ধীর ভাবে উত্তরদিকে বহিয়া যাইতেছিল। সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিয়া সেই নির্জ্জন নাবাল জমীর উপর দাঁড়াইয়া বড় তৃপ্তি উপভোগ করিতেছিলাম; কিছুকালের জন্য মানসিক উত্তেজনা ও কুচিন্তার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম।

একটা বর্ম্মা চুরুট মুখে করিয়া ভূপেনকাকাও আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল দূরে নদীসৈকতে ভৃত্য নবীনের উপর। নদীর জলে নবীন হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতেছিল ও মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাহিতেছিল।

ভূপেনকাকা বলিলেন—আঃ ভাল মুস্কিলেই ত' পড়লাম্। এ বেটা না গেলে ত' কাজ আরম্ভ কর্‌তে পাচ্চিনি।

আমি বলিলাম—বলেন ত' কোনও একটা হুকুম দিয়া ওকে ভাগাই।

ভূপেনকাকা নিষেধ করিলেন, বলিলেন,—"মূর্খ লোক যদি একবার বুঝিতে পারে আমরা এখানে তদন্ত করিতে আসিয়াছি, তাহা হইলে উপকার করিতে গিয়াও অশেষ অপকার করিবে।" নবীন যে কিছুই সন্দেহ করে নাই তাহা বোধ হইল না, কারণ যাইবার সময় সে ঘন ঘন বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ভূপেনকাকা সেটুকু বুঝিতে পারিয়া আমায় বলিলেন—"তুমি চলিয়া যাও। কোনও রকমে উহার উপর নজর রাখিও। যদি কল্যকার সেই জানালার দিকে আসে বা মাঠের এদিকে আসিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে উহাকে কোনও একটা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিও। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজটা শেষ করিব।"

আমি একটু বিষণ্নমনে ফিরিলাম। দুই চারি মিনিট পরেই দেখিলাম নিজের গৃহ হইতে কতকগুলা সোডার বোতল লইয়া সে বাজারের দিকে চলিয়া গেল। অন্ততঃ এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ভূপেনকাকার নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

ভূপেনকাকা বলিলেন—এই দেখ এই জানালা হইতে জ্যাক্ সে রাত্রে লাফাইয়া দুই চারি পদ যাইবার পর পশ্চাতের ভৃত্য অবনীর পা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই দেখ—পায়ের চিহ্ন। আবার অবনীকে ধরিয়া তুলিয়াছিল। এবার বাবুর সহিত ব্যবধান ২ ফিট ৭ ইঞ্চি একটু সামনে সরিয়াছে। পিছনে কুকুরের পদচিহ্ন।

ভূপেনকাকার বিচক্ষণতায় বড় আনন্দ পাইতেছিলাম। আমি একেবারে কল্পনা চক্ষে অবনীর উদ্ধার এবং বড়বাবু ও তাঁহার ভার্য্যার আনন্দ উৎসব দেখিয়া লইলাম। ভাবিলাম দুর্ব্বৃত্তেরা যতই কেন পাষণ্ড হউক না, ভগবানের সতর্কতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তাহা না হইলে ঘটনার পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি হইবে কেন।

পথের মাঝে আসিয়া আর একবার অবনীকে নামাইয়া ভৃত্যটা কুকুর মারিতে কিয়দ্দূর ধাবিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গেল। যেস্থলে দ্বিতীয়বার অবনীকে নামাইয়াছিল তথায় তাহার পদচিহ্নটা বেশ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। আমরা তাহারও একটা মাপ লইলাম। শেষে রাস্তার উপর গিয়া সমস্ত পদচিহ্ন লুপ্ত হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার নিরাশার কুহেলিকা আসিয়া আমার হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিল। সামান্য দুই চারিটা পদচিহ্ন দেখিয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া

(৭)

বৈকালে ৫টার সময় সকলে উঠিয়া কিছু আহার করিলাম। জ্যাকও ভূপেনকাকার প্রদত্ত খাদ্য বেশ আহার করিল। শেষে ভূপেনকাকা বলিলেন—তোমার খুব বিশ্বস্ত অথচ বলবান কোনও কর্ম্মচারী আছে?

আমি বলিলাম—হারাধন খুব বিশ্বাসী।

একটু চিন্তা করিয়া ভূপেনকাকা বলিলেন—হ্যাঁ আমারও তাই বিশ্বাস। হারাধনকে সঙ্গে নেব। তুমিও প্রস্তুত হও। এক একটা রিভলভার নাও।

আমি বলিলাম—এরূপ রণসজ্জা ক'রে কোথায় যেতে হ'বে?

ভূপেনকাকা বলিলেন—অবনীর জুতার গন্ধের ঘ্রাণ দিয়া জ্যাককে নাবাল জমির সেই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যা'ব, দেখি কোথায় যায়। কি জানি যদি দস্যু তস্করের সম্মুখীন হতে হয় বলা ত যায় না। এক একটা অস্ত্র থাকা মন্দ কি!"

ভূপেনকাকার অনুমতি অনুসারে অবনীর এক পাটি জুতা চুরি করিয়া পিছনের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জ্যাকের শিকল ভূপেনকাকার হস্তে, কুকুরটা তবুও সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য জোর করিতেছে, আমাকে দেখিয়া জ্যাক লাফাইয়া উঠিল। ভূপেনকাকা বলিলেন—হ্যাঁ ঘ্রাণ পেয়েছে। তুমি জুতাটা সামনে ছুঁড়িবার মত ভান করিয়া পিছাইয়া পড়। পরে জুতাটা কোথাও লুকাইয়া আমাদের সঙ্গে এস। জ্যাক ঠিক চলিবে।

তাহাই হইল। জ্যাককে রাখা দায় হইল। প্রথমে ভূপেনকাকা শিকল ধরিয়া এবং হারাধন ও আমি পশ্চাতে ঠিক সেই পদচিহ্নওয়ালা রাস্তা ধরিয়া শেষ পাকা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ভূপেনকাকা বলিলেন—আশু এইখানে আসিয়া আমরা সূত্র হারাইয়াছিলাম না? এই দেখ জ্যাক সূত্র বাহির করিবে। বলা বাহুল্য, ভূপেনকাকা স্নেহ বশতঃ বাল্যকালাবধি আমায় আশু বলিয়া ডাকিতেন।

জ্যাক সেই পাকা রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে চলিতে লাগিল। সে দিকটা গ্রামের বাহিরে। আমরা জ্যাকের অনুসরণ করিতেছিলাম।

হারাধন বলিল—যোগেনবাবু আর কতদূর। আমি ত' ব্যাপারটা কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। কোথায় সব চলেছেন?

আমি বলিলাম—পরে বুঝবে কিন্তু আপাততঃ কোথা যাচ্চি বা যা'ব তা ত' কিছু জানি না। ভূপেনকাকা জানেন।

ভূপেনকাকা বলিলেন—রোসো রোসো। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। এক্ষেত্রে জ্যাকই মহাজন!

(৮)

প্রায় দুই মাইল আসিয়া পড়িলাম। দূরে গিরিশরায়ের দেবালয় ও অতিথিশালা দেখা যাইতেছিল। আমার মনে সন্দেহ হইল বোধ হয় জ্যাক বাহাদুর পশুবুদ্ধিতে আমাদের দেবালয়ে লইয়া গিয়া ফেলিবে। ভূপেনকাকা যেমন পাগল।

যাহা ভাবিলাম তাহা হইল না। পাকারাস্তা ছাড়িয়া জ্যাক ডান দিকের একটা গ্রাম্যপথ ধরিল। দুই দিকের বড় বড় আম্রবৃক্ষ হইতে চূতমুকুলের সুগন্ধ আসিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিতে লাগিল। বামদিকের বাঁশঝাড় হইতে শোকসন্তপ্ত ঘুঘুর গীত আমাদিগের মরমে পশিল। সূর্য্যালোকেরও তেমন তেজ ছিল না। সুতরাং অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই বিশাল অবসাদের ম্লানমূর্ত্তি।

আরও এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম। বৃক্ষসারি শোভিত পথ ছাড়িয়া আবার মাঠের উপর পড়িলাম। দূরে পরিত্যক্ত ভগ্ন নীল কুঠী দেখা গেল। ভূপেনকাকা লক্ষণ বুঝিয়া বলিলেন—আমাদের গন্তব্য স্থানটা বোধ হয় নীল কুঠী।

আমি দেখিলাম পশ্চাতে সেই রাস্তা ধরিয়া দুইজন লোক অগ্রসর হইতেছে। ভূপেনকাকার দৃষ্টিও তাহাদিগের উপর পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন—একটু পাশ কাটিয়ে হারাধন এই ঝোঁপটার ভিতর ঢুকে পড়।

হারাধন ঝোঁপের ভিতর ঢুকিল ; আমরা নীল কুঠী অভিমুখে চলিলাম।

নীল কুঠীর প্রবেশ পথে ভিজা মাটির উপর দেখিলাম এলোমেলো অসংখ্য পদচিহ্ন। তাহার মধ্যে S T মার্কা পদচিহ্নের এক অংশ স্পষ্ট দেখা গেল।

গোটাকতক ভগ্ন স্তূপের মধ্য দিয়া, কতকগুলা জীর্ণ গৃহের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইলাম কোথাও মনুষ্যের আবাস পাইলাম না। ইষ্টক রাশির মধ্যে পদচিহ্ন পাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমাদের পথ প্রদর্শক জ্যাকও কোনও সাহায্য করিতে পারিল না। কেবল মৃত্তিকার ঘ্রাণ লইয়া নিঃশব্দে আমাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

প্রায় সমস্ত জীর্ণ কুঠীটায় পরিভ্রমণ করিয়া শেষে একটি গৃহে আসিয়া পঁহুছিলাম। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই একটা ভীষণ দুর্গন্ধ আমাদিগের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। দুইটা শৃগাল আমাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল। সম্মুখে যাহা দেখিলাম তাহাতে ত আমাদের জ্ঞান লোপ পাইল। কেবল

জ্যাকেরই পশু মস্তিষ্কে বিপদের কথাটা প্রবেশ করিতে পারিল না। সে শৃগালের পশ্চাতে ছুটিল।

শোকে কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না। পরিণামে যে এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইবে তাহা কে জানিত।

ভূপেনকাকা বলিলেন—বিপদের সময় জড়তা আসা ভালো নয়। কাপড় খানা লও, যে টুকু অস্থি শৃগালের মুখ হ'তে পাওয়া গেছে লও। কে বলিতে পারে এ কার কাপড় বা কার হাড় ?

আমি বলিলাম—এটা কি আর বুঝতে দেরী হয় ভূপেনকাকা ?

রক্তাক্ত কাপড় খানা চারিদিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম এক কোণে অবনীর নাম লেখা। নামটা পড়িয়াই একেবারে প্রাণের ভিতর ভীষণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল।

ভূপেনকাকা বলিলেন—এ কবচ খানা কার দেখ দেখি ?

আমি সে কবচ উত্তমরূপে চিনিতাম। ভূপেনকাকার মুখে আর বাক্য সরিল না।

* * * * *

নীল কুঠীর ভগ্ন ইষ্টক স্তূপের উপর বসিয়া ভূপেনকাকাকে বলিলাম—এখন উপায় কি ?

ভূপেনকাকা বলিলেন—এখন প্রথম কর্ত্তব্য এ কথা বাড়ীর কাহাকেও প্রকাশ না করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কাপড় ও হাড় খানি পুলিস দারোগার দ্বারা পরীক্ষার জন্য সিবিল সার্জ্জেনের নিকট প্রেরণ করা। আর তৃতীয় ও প্রধান কর্ত্তব্য—এ পাপ কাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা।

আমি বলিলাম—তাহাতে লাভ কি ? আর তাহার সম্ভাবনা কোথা ?

ভূপেনকাকা বলিলেন—লাভ যথেষ্ট। পাপের দণ্ড দেওয়ায় লাভ আছে বৈকি। আর সম্ভাবনা S T মার্কা জুতা।

(৯)

আমি বলিলাম—ভগবান করুন যেন শীঘ্রই খোকাকে পাওয়া যায়।

মুখে তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্য এ কথা বলিলাম বটে, কিন্তু হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল। পুরুষোত্তমের গৃহিণীর শোকসন্তপ্ত রক্তহীন মুখ দেখিয়া হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যাইবার মত হইতেছিল। আমার মনে হইতেছিল এরূপভাবে পুত্রস্নেহবিধুরা জননীকে প্রবঞ্চনা করা আমাদিগের

অবিধেয়। কিন্তু ভূপেনকাকার কথা অমান্য করিবার দায়িত্বটাও গ্রহণ করিতে পারি নাই।

গৃহিণী বলিলেন—আমার যদি স্বামীর চরণে মতি থাকে, যদি ভগবান সত্য হন, তা হ'লে বাছাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইব।

আশায় জগত চলিতেছে। তখন স্ত্রীলোকের হৃদয় হইতে আশা টুকু কাড়িয়া লইয়া কি হইবে?

ভূপেনকাকা বলিলেন—বৌমা, আজ আপনি প্রবোধ দিয়া বড় বাবুকে বাহিরে পাঠাইতে ভুলিবেন না। আমরা প্রায় গ্রাম শুদ্ধ লোককে সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতে বলিয়াছি।

সন্ধ্যার সময় গিরিশরায়ের বৈঠকখানা বাটিতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর গ্রামের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বসিয়া বড় বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সকলেই কিন্তু নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ এমন কি বড় বাবুর প্রগল্‌ভ অনুগ্রহজীবিদিগের মুখেও বাক্ নিস্পত্তি হইতেছিল না। আর হইবেই বা কেমন করিয়া! যাঁহার অনুগ্রহের উপর ইহাদিগের ভরণ পোষণ, মান সম্ভ্রম সমস্তই নির্ভর করিতেছিল, তাঁহার এরূপ বিপদেও যদি তাহারা ম্রিয়মাণ না হইবে, অথবা দুঃখিত হইবার ভাণ না দেখাইবে তাহা হইলে পৃথিবীতে ও নরকে প্রভেদ থাকিবে কেমন করিয়া।

ভূপেনকাকা কখন আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম তাঁহার পাকা মাথা এ আসরেও কি একটা কার্য্য করিতেছিল। তিনি বলিলেন—"এদিক ওদিক চাহিতেছে ও লোকটা কেহে?" আমি বলিলাম—"কে? মথুর বাবু? উনি আজ মাস চার পাঁচ হইল বড় বাবুর নবগ্রহের মধ্যে এসে জুটেছেন। বোসেদের পুরান বাড়ীতে মথুর বাস করে"।

ভূপেনকাকা উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হারাধন চুপি চুপি বলিল—ম্যানেজার মশায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

"ভূপেনকাকার অদ্ভুদ্ প্রক্রিয়া গুলো আমি সব বুঝ্‌তে পারি নি। আমায় বোলে গেছেন উনি হাত তুল্‌লে কোনও ছল ক'রে ঘরের আলোকটা নিভিয়ে দিতে হ'বে।"

বলিতে বলিতে ভূপেনকাকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি হাত তুলিলেন। আমিও দীপটি ছল করিয়া নিভাইয়া দিলাম।

বলা বাহুল্য, দুই এক মিনিটের মধ্যেই আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। শেষে ভিতর হইতে সংবাদ আসিল বড় বাবু বাহিরে আসিবেন না। সুতরাং মজলিস ভঙ্গ হইল।

আমিও উঠিয়া যখন কিছু দূরে আসিয়াছি তখন নবীনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার ফিরিলাম। বুঝিলাম ব্যাপারটা একটু গুরুতর হইয়াছে। ভীড়ের ভিতর কে মথুর বাবুর জুতা চুরি করিয়াছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম ভূপেনকাকা সেখানে নাই।

[ক্রমশঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কালীঘাটের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশশত খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাঠান ভূপতিদের রাজত্বকালে কালী-ঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছিল। কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিক বেত্র ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষে আকীর্ণ ছিল। কালীর মন্দিরের কিছু পূর্ব্বদিকে জঙ্গলময় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী অল্পপরিসর রাস্তা ছিল। আমরা ইহাকে এক্ষণে রসারোড বলি। এই পথ দিয়া নকুলেশ ও কালীদেবী দর্শনার্থী যাত্রিগণ গমনাগমন করিত এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতি কপিলাশ্রমে যাইত। সে সময়ে সাগর দ্বীপের উত্তরে ও কালীঘাটের দক্ষিণে অম্বূলিঙ্গ মহাদেব ও সঙ্কেতমাধব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন কালীঘাটের সম্মুখস্থ আদিগঙ্গা অত্যন্ত পরিসর ছিল। নদীর ধোয়াট ও পলী জমিয়া গিয়া এক্ষণে উহা কমপরিসর হইয়াছে। কলিকাতার পশ্চিমদিকে অবস্থিত যে ভাগীরথী প্রবাহিত আছে,) যাহাকে আমরা হুগলী নদী অভিহিত করিয়া থাকি) তখন উহা একটি খালের মত কমপরিসর ছিল। এই নদীবক্ষ দিয়া পোতসহকারে লোকেরা তমলুক, হিজলী, উৎকল প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত। * কালীঘাট একটী পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইবার পর অনেক বৎসর পর্য্যন্ত উহা জঙ্গলময় ছিল। সে সময়ে ভৈরবী, কাপালিক এবং শক্তিপূজকগণ কালীঘাটে নরবলি দিত। দশশত খৃষ্টাব্দে

* See Calcutta Review Vol. 22.

আদিশূর কান্তকুব্জ হইতে পাঁচটী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার পর বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।* বাগ্রী বিভাগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিবাসী কাপালিকদের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আইসে। বঙ্গদেশের সেনবংশীয় নৃপতিগণ শৈব ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মে তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল। তাঁহাদের শাসনে ও কালের ভবিষ্যৎ গর্ভনিহিত চৈতন্য-দেবের ভক্তিরসের প্রভাবে কাপালিকদের অত্যাচার হইতে লোক নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

যে সকল উপপুরাণ ও তন্ত্রে কালীঘাটের বিবরণ বিবৃত আছে, ঐ সকল শাস্ত্র প্রকটিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে কালীপীঠ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ছিল। যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে প্লাবিত, সেই সময়ে ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সুতরাং কালীক্ষেত্র অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে লোকের বিদিত। কিন্তু তখন কালীঘাট বলিয়া ইহার নামকরণ হয় নাই। বঙ্গদেশের পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে হিন্দু-বণিকগণ এই স্থানের কালীঘাট নামকরণ করিয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে বা একেবারে যে উহা এই নামে অভিহিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পালবংশীয় নৃপতিগণের শাসনকালে ইহার কালীঘাট নামকরণ হইয়াছিল। ঐ সময়টী বর্ত্তমান সময় হইতে ২০০০ বৎসরের কম কোন মতেই হইতে পারে না।

১৫০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে তন্ত্রশাস্ত্রে কালীপীঠের বিবরণ ব্যতীত কালীক্ষেত্রের অন্য কিছু বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহার সেই সময়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে কলিকাতার উত্তরে পানীহাটী ও কালীঘাটের দক্ষিণে ছত্রভোগ প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণরচিত চণ্ডী-গ্রন্থেও এই সকল গ্রামের বিবরণ আছে। যদিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কালীঘাটের কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাচ ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে তখন উহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল না, বরং তখন উহার চতুঃপার্শ্বে গ্রাম সকল স্থাপিত হইয়াছিল। নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, কালীঘাট শক্তিউপাসকদের তীর্থ বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক উহার উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য-

* ইহার বিবরণ মধুভারত ৩য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

দেবের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কাল হইতে কালীঘাটের চতুঃপার্শ্বে লোকের বসতি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আকবর বাদসাহের ঐতিহাসিক আবুল ফজল আইন আকবরী প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে কালীকোটা নামে একটী স্থানের উল্লেখ আছে। দেখা যাউক, তিনি কালীকোটা কোন্ স্থানটীকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দক্ষিণ বঙ্গের গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুতানটী, গোবিন্দপুর এবং অন্যান্য কতকগুলি গ্রাম বাণিজ্যপ্রধান স্থান হওয়াতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর ম্যানেজার জব চারণক (Job Charnock) সাহেব ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলি হইতে ইংরাজদিগকে সুতানটীতে লইয়া আসেন এবং ইংরাজেরা ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের উদ্দেশে কালীকোটা নামক স্থানে দুইটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুতানটীর দক্ষিণ এবং গোবিন্দপুরের উত্তরে কালীকোটা অবস্থিত। বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর উত্তরে সুতানটী অবস্থিত অর্থাৎ সুতানটীর উত্তর সীমা হাটখোলা ও দক্ষিণ সীমা টাকশাল। আর গোবিন্দপুরের উত্তর সীমা লালদীঘী ও হেয়ার ষ্ট্রীট। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যে স্থানটী হেয়ার ষ্ট্রীট ও টাকশালের অন্তর্ভূ'ত তাহাই কলিকাতা বলিয়া অভিহিত হইত। কিন্তু আইন আকবরী রচিত হইবার সময়ে সুতানটীর দক্ষিণ হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত স্থানটীকে কালীকোটা বলিত। সে সময়ে কলিকাতার উত্তরসীমা বারাকপুর, পূর্ব্বসীমা নিমতা, দক্ষিণসীমা গোবিন্দপুর ও পশ্চিমসীমা ভাগীরথী নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আবুল ফজল বর্ত্তমান কলিকাতা ও ভবানীপুর কালীকোটার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিল। বোধ হয় ঐ স্থানগুলি তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং অপর কোন নাম না থাকাতে ঐ স্থানকে কালীকোটা নামে অভিহিত করা অসম্ভব নহে। আবুল ফজল বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং পারস্য ভাষায় কালীঘাটা বানান করিতে গিয়া 'ঘ' এর পরিবর্ত্তে 'ক' ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ কবর্গের চতুর্থ বর্ণের স্থানে প্রথমবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য কালীঘাটা শব্দটী কালীকোটা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাঢ়দেশের লোকেরা এখনও পর্য্যন্ত কালীঘাটের পরিবর্ত্তে কালীঘাটা ব্যবহার করে। ইংরাজেরা কালীকোটার 'ই'কার পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া উহা এক্ষণে কলিকাতায় পরিণত হইয়াছে এবং এদেশীয় লোকেরা তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়া কালীকোটার পরিবর্ত্তে ইহাকে

কলিকাতা নাম দিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কালীদেবীর নাম হইতে কালীঘাট, কলিকাতা এবং ভবানীপুর এই তিনটী স্থানেরই নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভবানীদেবীর অপর একটী নাম; সুতরাং আইন আকবরীতে লিখিত কালীকোটা টাকশাল ও কালীদেবীর মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীর নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মিসেস কিণ্ডারলী (Kinderley) লিখিত একখানি পত্রে সেই সময়ের কালীঘাট ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে যে, বেলিয়াঘাটা হইতে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত ভূমিটী সে সময়ে জলাময় ছিল। স্থানে স্থানে দুই একখানি বাঙ্গলা (Bungalow) ঘর দৃষ্ট হইত মাত্র। ঐ বাঙ্গালায় ইংরাজ ও শেটবণিকেরা বাস করিত। যাতায়াতের জন্য পাল্কীই একমাত্র যান ছিল। ডাকাইত ও হিংস্রক জন্তুর ভয়ে কেহই ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে সাহস করিত না। ইংরাজ কুঠীর কর্ম্মচারীরা দলবদ্ধ হইয়া ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিত। বর্ত্তমান পার্কষ্ট্রীটের নিকট দুইখানি মাত্র ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী ছিল। একখানি সেণ্টপল্‌স্ স্কুল * অপরখানি প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পীর † বাসস্থান ছিল। এক্ষণে সেই ভিটায় লরেটো হাউস ‡ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অপজন সাহেব § কৃত কলিকাতার মানচিত্রে ধর্ম্মতলা ও ভবানীপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ২৪ খানি মাত্র পাকাবাটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ কুঠীর ম্যানেজার হলওএল্ সাহেবের ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশ, চৌরঙ্গী হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে কালীঘাটে পঁহুছিতে পারা যায়।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে উলানিবাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় কৃত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী নামক পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কালীঘাট ঐ সময়ের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যাত্রীরা তথায় আসিয়া দেবীর পূজা দিত এবং অত্যন্ত সমারোহের সহিত ছাগ, মেষ ও মহিষ বলিদান করিত।

এই সময়ে দেবীর সেবাএত বর্ত্তমান হালদারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবীর

---

* St. Paul's School

† Sir Elijah Impey

‡ Loretto House

§ Upjohn

মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতি করে। তাহাদের দৌহিত্রগণ কালীঘাটের উত্তরে চড়কডাঙ্গা নামক স্থান অধিকার করে। তাহাদের জমীদারীর দলিলাদি দৃষ্টে বুঝা যায় যে, সেবাএতগণ দৌহিত্রগণকে এই সকল জমি দান করেন। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কালীঘাট বর্ত্তমান ছিল। সে সময়ে ঐ জমির কতকাংশে সেবাএতদের আবাস উপযোগী ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী ছিল, কতকাংশে বাগান, কতকাংশে ইতর লোকদের পর্ণকুটীর, আর অবশিষ্টাংশ জলাভূমি।

কর্ণেল কিড্ * লিখিত ঐ স্থানের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সে সময়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্রক জন্তুর আবাসভূমি ছিল। এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন টলী (Captain Tolley) নামক জনৈক সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী কালীঘাটের সম্মুখস্থ নদী, যাহাকে আমরা আদিগঙ্গা বলি, ধোয়াট ও বালুকা দ্বারা বুজিয়া আসিতেছে দেখিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা হইতে আলিপুর ও মারহাট্টা খাদ পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে বালুকাচর কাটাইয়া দেন। সেইজন্য আদিগঙ্গাকে এখনও পর্য্যন্ত টলিরনালা † কহে।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কৃত চণ্ডীগ্রন্থে কালীঘাট ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জিলার সিলিমাবাদের জমীদার গোপীনাথ নিয়োগীর জমিদারীর অন্তর্গত দামিন্যা গ্রামে মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে যখন রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা, তিনি সেই সময়ে মুসলমান জমিদারদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আড়রার জমিদার বীরমাধব রায়ের পৌত্র এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রাজা রঘুনাথ রায়ের শরণাপন্ন হন, এবং তথায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রঘুনাথ রায়ের অভ্যুদয় হয়। চণ্ডীগ্রন্থ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৯৯ শকে লিখিত।

চণ্ডীগ্রন্থ প্রকটনের অব্যবহিত কাল পরেই ভবানন্দকৃত মনসার ভাসান নামক গ্রন্থে কালীঘাটের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইল যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ আইন আকবরী গ্রন্থ প্রকটনের সময় কালীঘাট একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

* Col. Keade
† Tolley's Nullah

কালীমূর্ত্তির আবিষ্কার ও উহার স্থাপনের বিবরণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

কালীমূর্ত্তি প্রচার হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে একজন সন্ন্যাসী বর্ত্তমান কালীর মন্দিরের সন্নিকটে জঙ্গলময় স্থানে এক পর্ণকুটীরে যোগ অভ্যাস করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে যখন তিনি সায়ংসন্ধ্যা জপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কিয়দ্দূরে এক অলৌকিক বৈদ্যুতিক আলোক তাঁহার নয়নগোচর হইল। কৌতূহলবশতঃ যেস্থানে আলোক উদ্ভূত হইতেছিল, তথায় তিনি গমন করিয়া দেখিলেন যে উহা ভাগীরথীর সুগভীর দহ হইতে নির্গত হইতেছে। ঐ দহ বর্ত্তমান কালীকুণ্ড হ্রদ। তিনি আলোকের বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নে তথায় গিয়া দেখিলেন যে দহের কূলে একটী প্রস্তরময় মুখ ও সূর্য্যজ্যোতিবিশিষ্ট মনুষ্য চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি তথায় নিপতিত। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এই নির্জ্জন স্থানে কে এই অঙ্গুলি আনয়ন করিল। অবশেষে স্থিরসিদ্ধান্ত করি-লেন যে ইহা স্বর্গীয় ব্যাপার। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি দেবতার স্তব আরম্ভ করিলেন। তখনি আকাশবাণী হইল যে ইহা দক্ষযজ্ঞে বিনষ্ট সতীর চরণের অঙ্গুলি। ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে নকুলেশ ভৈরবের দর্শন পাইলেন। সেই দিবস হইতে তিনি অঙ্গুলি যত্নপূর্ব্বক রাখিলেন এবং কালীর মুখ ও নকুলেশ ভৈরবের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করত পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই ব্যাপার জনসাধারণে প্রচার হইল।

দ্বিতীয় প্রবাদ। দক্ষিণ বড়িসার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী বংশোদ্ভব সন্তোষ রায় একদা সন্ধ্যার সময়ে কালীঘাটের সম্মুখস্থ ভাগীরথীর বক্ষে নৌকা-যোগে গমন করিতে করিতে কালীঘাটের সন্নিকটস্থ জঙ্গলে শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল নির্জ্জন অরণ্যে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি অতীব আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শব্দোত্থিত স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী ব্রহ্মচারী কালীমূর্ত্তির আরতি করিতেছেন। সন্তোষ রায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। সুতরাং দেবী দর্শন করিয়া অতীব ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং ব্রহ্মচারীর সহিত কথোপকথনে অবগত হইলেন যে, এই দেবীমূর্ত্তিটী সতীদেহের এক অংশ এবং ব্রহ্মচারী প্রত্যহ দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। সেই দিন হইতে সন্তোষ রায় তথায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ

করিলেন এবং স্বয়ং দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। তৎপরে এই ব্যাপার সাধারণের গোচরীভূত হইল।

তৃতীয় প্রবাদ। বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের পূর্ব্বপুরুষ কেশব রায় আপনার জমিদারীভুক্ত কোন নির্জ্জন বনে যোগ সাধন করিতেন। স্বপ্নে তাঁহার প্রতি কালীর প্রত্যাদেশ হইল যে, কালীকুণ্ড হ্রদ হইতে ব্রহ্মা-নির্ম্মিত প্রস্তরময় মুখ উঠাইয়া লইয়া উহার প্রতিষ্ঠা কর। তিনি উহা উঠাইয়া লইয়া কালীকুণ্ড হ্রদের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ যেখানে বর্ত্তমান মন্দিরটী স্থাপিত আছে, তথায় ঐ মূর্ত্তিটী স্থাপন করিলেন, দেবীর প্রত্যহ নিয়মিত পূজার জন্য মনোহর ঘোষাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন এবং দেবীর পূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কতক জমি দেবোত্তর করিয়া দিলেন। তৎপরে জঙ্গলাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া দেবীর জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কেশব রায়ের চতুর্থ পুত্র সন্তোষ রায় পিতার আদেশানুসারে একটী ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই ক্ষুদ্র মন্দির ভগ্ন হওয়াতে রাজীবলোচন রায় নামক কেশব রায়ের জনৈক উত্তরাধিকারী তদানীন্তন আলিপুরের কালেক্টার ইলিয়ট (Elliot) সাহেবের অনুমত্যনুসারে বড় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। মনোহর ঘোষালের মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্রগণ দেবীর পূজার ভার প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান সেবাএত হালদারগণ সেই দৌহিত্রগণেরই বংশাবলী।

চতুর্থ প্রবাদ। যে স্থানটী এক্ষণে কালীঘাট নামে অভিহিত, তাহা বড়িসার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারীভুক্ত ছিল। তখন উহা চাঁদপুর গ্রাম নামে অভিহিত হইত। সে সময়ে উহা নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময়ে আত্মারাম নামক জনৈক ব্রহ্মচারী দেবীর প্রত্যাদেশে অবগত হন যে সতীদেহের এক অংশ তথায় পতিত হইয়াছে। সেই প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এবং ঐ স্থানটী পুণ্যভূমি জানিয়া তথায় দেবীর অবস্থিতির বিষয় তিনি সাধারণ্যে প্রচার করেন। পরে বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরী বংশ-সম্ভূত প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কেশব রায়ের ভ্রাতা কাশীশ্বর রায় তথায় একটী ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং সেই সময়েই দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটী ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত এবং ঐ স্থানের নাম ছিল কালীঘাট। অবশেষে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর সুবরবন মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের আমলে বড়িসার ভূম্যধিকারিগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বড় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। সেই মন্দিরটীই বর্ত্তমান মন্দির। এবং দেবীর প্রত্যহ

পূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রায় ৬০০ বিঘা জমি দেবীর নামে দেবোত্তর করিয়া দেন। এই জমির উপসত্ব এক্ষণে হালদারেরা ভোগ করিতেছে।*

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্র।

অনুকূল বায়ুভরে, নির্ম্মল আকাশ তলে, সংসার তরণীখানি ধীরে কাল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল, নিশ্চিন্ত কর্ণধার স্বীয় দক্ষতা উপলব্ধি করিয়া আত্ম-প্রসাদে বিভোর ছিল, অকস্মাৎ বায়ুর গতির পরিবর্ত্তন হইল, উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে তরিখানি নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইল। কি করিলে তাহার সর্ব্বস্ব অকূলে নিমজ্জিত না হয়, কি উপায়ে এই বিদ্রোহের সম্মুখে বিনষ্ট না হয়, কর্ণধারের সে শিক্ষার প্রয়োজন। শান্তিপূর্ণ রাজ্য, শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা, অবনত প্রজা, অর্থ পূর্ণ ভাণ্ডার, রাজা প্রমোদে দিন অতিবাহিত করিতেছিল, কোথা হইতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস করাল বদনে সমস্ত গ্রাস করিল, রাজ্য মরুভূমি হইল, অশান্ত প্রজার হাহাকারে ও অভিসম্পাতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, এ সঙ্কটে কি উপায়ে নৃপতি নৃপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, তাহা তাঁহার বিদিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সহাস্য বদন, প্রফুল্ল আনন, শান্তি ভরা হৃদয়, স্থির বিশ্বাস, দলিত রিপুনিচয়, নরনারী প্রকৃতি বক্ষে সকলি সুন্দর দেখিতেছিল, সহসা সমস্ত বিপর্য্যয় ঘটিল, হৃদয়ে অশান্তি দেখা দিল, বিশ্বাস টলিল, রিপু উত্তেজিত হইল, এই বিপ্লবে আত্মরক্ষার মন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার সাহিত্যক্ষেত্রে বিবিধ নরনারীর অবতারণা করিয়া ঘটনাবর্ত্তে তাহাদের চরিত্রগত ঔজ্জ্বল্য ও মলিনতার বিকাশ সাধন করিয়া, সমাজ ও লোকশিক্ষা প্রদান করেন।

জগৎপতি তাঁহার অন্যান্য সৃজন অপেক্ষা মানবে অধিক চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন। মানব একটী চরিত্রে স্বীয় হৃদয়াগত ভাব ও

* See Administration Report of Suburban Municipality for 1872-73—Page 46.

চিন্তা ও চরিত্রগত কার্য্যাবলীর সামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিলে, জীবন-সংগ্রামে সেই চরিত্রের পদানুসরণ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যদি এমন একটী চরিত্রের কাহিনী তাহার মানসপটে অঙ্কিত হয়, যাহার ভাব ও চিন্তা তাহারই হৃদয়ের ভাব ও চিন্তার প্রতিকৃতি এবং কার্য্যাবলী তাহারই অনুরূপ, সে স্থলে ঘটনাবলীর ঘূর্ণাবর্ত্তে যখন তাহার সঙ্কট সময় উপস্থিত হয়, জীবন পথে মহা অশান্তি দেখা দেয়, তখন তাহার মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, তাহার অনুরূপ চরিত্রটী সঙ্কট সময়ে কোন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। কবির নিপুণতায় সেই চরিত্র-চিত্রে যদি মানব সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, সে এই পথে তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল বলিয়া সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়াছে, ঐ পথে গমন করিলে সকলি রক্ষা হইত, তবে তাহার সেই চরিত্র অনুশীলনা হইতে কত মঙ্গল উদ্ভূত হয়!

মানবের শিক্ষা, অধ্যয়ন ও শ্রবণ এই দ্বিবিধ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দর্শনে শিক্ষা বিরল ও বহুকাল সাপেক্ষ। এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তাহার অনিষ্ট হইল, হয়ত তাহার কার্য্যটী করিতে পঞ্চ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং কুফল বোধ জন্মিতেও পঞ্চ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই স্থলে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে সেই ভ্রান্তি নিবারক শিক্ষা লাভ করিতে হইলে দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হয়। সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থলেই স্বীয় বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এরূপ দৃষ্টান্ত গোচর হয় না। শিক্ষার জন্য মানবকে অধ্যয়নের উপরই সমধিক নির্ভর করিতে হয়। শুদ্ধ কতকগুলি নীতি বাক্যের সমষ্টি, জন সমাজে বাঞ্ছনীয় শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। বিপদে ধৈর্য্য, সদা সত্য কথা, পরকে আপন জ্ঞান, ধর্ম্মে মতি প্রভৃতি নীতি বাক্য সকলেই শ্রবণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত হৃদয়-পটে অধিকাংশ স্থলেই কার্য্যকরী অঙ্কন প্রদানে অসমর্থ। যে জাতির মনস্বিগণ মানব চরিত্র সম্যকভাবে পর্য্যালোচন করিয়া তাহাদের দুর্ব্বলতা ও পতন, স্থিরতা ও উন্নতি, যে পরিমাণে জন সমাজে সুস্পষ্ট প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই জাতি সেই পরিমাণে জগতে ধর্ম্ম ও শান্তি-মার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কাব্য ও সাহিত্যের চরিত্র মূল নির্ভুল, বিকাশ সংযত এবং কার্য্যাবলী সুস্পষ্ট হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হয়। কবি ও সাহিত্যিকগণ রচনায় সাধারণতঃ ত্রিবিধ চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন।

(১) স্বীয় বিচক্ষণতা বলে মানবের অন্তর সম্যক পর্য্যালোচন পূর্ব্বক, চরিত্রগত দোষ ও গুণের বিচার করিয়া কাল্পনিক চরিত্র বিকাশ।

(২) নানারূপ ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা ও তাহাদের আখ্যায়িকা।

(৩) ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর চরিত্র মূল স্থাপন পূর্ব্বক পরিণতি সত্য ও সামঞ্জস্য যুক্ত রাখিয়া কল্পনা বলে সেই চরিত্রের সুবোধ্য বিকাশ সাধন।

এই ত্রিবিধ উপায়ের কোন্‌টীর বহুল প্রচারে অধিকতর উপকার সাধিত হয়, তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

শুদ্ধ কাল্পনিক চরিত্র বোধ হয় অধিকাংশ স্থলেই বাঞ্ছনীয় ফল প্রদানে সমর্থ হয় না। প্রথমতঃ ইহাতে সত্যের অভাব। সত্যের প্রতি মানবের আস্থা প্রগাঢ়। কাল্পনিক চরিত্রে কোন অসাধারণ ত্যাগস্বীকার, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ধৈর্য্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণান্ত রণ প্রভৃতি ব্যাপার অনেকে কবির কল্পনা বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন। সেই পথে বিচরণ অসম্ভব ও বাতুলতা বলিয়া হতাশ হইতে পারেন। বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক তবে সেই পথে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি হইবে। এই উপায়ে মঙ্গল স্থির জানিলে কে তাহা অবলম্বন করিতে বিরত থাকে? তখন হৃদয় হইতে স্বতঃ প্রণোদিত ইচ্ছা অজস্রধারায় প্রবাহিত হয় আর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক না হইলে কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

The parchment roll is that the holy river,
From which one draught shall slake the thirst for ever?
The quickening power of science only he
Can know, from whose own soul it gushes free.

মহাভারত ও রামায়ণ কত কাল ব্যাপিয়া জন সমাজে অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! যদি অসংখ্য যাত্রী আজও অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র পূর্ণ তীর্থ জ্ঞানে দর্শন করিতে না যাইত, যদি ভারতের অসংখ্য স্থানে অসংখ্য নিদর্শন হিন্দুর মনে রাম ও সীতার, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের অস্তিত্বের বিষয় জাগরূক করিয়া না দিত, তাহা হইলে এই মহাকাব্য দ্বয়ের প্রভাব ও শিক্ষা এরূপ অক্ষয় অব্যয় ভাবে থাকিত না।

দ্বিতীয়তঃ, কথা আছে "মুণীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" কবি মহা প্রতিভাবান ও দার্শনিক হইলেও তাঁহার ভ্রম হওয়া একান্ত অসম্ভব নহে। চরিত্র মূল তিনি যে ভাবে অঙ্কুরিত করিলেন, হয়ত বাস্তবিক নৈসর্গিক উপায়ে সেরূপ সম্ভব নহে, তাহার শ্রম সে স্থলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং শিক্ষার্থীদিগের নয়ন সমক্ষে

একটী ভ্রমাত্মক আদর্শ রহিয়া গেল। যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে কেহ তাহার অনুসরণ করেন তবে ভবিষ্যতে অনুতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। কারণ কৃত্রিম ও অপ্রকৃত বস্তু কদাপি স্থায়ী হয় না এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহার অপদার্থতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, কবির ব্যক্তিগত ভ্রমাত্মক ধারণা, তাহার স্বীয় হৃদয়ের যে বৃত্তি নিচয় প্রবল তাহার আভাষ, মতের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষ অনিচ্ছাসত্বেও কাল্পনিক চরিত্র গঠনে অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে।

Imagination is the enemy of science when it works without reason, that is arbitrarily and whimsically.

ঐতিহাসিক চরিত্র ও তাহার আখ্যায়িকায় উপরোক্ত ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা সত্য এবং তাহাতে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। সে পথে অনুসরণ করিতে না পারিলে মানব আপনাকে অসমর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, কিন্তু এবম্প্রকার চরিত্রের অবতারণা অধিকাংশ স্থলে তেমন বিশদ হয় না। উপযুক্ত বিবৃতি ও প্রতিপন্নকারী দৃষ্টান্তের অভাবে তাহার কার্য্যকারিতা তেমন সম্পূর্ণ হয় না, মূল প্রকৃত রহিল, পরিণতিও নির্ভুল হইল কিন্তু বিকাশের জটিলতা বশতঃ আশানুরূপ হৃদয়গ্রাহী হইল না আরও ঐতিহাসিক চরিত্রে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রতিফলন হয় না। মানব সৌন্দর্য্যের উপাসক। সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহাদের মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। যেখানে সৌন্দর্য্য নাই মানব হৃদয় সহজে সেদিকে ধাবিত হয় না। অমুক মহা গুণবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার কার্য্যাবলীও মহৎ, কিন্তু কতদূর ত্যাগস্বীকারে, মনের সহিত কিরূপ ভাবে দ্বন্দ্ব করিয়া কোন্ অবস্থায় কিরূপ কার্য্য করিয়া তিনি এই সকল লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থাকি। এইরূপ চরিত্রে প্রকৃত আদর্শ আমরা প্রাপ্ত হইলেও অনুসরণ করিবার সুগম পন্থা প্রাপ্ত হই না। এই স্থলে জন সমাজে তাহা বোধগম্য করাইতে কবিকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই কল্পনা উপেক্ষার সামগ্রী নহে, ইহাই কবির শক্তি, কবির বিশেষত্ব। হয়ত আলোচ্য চরিত্রে একটী মহান গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হয়ত তাহার কার্য্যকলাপে সেটী সাধারণ সমক্ষে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। কবি প্রতিভাবলে একটী সামান্য বাক্যে, একটী তুচ্ছ ঘটনায় তাহা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইলেন। অনেক বৃত্তি মানব হৃদয়ে অস্ফুটভাবে লুক্কায়িত থাকে। উপযুক্ত স্থল পাত্র ও কালাভাবে তাহার সম্যক বিকাশ সাধারণের নয়ন গোচর হয় না। এই সমস্ত পরিস্ফুরণ কার্য্যে

যাঁহার কল্পনা যে পরিমাণে সত্যের প্রতিকৃতি ও হৃদয়গ্রাহী তিনি সেই পরিমাণে শক্তিমান ও প্রতিভাবান কবি। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ এবং সেই কামনা কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া, শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি"।

অতএব প্রতীতি হইতেছে, সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে, ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর চরিত্রমূল স্থাপনপূর্ব্বক, পরিণতি সত্য ও সামঞ্জস্যযুক্ত করিয়া কল্পনাবলে চরিত্রের যে সুবোধ্য বিকাশ সাধন তাহাই পূর্ণ। ইহাতে সত্যের অবমাননা নাই এবং তজ্জনিত বিশ্বাসহীনতার সম্ভাবনাও নাই। ইহাতে কবির প্রতিভা ও কল্পনার সাহায্যজনিত সুস্পষ্ট বিকাশের প্রতিবন্ধক নাই। পরিণতিও, সত্য ও প্রকৃত থাকায় গঠন প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যহীন হইতে পায় না। কেহ কেহ বলেন কল্পনা করিয়া না গঠন করিলে সত্য ও প্রকৃতের উপর নির্ভর করিলে সর্ব্বপ্রকার চরিত্রমূলের আদর্শ মিলে না। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধাতার অনন্ত সৃজনে এমন অঙ্গহানি নাই যাহা পূরণ করিতে কল্পনার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত, সৃজন জগৎপতির কার্য্য, প্রকাশ ও পরিস্ফুটনই কবি ও কাব্যের কর্ত্তব্য। প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া জনসমাজে তাঁহার মহিমা গানই কবির ধর্ম্ম। এতদ্‌সম্বন্ধে কবির কর্ত্তব্যবিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Nineteenth Century পত্রে যে মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল, "যাহা সত্য ও প্রকৃত তাহারই উপর গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎপরে বুদ্ধিবৃত্তিও কল্পনার সাহায্যে ইহার বিকাশ সম্পাদন কর। যদি পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে বাস্তব ও প্রত্যক্ষের উপর কাব্যের ভিত্তি সংস্থাপিত কর, কিম্বা যদি কল্পনার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া থাক তবে যাহাতে সেই কল্পনা পরিণামে সত্য ও প্রত্যক্ষ কোন একটী পদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হয় তৎসম্বন্ধে যত্নবান হও।"

শ্রীউমাচরণ ধর।

ডোরা।

(টেনিসনের "ডোরা" হইতে অনুবাদিত।)

শূন্যঘরে ল'য়ে শুধু বালিকা বালক
আলেন্ করিত বাস,—প্রাচীন কৃষক।
সে বালক উলিয়েম্, আলেন্-সন্তান ;—
বালিকা—সোদর-কন্যা,ডোরা তার নাম।
সংসার-অরণ্যে বৃদ্ধ সেই দুটী ল'য়ে,
যাপিত জীবন দিন হাসিয়ে কাঁদিয়ে।
দেখি সদা সেই দোঁহে সে বৃদ্ধ কৃষক
ভাবিত, হইবে যবে যুবতী যুবক ;—
"উদ্বাহ-বন্ধনে আমি বাঁধিব দোঁহায় ;
সুখের সংসার তার হবে সুখময়।"
পিতৃব্যের এ আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া অন্তরে,
সুন্দরী সুশীলা ডোরা উলিয়েম্ 'পরে
অনুরক্তা হ'য়ে ক্রমে আপনার মনে
জীবন, যৌবন, প্রাণ অর্পিলা গোপনে।
উলিয়েম্ কিন্তু তা'রে দেখি নিশি দিনে,
প্রণয়-রাগিণী তন্ত্রী মধুর নিক্কণে
বাজাইয়া প্রেমস্রোত ফিরাতে সে পথে
অক্ষম হইয়ে ধূলি মাখিল অঙ্গেতে।

ইতিমধ্যে একদিন জনক তাহার
সস্নেহে সম্বোধি' পুত্রে কহে অতঃপর ;—
"শোন্ বাছা! পিতা তোর অধিক বয়সে
উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল শেষে।
কিন্তু আজি কহি তোরে;বড় সাধ মনে
পুত্র তোর দেখি শীঘ্র জুড়াই জীবনে।
তোর সাথে যাহে এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
সোদর-দুহিতা মম, বালিকা-গৃহিণী
অনিন্দ্য সুন্দরী ডোরা হয় পরিণীত,
তারি'তরে স্থির এবে করিয়াছি চিত।
আরো বলি, শোন্ বাছা! সহোদর সনে
একদিন মনবাদ ঘটিল দু'জনে।
পিতৃব্য তোমার তায় তেয়াগি আমায়
অজানা বিদেশে গিয়ে লইল আশ্রয়।
যাইয়ে তথায় পরে সোদর আমার
লভিল মরণ হায় ত্যজিল সংসার!
তারি তরে পিতৃহীনা বালিকা ডোরায়
পালিনু যতনে রাখি স্নেহের-শয্যায়।
সমর্পণ তারে এবে করি তোর করে
নিশিদিন এই সাধ আমার অন্তরে।"

এতেক শুনিয়া পরে সংক্ষেপে উত্তরে
উলিয়েম্ পুত্র তার অবজ্ঞার ভরে ;—
"ডোরার বিবাহ—নাহি হ'বে আমা' হতে!
যাবৎ জীবন তারে নারিব বরিতে।"
দুর্ব্বিনীত পুত্র মুখে এতেক শুনিয়া
মুষ্টিবদ্ধ করি' বৃদ্ধ কহিল গর্জ্জিয়া ;—
"এত স্পর্দ্ধা! এত বীর্য্য! রে মূঢ় অজ্ঞান!
ডোরায় গ্রহণ নাহি করিবি কখন,—
বেদ বাক্য সম জ্ঞান চিরদিন মোরা
করিতাম পিতৃ বাক্য হৃদে ভক্তি ভরা।
বলি শোন্ রে অবোধ! আজিও তেমতি
অটল আমার আজ্ঞা র'বে তোর প্রতি।
মাসেক সময় তোরে করিলাম দান,
চিন্তি' মনে সদুত্তর করিতে প্রদান!
নতুবা কহি রে শোন্ শপথি ঈশ্বরে,—
বিদায় এ গৃহ হ'তে হ'বি একেবারে।"
শুনি এত, উলিয়েম্ দংশিয়া অধর
রোষভরে ভ্রান্ত প্রায় করিল উত্তর।
ডোরা প্রতি আচরণ তার দিন দিন
হইতে লাগিল ক্রমে নির্ম্মম কঠিন।
মাসেক অতীত পূর্ব্বে ব্যথিত অন্তরে,
পিতৃ গৃহ ত্যজি যুবা কৃষিকর্ম্ম করে।

হিংসা দ্বেষে ক্লান্ত হিয়া বিশ্রাম কারণে
বরিল উইলিয়েম্ মেরি মরিশনে।
পরিণয় তনয়ের শুনিয়া শ্রবণে,
কহিল আলেন্ এবে ভ্রাতৃজায়ার সনে;—
"শোন্ মা! বালিকা তুই, শোন্ মনদিয়ে;
বড় ভালবাসি তোরে সকলের চেয়ে;
কিন্তু যদি কহ কথা সেই পুত্র সনে,
কিম্বা তার পত্নী সনে, জেনো স্থির মনে,
গৃহ অর্থ যাহা কিছু আছয়ে আমার
নাহি পাবে কভু তুমি কণামাত্র তার।
অতীব কঠিন জেনো অঙ্গীকার মম,
অটল অচল রহে হিমাচল সম।"

ধীর, স্থির, নম্র ডোরা করি' অঙ্গীকার
চিন্তিলা অন্তরে পরে, "না রবে তোমার
হেন ভাব চিরদিন; পিতৃ স্নেহ-বশে
মার্জ্জনা করিবে পরে সন্তানের দোষে।"
দিন যায়, নাহি চায় কারো সুখ দুখ,
অবিরাম বহে যায় নাহি চায় মুখ।
উদ্বাহের পরে যুবা লভিল কুমার।
সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইল তাহার!
দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিকল অন্তরে,
উলিয়েম্ প্রতিদিন জনকের দ্বারে
ফিরিতে লাগিল বুক বাঁধিয়া আশায়—
অপূর্ণ রহিল তাহা পূরিল না হায়!

ক্রমশঃ।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২০শে আষাঢ় জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন হংকং ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে, বঙ্গমাতার কৃতিপুত্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও স্বদেশসেবক হিতবাদী-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

তিনি দুই বৎসরকাল রোগে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত জাপানে গমন করেন। কিন্তু আর তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল না! মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসেও জন্মভূমির উদ্দেশে কাব্যবিশারদ মহাশয় এই কবিতাটী লিখিতেছিলেন—

"এই কি জীবন শেষ? জীবন-রঙ্গিনি!
কোথা প্রিয় জন্মভূমি?
কোথা আমি? কোথা তুমি?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি?
উচ্চ আশা উপদেশ,
সকলেরি এই শেষ?
শীর্ণ ক্লিষ্ট চিন্তাকুল রোগীর শয্যায়
সমুদ্রে বাষ্পীয়-পোতে—বারিচর প্রায়।

তোমার মহিমা গাব, ওমা বঙ্গভূমি !
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু চলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা—দেখিলে ত তুমি !
এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে,
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন সদনে
যেতে হ'লো—মন সাধ রহিল মা মনে !"

('হিতবাদী' হইতে উদ্ধৃত।)

যিনি মাতৃসেবায় আপনাকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের কথা ভাবিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্ত আত্মীয় স্বজন বিরহিত হইয়া, সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে জগতের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নশ্বর দেহখানিও মহাসাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হইল, মাতৃকোলে—মাতৃভূমিতে স্থান পাইল না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় !

বিশারদ মহাশয় একজন উপযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই পরিচালনে "হিতবাদী" বঙ্গদেশের সংবাদ পত্র সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ, কঠোর সমালোচনা ও তীব্র ভাষা উন্মার্গগামী ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতে বড়ই তৎপর ছিল। তাঁহার নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতা সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য। দেশের কল্যাণকর সকল প্রকার কার্য্যেই বিশারদকে অগ্রণী হইতে দেখা যাইত। বিশারদ মহাশয়ের পরলোক গমনে ভারতের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

"হিতবাদী" তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে পরিচালিত হইয়া তাঁহার স্মৃতি ও কীর্ত্তি চিরকাল অটুট রাখুক—তাঁহার পুত্রগণ পিতৃ আদর্শ অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

কৃপাময় জগদীশ্বরের রাজত্বে তাঁহার মুক্ত আত্মা চির শান্তিতে বিরাজমান থাকুক, ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিবারি প্রদান করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।



ভক্তি ও জ্ঞান।

এই পৃথিবী একটী মহা আকর্ষণী শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করেন, চন্দ্রকে আকর্ষণ করেন, এইরূপ প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির প্রত্যেকের এক একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা জল স্ফীত হয়, জোয়ার ভাঁটা হয় আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। শূন্যে কোন দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা ভূতলে পতিত হয় তাহাও দেখিয়া থাকি। ইহা এই আকর্ষণা শক্তির ফল। এইরূপে প্রত্যেক অণু পরমাণুর পরস্পরের মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান আছে। এই শক্তি জড় জগতে আকর্ষণ (Attraction) নামে পরিচিত এবং বিশিষ্ট চেতন রাজ্যে ভক্তি, প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ শূন্য হইলে, জড় জগতের যে প্রকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, চেতন রাজ্যেও সেইরূপ ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি বৃত্তি বিরহিত হইলে, মৃতবৎ হইয়া থাকে। ফলতঃ ভক্তি প্রেম বিরহিত হইয়া চেতনের অবস্থান অসম্ভবপর।

শাণ্ডিল্য মুনি স্বপ্রণীত ভক্তি মীমাংসা সূত্রে ভক্তির লক্ষণ জানাইবার সময়ে বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরে যে পরা অনুরক্তি,—চিত্তের যে পরমেশ্বর বিষয়ক বৃত্তি বিশেষ, তাহাই ভক্তি।" (সাপরানুরক্তিরীশ্বরে।) পরমেশ্বরের আকর্ষণই তৎপ্রতি ভক্তি জন্মিবার কারণ। ভগবান যদি দয়াপূর্ব্বক আকর্ষণ না করেন, তবে কোন ব্যক্তিরই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয় না। আত্মার প্রতি যে সকলেরই আকর্ষণ আছে—"তুমি তোমাকে ভালবাসিও" এইরূপ উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই যে সকলে আপনাকে ভালবাসে তাহা স্থির। আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, যে অনুরাগ, যে আকর্ষণ, তাহা অহেতুক। আত্মাই প্রিয়তম, সুতরাং আনন্দময়। পরমেশ্বর পরমাত্মা। অতএব তাঁহার প্রতি যে পরানুরক্তি হইবে,—তাহাই ত নিয়ম। লোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া বিষয়কে পাইতে চাহে,—একথা প্রকৃত সত্য বলিয়া বোধ হয় না। লোকে পরমাত্মা মনে করিয়া বিষয়কে ধরিতে যায়, ভ্রান্তিবশতঃ দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়। যিনি জ্ঞানানুশীলন পূর্ব্বক সর্ব্ব কার্য্যের কারণ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিময় পরম কারুণিক ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল, অসীম করুণা দেখিয়া-

মান দেখিয়া ভক্তিপ্লুত না হন, তাঁহার জ্ঞানানুশীলন বৃথা ;—জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা যে ব্যক্তি চেতনাচেতন পদার্থ মাত্রেই চৈতন্যময় বিশ্বম্ভরকে বিরাজমান দেখিতে না পান তবে তাঁহার সে জ্ঞান লাভ বৃথা, তাঁহার শিক্ষা নিস্ফল।

জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে জন্ম লাভ করে। প্রত্যক্ষ হইতে আমরা যাহা অনুভব করি, তৎসমুদয়ের সংস্কারই জ্ঞান বীজ। পণ্ডিত Jevons বলিয়াছেন All knowledge proceeds originally from experience. শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বাস্তব জগতের স্বরূপ জ্ঞাত হই, এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক পক্ষে কোন্‌টি সুখকর এবং কোন্‌টি দুঃখজনক তাহার একটা চৈতন্য লাভ করি। আমাদের স্মৃতিতে ইহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইতে থাকে। এইরূপে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এবং জন্ম হইতে জন্মান্তরে আমাদের শরীরকে ও মনকে কতকগুলি সংস্কারে গঠিত করিয়া তুলি। সুখ এবং দুঃখের স্বরূপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মার সঙ্কীর্ণতা বা বাধিত অবস্থাই দুঃখ এবং আত্মার অবাধিত অবস্থা বা প্রসারতাই সুখ। যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে আমাদের জ্ঞান আমাদের সুখ ও দুঃখ বোধের উপর স্থাপিত এবং সেই সুখ ও দুঃখ আত্মার অবস্থা ভেদের উপর নির্ভর করে তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে আমাদের জ্ঞান ও আত্মার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মার সংকীর্ণতা দূর হয় ও প্রসারতা বর্দ্ধিত হয় তাহাই পরম সুখকর ও আনন্দদায়ক এবং সেই কারণেই তাহাকে আমরা প্রকৃত জ্ঞান বলি। ঈশ্বরের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে গেলে আমাদের আত্মা স্থান, কাল পাত্রের বাধা সহ্য করিতে পারে না সুতরাং তাহার সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া অসীমের ভাব ধারণ করিতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানের দ্বারা দর্শনের দ্বারা যখন আমাদের হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রত্যেক অণু হইতে গ্রহ উপগ্রহাদি পর্য্যন্ত যে এক অসীম শক্তি অলক্ষিত ও অবিচলিত ভাবে কার্য্য করে,—যখন আমরা উহা হৃদয়ঙ্গম করি—তখনই আমাদের আত্মার প্রকৃত প্রসারতা হয়। আত্মার প্রসারতা হইতে পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চার হয়। পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আবার অধ্যাত্ম জগতে জ্ঞানের একাধিপত্য নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ কেহ কেবল জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না ;—ঋষিগণ তাঁহাকে বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে প্রেম পথের অনেক যাত্রী

তাঁহার নিকট পৌছিয়াছেন। প্রখর বুদ্ধি যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, ভক্তি অনেক সময়ে ক্লিষ্ট পথিককে সেই পথে পৌছিয়া দেয়। সত্য বটে জ্ঞান-সারথী সঙ্গে না থাকিলে ভক্তি অনেক সময়ে আমাদিগকে অপথে লইয়া যায়; ভক্তি অনেক সময়ে অপাত্রে নিয়োজিত হইয়া মনুষ্যকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে,—তেমনি জ্ঞানও যদি প্রেমের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় তবে তাহা নীরস, দাম্ভিক ও অবিমৃষ্যকারী হইয়া উঠে। এজন্য আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মোদ্যম এই তিনটি অবয়বে সুসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই কারণ গীতা জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি যোগের বিশেষ মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতার ১০ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে কথিত আছে,যে ব্যক্তি অনন্যশরণ হইয়া আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হয়, শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজন পূজন করে, শরীর মন ও প্রাণের সহিত যে আমার উপাসনা করে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ এবং সকলে তাহাকে মান্য করে।—গীতার ১০ম অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে কথিত আছে,—যে ব্যক্তি আমাতেই তন্ময়চিত্ত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া প্রেমানন্দে আমার ভজনা করে এরূপ ভক্তকে আমি জ্ঞান প্রদান করি—যে জ্ঞানের দ্বারা তিনি অবাধে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

গীতা শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমরা প্রধানতঃ দুই দিক দেখিতে পাই;—এক দিকে জ্ঞান ও কর্ম্ম, অন্য দিকে প্রেম ও ভক্তি। গীতায় জ্ঞানীর উচ্চাসন আছে, কিন্তু ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ এক স্থানে বলিয়াছেন, জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু যিনি আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ (যুক্ততম। ৪৭ শ্লোক ৬ অঃ)।

ভগবদ্গীতা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি সমন্বিত একটি সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম চিত্র। জ্ঞান যোগ হইতে গীতার আরম্ভ—কর্ম্ম যোগ উহার শেষ কথা;—কেননা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতা শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে ভগবান কাহাকে প্রাধান্য দিতে চাহেন এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে;—গীতার ২য় অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, জ্ঞান যোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট, অতএব জ্ঞান যোগের শরণাপন্ন হও। যাহারা সকাম কর্ম্মী তাহারা নিকৃষ্ট। ভগবানের এই উপদেশের উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তবে

আমাকে এই জ্ঞাতি বধরূপ পাপ কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? ৩য় অঃ ১ম ও ২য় শ্লোক।

এই প্রশ্নের উত্তরে গীতার কয়েক অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য,—কর্ম্ম তাহার সাধন। তত্ত্বজ্ঞান (ব্রহ্ম-জ্ঞান) অর্থাৎ পরাবিদ্যা, যে বিদ্যার দ্বারা সেই অবিনাশী সত্য স্বরূপকে জ্ঞাত হওয়া যায়। নিস্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে সেই জ্ঞান লাভ করা যায় না। যিনি তাহা লাভ করিয়াছেন তিনি কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্ত।

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই, যোগসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে সেই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞানেতেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। ৪ অঃ ৩৮ শ্লোক।

যেমন প্রজ্বলিত পাবকে কাষ্ঠ রাশিকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। ৪ অঃ ৩৭ শ্লোক।

এই সমস্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, জ্ঞান লক্ষ্য—কর্ম্ম সোপান মাত্র। নিস্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি করিয়া জ্ঞানমঞ্চে আরোহণ করিতে হয়। যিনি তথায় আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহার আর কর্ম্ম নাই। এখন দেখা যাক কি উপায়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। গীতা উপদেশ দিতেছেন,

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধাবান, নিষ্ঠাবান ও সংযতেন্দ্রিয় তিনিই এই জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরঃ—অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ, ভগবদ্‌ভক্ত। ভক্তি বিনা জ্ঞানের সার্থকতা হয় না, যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেই জন্য গীতায় ভগবানের ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানী ভগবানকেই ভক্তি করেন এবং ভগবানও ভক্ত জ্ঞানীর প্রতি সদাই প্রসন্ন।

"ভক্তি" কথাটা হিন্দু ধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং বড় প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবেত্তারা ইহা নানাপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও ভক্তিবাদী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তদিগের চরিত্রানুশীলন দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে এই বোধ হয়, যে সময়ে মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বর মুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয় সেই অবস্থাই ভক্তি। অর্থাৎ যে সময়ে জ্ঞানার্জ্জন পিপাসা ভগবানের অনুসন্ধান করে, কার্য্যকরী ক্ষমতা ভগবানে অর্পিত হয়, হৃদয় মুগ্ধকর বৃত্তিগুলি ভগবৎ সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং শারীরিক বৃত্তি নিচয়ও ভগবানের কার্য্য সাধনে বা আজ্ঞা পালনে ব্রতী হয়, সেই অবস্থাকেই প্রকৃত ভক্তি বলা যায়। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম

ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে—তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে এবং ইহাই প্রকৃত ভক্তি।

ভজ্ ধাতুর অর্থ—সেবা করা, এই ধাত্বর্থ লইয়া ভক্তি শব্দের অর্থ করিলে বুঝা যায়, পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগই ভক্তি। মাতা-পিতা, গুরু পুরোহিত, রাজা প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিই ভক্তির পাত্র। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। ২য়তঃ নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতিও ঘটে না।

এখন দেখা যাক মনুষ্য মধ্যে কে কে আমাদের ভক্তির পাত্র। ১মতঃ মাতাপিতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞান দাতা—এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। পুরোহিত অর্থাৎ যিনি ভগবানের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বদা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্র স্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত—তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়ে স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই ৺"পতিরেকোগুরুস্ত্রীনাং" শাস্ত্রে আছে অতএব তিনি স্ত্রীর ভক্তির পাত্র। হিন্দু ধর্ম্মে ইহাও বলে, যে স্ত্রীও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত। কেননা, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মী স্বরূপা মনে করিবে। যেখানে স্ত্রী স্নেহ, ধর্ম্ম বা পবিত্রতা প্রভৃতি সর্ব্বাংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন সেখানে তিনি স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত। গৃহ ধর্ম্মে ইহারা ভক্তির পাত্র। আবার যাঁহারা ইঁহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহ মধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, অর্থাৎ যদি পিতামাতাকে পুত্র কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই, উহা নরক বিশেষ। একথা বেশী বুঝাইতে হইবে না, ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।*

[ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তত্ত্বনিধি।

*৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলিতে "মিলনী"র সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।—সহঃ সম্পাদক।

নীল কুঠী।

(১০)

অবনী হারাইবার পর প্রায় যখন দশ দিন অতিবাহিত হইল তখন আমি ভূপেনকাকাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম—এ বিষয়ে তাহার শোক-সন্তপ্ত পিতাকে অন্ততঃ সত্য কথাটা বলিয়া দেওয়া ভাল। ভূপেনকাকা হাসিয়া বলিলেন —"সত্য কথাটা কি ?"

আমি বলিলাম—কেন তা'র খুনের ব্যাপারটা !

ভূপেনকাকা হাসিয়া বলিলেন—অবনী যে খুন হইয়াছে তা'র প্রমাণ ?

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—আর যে সে খুন হয় নাই তারই বা প্রমাণ কই ?

ভূপেনকাকা বলিলেন—অবনী জীবিত আছে সে কথা অবশ্য স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি না। তবে তুমি যে প্রমাণের উপর তাহার হত্যা সিদ্ধান্ত করিতেছ সে প্রমাণ কিছু না, আমি ডাক্তারের রিপোর্ট পাইয়াছি।

আমি বলিলাম—তিনি কি বলেন ? "ডাক্তার সাহেব রক্ত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন তাহা স্তন্যপায়ী জীবের রক্ত। এবং যে হাড়খানা পাঠাইয়া ছিলাম তাহা তিনি মনুষ্য অস্থি বলিয়া নির্ণয় করেন নাই।"

ভূপেনকাকার বাক্য শুনিয়া আমার হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইল। ভাবিলাম সত্য সত্য বালক জীবিতও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ওরূপভাবে তাহার কাপড়ে রক্ত মাখিয়া, তাহার শরীরের অলঙ্কার ফেলিয়া রাখিয়া সেই স্থলে অপর জন্তুর অস্থি ছড়াইয়া কাহার কি লাভ হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর মনে পড়িল সেই মথুরবাবুর জুতা চুরির কথা। বালক চোরের পদচিহ্নের সহিত তাহার জুতার অবিকল সাদৃশ্য দেখিয়া বড় বিস্মিত হইতেছিলাম। আপনার উপকারী বন্ধুকে বিনা কারণে বিপদ্‌গ্রস্ত করায় তাঁহার কি স্বার্থ আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার পর আবার রিভলভার লইয়া নিঃশব্দে ভূপেনকাকার সহিত বাহির হইলাম। সতর্কতার সহিত উভয়ে বোসেদের পুরাণ বাড়ীর চতুর্দ্দিক একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম। সুবৃহৎ ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার একটি গৃহে মাত্র দীপ জ্বলিতেছিল। ভূপেনকাকা বলিলেন—চল এইদিকের ভাঙ্গা দেওয়ালটা লাফিয়ে বাড়ীর মধ্যে যাই। মথুর বাবুর কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ না ক'রে ফেরা হ'বেনা।

যেমন পরামর্শ তেমনি কার্য্য। আমরা নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে তাহার পার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—মথুরবাবু সেই গৃহটিতে শুইয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে উঠিয়া জানালার নিকট আসিয়া দেখিতেছিলেন। আমরা অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া পার্শ্বের গৃহ হইতে তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিতেছিলাম।

ভাবে বোধ হইল তিনি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; দেখিলাম আমাদের অনুমান মিথ্যা নহে। কিছুক্ষণ পরে সেই গৃহে বড়বাবুর বন্ধু নিবারণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চুপি চুপি মথুরের কর্ণে কি একটা বলিলেন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মথুরবাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল—তিনি বলিলেন, সময়ে সময়ে খোদার উপর খোদ্‌কারি চলে কিন্তু মথুরঘোষের কাজের উপর কলম চালায় এমন মিয়া ত এ মুলুকে দেখিনি। অমন ১০টা ভূপেন এলেও কিছু করে উঠ্‌তে পার'বে না।

নিবারণবাবু বলিলেন—কিন্তু যাই বল বাবা নীলকুঠী পর্য্যন্ত ত' সন্ধান করে গিয়েছে।

নীলকুঠীর নামে মথুর বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। আলবোলার নলটা নিবারণবাবুর হস্তে দিয়া সে বলিল—আর নীলকুঠীর ভিতর ঢুকেও বাছাধনের হাড় হিম হ'য়ে গেছে। আর বোধ হয় বুড়া মড়ার পিছনে ছুটবে না।

তাহার পর যেসকল কথা হইল তাহা হইতে বিশেষ কিছু সত্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। শেষে সুরাপান করিতে করিতে পাষণ্ডদ্বয় যখন অচৈতন্য হইয়া পড়িল তখন আমরা সেস্থান ত্যাগ করিলাম। আপনার ক্লান্ত দেহ লইয়া যখন প্রবাসের নির্জ্জন শয্যায় শুইয়া বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তখন সেই নৃশংস কপটাচারী মনুষ্য রাক্ষসদিগের বিস্ময়কর চরিত্রের সমস্তটা বিশাল বলিয়া মনে হইতেছিল।

(১১)

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ভূপেনকাকাকে দেখিতে পাইলাম না। হারাধনের মুখে শুনিলাম তিনি হঠাৎ বাড়ী হইতে সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। বাটির মধ্যে গৃহিণীর সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতাম। ভূপেনকাকা চলিয়া যাওয়ায় আজ তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। বড়বাবু আজ ভয়ানক কষ্টে বাহিরে আসিয়াছিলেন। নিবারণ ও মথুর যখন তাঁহার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল, তখন আমার মনে হইল

কালবিলম্ব না করিয়া পাপাত্মাদিগের আসল চরিত্রটা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু বুঝিলাম প্রমাণাভাবে আমার কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না এবং আমরা তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছি, এ কথা জানিতে পারিলে আমাদিগের অভিষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। আজ বহুদিন পরে বড় বাবুর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব দেখিয়াও ভাবিয়াছিলাম যত দিন না সত্যানুসন্ধান হয়, অন্ততঃ এ পামরদিগের দ্বারা ত' শোকাতুর পিতা পুত্র শোক বিস্মৃত হইতে পারিবেন তাহাই লাভ।

তাঁহার সহচরদ্বয় চলিয়া গেলে বড়বাবু বলিলেন—যোগিনবাবু আমি কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে কলিকাতায় যাইতে মনস্থ করিয়াছি। ইচ্ছা আছে কল্যই রওয়ানা হইব।

বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাবে আমি আপত্তি করিলাম। কিন্তু বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল কেবল মাত্র নবীনকে লইয়া তিনি প্রাতঃকালে কলিকাতা যাইবেন।

উক্ত ঘটনার তিন চারি দিন পরে আমি সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য নদীতীরে যাইতেছিলাম, এমন সময় একটি কৃষক আসিয়া আমার হস্তে এক টুক্‌রা কাগজ দিল।

কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কাগজ কোথা হইতে পাইলে?

কৃষক বলিল—বাবুদের ঠাকুর বাড়ির ধারে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন তিনি হুজুরের হাতে এই কাগজ দিতে বলিল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার মাথা মুণ্ড কিছু বুঝিলাম না। তাহাতে লেখাছিল—

"পত্রপাঠ ঠাকুর বাড়ির দরজায় আসিবে। রিভলভার আনিও—ভূপেন্দ্র"

বুঝিলাম ভূপেনকাকার কলিকাতা যাওয়ার রটনাটা মিথ্যা কথা। কোনও একটা উদ্দেশ্যে তিনি এই স্থলেই আছেন।

(১২)

"এ বেশ কেন?"

ভূপেনকাকা বলিলেন—ভেক না নিলে কি ভিক্ষা মেলে। বাবুদের ঠাকুর বাটীর ধর্ম্মশালায় কত সাধু সন্ন্যাসী আছে সুতরাং আমাকে এবেশে এখানে আর কে চিন্‌বে?"

"কিন্তু আসল কথাটা কি? হঠাৎ এখন তলব কেন?"

ভূপেনকাকা বলিলেন—মথুরকে অনুসরণ ক'রে অনেক খবর পেয়েছি। চুরির রাত্রে তার যে অপর দু'জন সহায় ছিল তাদেরও সন্ধান পেয়েছি, কি উদ্দেশে বালক চুরি হ'য়েছিল তা'ও টের পেয়েছি। কিন্তু এখনও অবনীর ঠিক সন্ধান পাই নাই।

আমি হতাশ হইয়া বলিলাম—তবে ত' সবই হ'য়েছে! অবনী বেঁচে আছে কিনা তার সন্ধান পেয়েছেন?

ভূপেনকাকা বলিলেন—খুব সম্ভব বেঁচে আছে। কিন্তু এখনও সঠিক কিছুই বলিতে পারি না।

আমার আর তাঁহার সহিত সময় ও উদ্যম নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না। যাহার জন্য এত পরিশ্রম, যাহাকে পাইবার আশায় সমস্ত পরিবার, সমগ্র কর্ম্মচারিমণ্ডল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, যাহার জন্য একটা প্রসিদ্ধ বংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া পাপীর অনুসন্ধান করা আমার পক্ষে সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইল না।

ভূপেনকাকা বলিলেন—অপর আসামীটাকে পায়ের দাগ মিলাইয়া ধরিয়াছি। ব্যাপারটা বড় অসাধারণ।

উত্তরে বলিলাম—তাহা ত' নিঃসন্দেহ। কিন্তু আসল ব্যক্তি কই? বড় বাবু ত' বাড়ী ছেড়েছেন।

তিনি বলিলেন—তা জানি। তাঁর সঙ্গে নবীন আছে।

ভাবিলাম কাকা এত সংবাদ জানেন, কেবল আসলটিই জানেন না। শেষে আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্যের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন—গৃহে আগুণ লাগাতে হবে, পারবে?

আমি বিস্মিত ভাবে কহিলাম—সে কি! সে আবার কি!!

ভূপেনকাকা বুঝাইয়া বলিলেন তিনি কয়দিন ধরিয়া মথুরের বাটীর উপর দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। দিবাভাগে তাহার মধ্যে কি কার্য্য হয় তাহা তিনি নিরীক্ষণ করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস যদি অবনী জীবিত থাকে তাহা হইলে ঐ বাটীতেই আছে। এ রহস্যের মধ্যে এমন ব্যাপার আছে যাহার জন্য দুর্ব্বৃত্তেরা অবনীকে প্রজ্বলিত বাটীতে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। সুতরাং গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলে নিশ্চয়ই তাহারা অবনীকে সরাইবে। সেই সময় আমরা তাহার সন্ধান পাইব।

আমি প্রশ্ন করিলাম—এ কার্য্যের জন্য ঘর জ্বালাইবার প্রয়োজন কি?

একেবারে প্রকাশ্যভাবে লোক জন লইয়া বাড়ী ঘেড়াও করিলেই ত' সকল কথা জানিতে পারা যায়।

ভূপেনকাকা বলিলেন—তাহার বিরুদ্ধে দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ যদি অবনী হেথায় না থাকে তাহা হইলে দুর্ব্বৃত্তেরা বড়ই সতর্ক হইবে। আর দ্বিতীয় কারণটি বড় গোপনীয় পরে বুঝিবে।

(১৩)

গ্রামের যে প্রান্তে রায়েদের ঠাকুরবাটী, বোসেদের পুরাণ বাড়িটিও সেই দিকে। বোসেদের বাটীর দুই দিকে মাঠ এবং দক্ষিণে একটা বড় পুষ্করিণী তাহার পর গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। সে স্থল হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে নির্জ্জন রাস্তা দিয়া যাইলে পশ্চিমে নীলকুঠী। ভূপেনকাকা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন গৃহদাহের সময় দুর্ব্বৃত্তেরা গ্রামে বা ঠাকুর বাটীতে অবনীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা সম্ভবতঃ নীলকুঠীর দিকেই অগ্রসর হইবে। সুতরাং আমার উপর আদেশ ছিল গৃহে অগ্নিসংযুক্ত হইলেই আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে নীলকুঠীর রাস্তার উপর নজর রাখিব।

যখন নিস্তব্ধ অন্ধকারাবৃত বিমান পথে ধূমশিখা উঠিতে লাগিল, তখন বোসেদের পুরাণ বাটীতে একটা ধূমধাম পড়িয়া গেল। অগ্নির আলোকে দেখিলাম উপরে অনেক লোক ছুটাছুটি করিতেছে। মথুরবাবুকে স্পষ্ট দেখিলাম, আর দেখিলাম বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ একটা নরপিশাচবৎ মূর্ত্তি। নিবারণেরও কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বলিল—"বিলম্ব করিও না, শীঘ্র, শীঘ্র, এখনি গ্রামের লোক জমিলে বড় বিপদ হইবে।" তাহার পর কিয়দ্মুহূর্ত্তের জন্য বড় একটা গোলমাল হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সে বাটীতে এতগুলি মনুষ্য ছিল তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। অবশেষে যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহা পাইলাম। ঠিক আমার পার্শ্ব দিয়া দুই তিনটা লোক বেগে চলিয়া গেল। অন্ধকারে তাহাদের কাহারও মুখ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেওয়াও অবিধেয় ভাবিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিলাম। বলা বাহুল্য, নীলকুঠীর দিকেই যাইতেছিলাম।

অন্ধকারের জন্য আমার সম্মুখবর্ত্তী লোকগুলাকে ঠিক দেখিতে পাই নাই অথচ ধরা পড়িবার ভয়েও তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারি নাই।

নীলকুঠীর ফটকের নিকট আসিয়া লোকগুলা কোথায় গেল ঠিক বুঝিতে

পারিলাম না। একটু কিংকর্ত্তব্য হইয়া অন্ধকারের ভিতর এদিক ওদিক চাহিতেছি এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। আমি তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া আগন্তুকের দিকে রিভলভার ধরিলাম। আগন্তুক বলিল—কি চিনিতে পারিতেছ না? অত ব্যস্ত কেন?

আমি নিরস্ত হইলাম, বলিলাম—কি ভূপেনকাকা!

ভূপেনকাকা বলিলেন—"চুপ্।" নীলকুঠীর একটা পরিত্যক্ত গৃহে সহসা দীপ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধকারের ভিতর দিয়া একজন লোক আমাদের দিকে আসিতেছিল। আমরা একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটি আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে না হইতেই ভূপেনকাকা একেবারে তাহার গলার টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন। তাহার পর নিমেষের মধ্যে দেখিলাম, আমার কাপড়ের প্রান্তভাগটা তাহার মুখের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। লোকটা বল প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে ভূপেনকাকা তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে উত্তরীয় পরিধান করিয়া আমার কাপড়ের অপর প্রান্ত দিয়া তাহার হস্ত পদ দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলাম।

যখন তাহার নড়িবার ক্ষমতা নাই দেখিলাম, তখন ভূপেনকাকার কথা মত হতভাগ্যকে একটা বৃক্ষান্তরালে ফেলিলাম। ভূপেনকাকা বলিলেন—কাপড় দিয়া উহার মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, চিৎকার করিয়াও এ ব্যক্তি আমাদিগের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না।

আমি কিন্তু সে সময় একটি কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়াছিলাম। ঘৃণায় হস্ত পদ আবদ্ধ নরপিশাচকে দুইটা পদাঘাত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

(১৪)

"ধন্য জগদীশ্বর।" হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতোত্থিত আনন্দধ্বনি উঠিল—"ধন্য জগদীশ্বর"! যখন সেই পরিত্যক্ত নীলকুঠীর নির্জ্জন গৃহের অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম শীর্ণ ক্লিষ্ট অপহৃত বালক বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে সেই দীন হীন ভগ্ন গৃহের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে, তখন আপনা আপনি হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল, সেই আকস্মিক হর্ষের আবেগে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। সে স্থলে কি কার্য্য করিতে আসিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়াছিলাম,

তাই অবনী জীবিত আছে তাহা জানিবামাত্রই চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলাম "ধন্য জগদীশ্বর।"

কি করিয়া যে আত্মহারা হইয়াছিলাম তাহা বলা সুকঠিন। এত সতর্কতার সহিত আমাদিগের লুক্কায়িত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম যে অবনী বা তাহার পার্শ্বস্থিত কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে স্থল হইতে অবনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই আমার মানসিক স্থিরতা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই ভূপেনকাকার নিষেধ বিস্মৃত হইয়া আমোদে উৎফুল্ল হইয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"ধন্য জগদীশ্বর।"

আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াই কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটা বিস্মিত ভাবে চমকাইয়া উঠিল। ভূপেনকাকা মৃদুস্বরে বলিলেন—যদি লোকটা আমাদিগের সন্ধান পায় তাহা হইলে সে দুই জনকেই হত্যা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। সুতরাং আমরা যে সশস্ত্র তাহা উহাকে জ্ঞাত করা আবশ্যক। এস আমরা উহার সম্মুখীন হই।

আমি বলিলাম—দুইটা রিভলভার লইয়াও যদি উহাকে ভয় করিতে হয় তাহা হইলে ত' আমরা মনুষ্য নামের উপযুক্ত নই।

চকিতেই কিন্তু দুর্ব্বৃত্তটা আমাদিগকে দেখিতে পাইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন অসহায় মেষশাবক দেখিলে লাফাইয়া উঠে, দস্যুটা তেমনি ভাবে লাফাইয়া আসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল, ভাবিলাম এ বজ্র হস্তের পীড়ন হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভূপেনকাকা এরূপ সময় আপনার বুদ্ধির স্থিরতা হারান নাই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহার রিভলভার হইতে শব্দ হইল—"গুড়ুম"।

আমার পকেটে একটা মারাত্মক যন্ত্র আছে দুর্ব্বৃত্তটা যদি তাহার সন্ধান পাইত তাহা হইলে কি ব্যাপার ঘটিত তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। ভাগ্যক্রমে সে ভীত হইয়া আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। আমি তখনই রিভলভার বাহির করিয়া তাহাকে মারিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় ভূপেনকাকা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"যদি উহাকে মারিবার আবশ্যক থাকিত তাহা হইলে কি আমাদ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইত না? কেবল উহাকে ভয় দেখাইয়া দূর করাই আমার উদ্দেশ্য।"

ভূপেনকাকার কথা শেষ হইতে না হইতে অবনী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ম্যানেজার মশাই। বাবার—"

ভূপেনকাকা তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—কথার সময় নাই খোকা। চল আমরা ছুটিয়া নিরাপদস্থলে গমন করি।

বাহিরে আসিয়া পথের ধারে হস্তপদবদ্ধ মথুরকে দেখিতে পাইলাম না। দ্রুত চলিতে চলিতে ভূপেনকাকা বলিলেন—কালো লোকটা মথুরকে নিয়ে পালিয়েছে। এখনি আবার সদলবলে ফিরিতে পারে, চল এখন অন্য রাস্তায় যাই।

(১৫)

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া শুনিলাম রাত্রে বড়বাবু বাটী ফিরিয়াছেন। আমি ও ভূপেনকাকা তাঁহার সহিত অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দেখিলাম এই কয় দিন প্রবাসে অবস্থান করিয়া পুরুষোত্তমের শরীর আরও কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখের আকৃতি দেখিয়া ভয় হইতেছিল শীঘ্রই তিনি উন্মত্ত হইয়া যাইবেন। ভূপেনকাকার উপর এই কয় দিনে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না জন্মাইলে সুখের সংবাদটা দান করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতাম।

আমাদিগকে দেখিয়া বড়বাবু বিমর্ষভাবে হতাশের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন —কিছু সন্ধান পেলে?

ভূপেনকাকা ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—অগ্নিদাহের পরের।

বড়বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—সে আবার কি?

তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া ভূপেনকাকা বলিতে লাগিলেন—তাহার পর আশু অর্থাৎ যোগেন্দ্র মথুরের পশ্চাদ্ধাবন করে। আমি আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলাম। মথুর অবনীকে নীলকুঠীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আবার প্রজ্বলিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল কারণ পাছে তাহার অনুপস্থিতে গ্রামের লোক তাহাকে সন্দেহ করে। কিন্তু সেই সময় আমরা তাহাকে বাঁধিয়া বৃক্ষান্তরালে রাখিয়া দিই। সেই সময় আশু তাহাকে দুইটা লাথি মারিয়াছিল। আমার বিশ্বাস সেটা অবৈধ।

আমি বিস্মিত হইয়া ভূপেনকাকার কথা শুনিতেছিলাম। রহস্যের শেষে এ আবার এক নূতন রহস্যের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছিলাম ভাবিয়া বড় রহস্য বোধ হইতেছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অবনীর উদ্ধার ব্যতীত পূর্ব্ব রাত্রের সমস্ত ঘটনা ভূপেনকাকা বিবৃত করিলেন। পুরুষোত্তমের নিম্ন ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল। আর নবীন চাকর আপনার পদ ভুলিয়া মনিবের পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল।

ভূপেনকাকা বলিলেন—বড়বাবু, বড় আক্ষেপের কথা পাপিষ্ঠদের পাপের শাস্তি দিতে পারিলাম না। গাছের ডাল ধরিয়া টানিলে পাছে গুঁড়ি খসিয়া পড়ে সেই ভয়ে কিছু করিতে পারিলাম না।

কি ভয়ঙ্কর কথা! কি নির্ভীকতা! তবে কি বড়বাবু ভূপেনকাকার করতলগত? ইহা কি সম্ভব যে পিতা হইয়া কতকগুলা দুর্ব্বৃত্তের সাহায্যে তিনি আপন পুত্রকে চুরি করিয়াছিলেন? পৃথিবীটা নরকের এত নিকটবর্ত্তী তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

ভূপেনকাকা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তাহাদের কি দোষ? অর্থলোভে মূর্খ নীচলোকে ওরূপ কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু আপনি পিতা হইয়া, দেশের কর্ত্তা হইয়া, সমাজের নেতা হইয়া এরূপ নীচতার পরিচয় দিলেন কিরূপে?

নৃশংসের চক্ষে এইবার জল দেখিলাম। আর্ত্তের স্বরে পুরুষোত্তম বলিলেন—ম্যানেজার বাবু জানেন ত' সকলি। ভাবিয়াছিলাম অবনী অদৃশ্য হইলে বিষয়ের মালিক হইব, অর্থকষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব, গোপনে তাহাকে কৃতবিদ্য করিব, শেষে ত' তাহার বিষয় সে পাইবেই। আমায় পাঁচ জনে ভুল বুঝাইয়াছিল—তাই পিতা হইয়া এরূপ নরাধমের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি।

ভূপেনকাকা বলিলেন—আপনার পাপের শাস্তি ভগবান দিবেন। বউমার মুখ চাহিয়াও কি আপনার দয়া হইল না?

পুরুষোত্তম তিরস্কৃত বালকের মত কাঁদিতেছিল। ভূপেনকাকা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন অবশ্য আমি ও আশু ব্যতীত একথা অপর কেহ জানিবে না, এমন কি বউমা অবধি না। কিন্তু আপনাকে সঙ্গীত্যাগ করিতে হইবে। আমি তাহাদিগকে পুলিসের হস্তে দিব না। কিন্তু আপনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকিবে না।

বড়বাবু বলিলেন তুমি তাহাদিগকে শূলে দাও, ফাঁসি দাও যাহা ইচ্ছা কর। তোমাদের মত বন্ধুর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া আমি বৃন্দাবনে গিয়া ঠাকুর বাটিতে বাস করিব। আমার শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে।

নবীন সাহস পাইয়া ভূপেনকাকার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভূপেনকাকা বলিলেন—হতভাগ্য, তুমি আর এদেশে মুখ দেখাইওনা। ইহাই তোমার শাস্তি হইল।

(১৬)

তাহার পর অবনীকে দেখিয়া তাহার জননীর কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল পুরুষোত্তমের জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় জনসাধারণ কি প্রকার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, তাঁহার বন্ধুবর্গের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে কিম্বদন্তীর অনুগ্রহে মহেশপুর গ্রামে কতকগুলি গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। আমি কেবল ভূপেনকাকার নিকট হইতে কতকগুলা রহস্যময় ব্যাপার জানিয়া লইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—জুতার মাপের সহিত বড় বাবুর জুতার মাপ মিলিয়া যাওয়ায় আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম এ কার্য্যের মূলে তাঁহার সঙ্গী আছে। তিনি পুরাতন জুতা কোনও সঙ্গীকে দান করিয়াছিলেন এবং তাহার তলায় সে লোহার ঠোক্কর মারিয়া ছিল। জুতা চুরি করিয়া বুঝিতে পারিলাম মথুর এ ব্যাপারে প্রধান অভিনেতা।

আমি বলিলাম—সে অবধি ত আমিও বুঝিয়াছিলাম। নীলকুঠীতে রক্ত মাখা কাপড় প্রভৃতির রহস্যটা কি?

ভূপেনকাকা বলিলেন—সেটা মথুরচন্দ্রের চালাকী। প্রথম রাত্রে কুকুরটাকে ভুল পথ জানাইবার জন্য অবনীকে নীলকুঠীতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর তাহাকে নিজ গৃহে আনিয়া বেশ যত্নে রাখে। সে বুঝিয়াছিল অনুসন্ধান হইলে পরিত্যক্ত কুঠীটাতেও লোকের দৃষ্টি পড়িবে। যদি আমরা মনে করিতাম বালক জীবিত নাই এবং এ কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িত তাহা হইলে অবনীর ভবিষ্যৎ লালন পালনের কার্য্যটা তাহারা অধিকতর নির্ব্বিঘ্নের সহিত করিতে পারিত। আমার বোধ হয় আমরা জ্যাকের সাহায্যে নীলকুঠীর সন্ধান না পাইলে নবীন প্রভৃতি কেহ পুলিসকে সে সন্ধান বলিয়া দিত।

আমি বলিলাম—বড় বাবু এ ব্যাপারে কর্ত্তা তাহা কি করিয়া জানিলেন?

ভূপেনকাকা বলিলেন—সেটা দৈবাৎ জানিতে পারিলাম। তাহার ভিতর হিসাব পত্র কিছুই নাই। বাড়ী যাইবার নাম করিয়া মথুরের বাটী অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তখন পায়ের মাপ দেখিয়া কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটাকে জানিতে পারি। তাহার পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর বড় বাবুকে মথুরের বৈঠকখানায় দেখিলাম। তখন তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতে সমস্ত বুঝিতে পারিলাম; অবনী সম্বন্ধে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করিবার জন্যই বড় বাবু তথায় গিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম—তা'হ'লে চুরির রাত্রে কে দরজা খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল ?

ভূপেনকাকা বলিলেন—কেন নবীন। তাই সে ভূতের গল্প উদ্ভাবন ক'রে সকলকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

তাহার পর ভূপেনকাকা বলিলেন—এ ব্যাপারের এই খানেই যবনিকা পড়িবে। মথুর প্রভৃতি দেশত্যাগী হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট, আর বড় বাবু এবার নিশ্চয় অনুতপ্ত হইয়া কুপন্থা পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

প্রতাপ ও জাতীয় জীবন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে যদিও সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার মস্তক বিক্রয় করিয়া সম্মান ও সুখ সাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু তথাপি মিবার এই সময়ে যেরূপ ত্রিলোক-বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিল, সেইরূপ স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ যে জগতের মধ্যে একটা দিগ্বিজয়ী গুণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, সে কথার সাক্ষ্য আজিও ইতিহাস দিতেছে। ভারতবাসী সব ভুলিতে পারে, কিন্তু ভামাশাহের যে সেই স্বার্থত্যাগের অমৃতময়ী কাহিনী, তাহা ভুলিয়া সে কখনই আপনার জীবনকে হেয় ও তুচ্ছরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না; ব্রাহ্মণ কুলরবি পুরোহিত শ্রেষ্ঠের প্রভু পুত্রদ্বয়ের মঙ্গলের জন্য যে সেই অতুলনীয় আত্মত্যাগ, তাহাকে ভারতবাসী কখনই হৃদয়ের অতীত স্মৃতি হইতে তাড়াইয়া দিয়া পিশাচের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিবে না।

আমি জানি, প্রতাপের ভ্রাতৃস্নেহের কথার উল্লেখ করিলেই অনেকে প্রতাপ শক্তের বিবাদের কথা তুলিয়া প্রতাপের ভ্রাতৃস্নেহের উপর কটাক্ষপাত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে প্রতাপের প্রেমময় কোমল হৃদয়ে দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য প্রেম প্রবাহ ছুটাইয়াছিল, সে হৃদয় কখনই ভ্রাতৃস্নেহ বর্জ্জিত হইতে পারে না, যে প্রতাপের অসীম বুদ্ধিশক্তি মহামতি আকবরের সর্ব্বজন আদৃত বুদ্ধিশক্তিকেও পরাজিত করিয়াছিল, সেই বুদ্ধিশক্তি

বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বজনতাড়িত বাঙ্গালীর বুদ্ধি শক্তি অপেক্ষা হীনতর ছিল না। পূর্ব্বকালে যখন বীরপুরুষেরা নিজ বীর্য্যের নিন্দা শ্রবণ করিতেন, তখন তাঁহারা আত্মপর ভুলিয়া যাইতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় হইতে গুরু লঘু জ্ঞান দূর হইয়া যাইত, তখন তাঁহারা নিন্দাকারীর প্রাণ বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেন। আজ পরপ্রত্যাশী দুর্ব্বল বাঙ্গালী ইহার জন্য তাঁহাদিগকে "হৃদয় হীন" বিশেষণে বিশেষিত করিতে পারে, কিন্তু তখন তাঁহারা কখনই এরূপ মনে করিতেন না, তখন Chivalry অর্থাৎ শৌর্য্যের এতই সম্মান ছিল। যখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে শৌর্য্য হীনতার দোষে দূষিত করিয়া খর শাণিত বাক্য সমূহের দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু আজ ভারতে এমন শক্তিমান হিন্দু কে আছে যে ইহার জন্য অর্জ্জুনকে দোষী সাব্যস্ত করিতে সাহসী হইবে এবং অর্জ্জুনের ভ্রাতৃস্নেহে সন্ধিহান হইয়া স্বীয় বাতুলতার পরিচয় দিবে? সুতরাং এই শৌর্য্য-দ্বেষ-জনিত কলহ যে প্রতাপের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক লেপন করিয়া দেয় নাই, এবং তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহকেও যে কিছুমাত্র খর্ব্ব করিয়া ফেলে নাই—একথা, তদানীন্তন সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই, আমাদের সকলকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর বাস্তবিকই মহাত্মারা যে কখন কি ভাবিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, সে কথা জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করা আমাদের ন্যায় প্রাকৃত জনের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব এবং ধৃষ্টতা ও বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং যখন আমরা আমাদের স্থূল দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যকারণ গুলি সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব না, তখন আমরা কখনই তাহা তাঁহাদের চরিত্র-দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া আত্ম ধৃষ্টতার মাত্রা বাড়াইব না, বরং তখন আমরা বাসন্তীর সহিত নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করিয়া সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব :—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণি চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতুমর্হতি।

প্রতাপ ও শক্ত উভয় ভ্রাতা এক যোগে স্বদেশের সেবার জন্য স্ব স্ব জীবনকে নিয়োজিত করিলেও, মোগল সৈন্যের প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁহারা ক্রমশঃই পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্যের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও একে একে মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। তাঁহারা এইরূপে দেশ হইতে দেশান্তরে বিতাড়িত হইয়া, অরণ্য ও পর্ব্বত গুহার আশ্রয় লইয়াও নিরাপদ

হইতে পারেন নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাদের পত্নী পুত্র ও কন্যার বন্দীকৃত হইবার আশঙ্কা থাকিত। এমন সময়ও একবার আসিয়াছিল, যখন ভীলেরা প্রতাপের পরিবারবর্গকে ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া, টিনের খনির মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদের রক্ষা সাধন করিয়াছিল। কখন শত্রু পক্ষীয়েরা আক্রমণ করিবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা তখন ছিল না। খাদ্যাদি সব প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহারা সারাদিন যুদ্ধের তীব্র শ্রমে ও চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া আহারে বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল শত্রুগণ আগত, অমনি সেই প্রস্তুত খাদ্যাদি তেমনি অনস্পর্শ রাখিয়াই উঠিতে হইল। শুধু ইহাই নহে, এই সময়ে প্রতাপকে যেরূপ অর্থ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল, সেইরূপ অর্থ কষ্ট কোনও নৃপতি কখনও করিয়াছেন কি না জানি না। প্রতাপ মিবারের রাণা হইয়াও পুত্র কন্যাকে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অন্নের জন্য হাহাকার করিতে শুনিয়াছিলেন, প্রতাপ সহস্র সহস্র লোকের অধীশ্বর হইয়াও স্ত্রী কন্যাকে দাস দাসীর ন্যায় রন্ধনে নিযুক্তা ও গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিয়াছিলেন, তিনি জগতের অন্যতম উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হইয়াও ঘৃণ্য দীন ব্যক্তিগণের ভোজ্য ঘাসের রুটীতে উদর পূর্ণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। বিধাতা, তাঁহার ভাণ্ডারে যত প্রকার বজ্রবেদন আছে, তৎসমস্তই প্রতাপের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে অবসন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ অসাধারণ মানসিক বলে তৎসমূহকেই কুসুম-কোমল-নবনীবৎ মস্তকে ধারণ করিয়া বিস্ময়কর লোক-চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন। তখন এক দিকে আকবর-প্রদত্ত সর্ব্বজন-আকাঙ্ক্ষিত অশেষ সম্মান ও উপঢৌকন, আর অন্য দিকে প্রতাপের প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ—তখন এক দিকে স্ত্রী কন্যার ভবিষ্যৎ নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য, আর একদিকে প্রতাপের প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ, তখন একদিকে পুত্র কন্যার অনাহার-জনিত আর্ত্তনাদ ও হাহাকারের ভীষণ মর্ম্মভেদী চীৎকার, আর এক দিকে প্রতাপের প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ—তখন একদিকে অবিরামবাহী যুদ্ধের প্রাণদাহী অগ্নি বর্ষণ এবং লোকসংঘর্ষণ, আর একদিকে প্রতাপের প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ—তখন একদিকে স্বর্ণ পর্য্যাঙ্কের সুখ কোমল আস্তরণে শয়নের প্রলোভন এবং বিলাসী সুখী-জন-আকাঙ্ক্ষিত ক্ষীর-সর-নবনী প্রভৃতি সুখসেব্য ভোজনের জন্য প্রাণপোড়ান তৃষা, আর একদিকে প্রতাপের প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ! কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রতাপের এই প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ জয়ী হইয়াছিল, প্রত্যেক পরীক্ষাতেই

প্রতাপের এই প্রেমময় স্বাধীন প্রাণ অগ্নি-দগ্ধ স্বর্ণের মনোহর কান্তির ন্যায় মধুর, উজ্জ্বল ও নয়নানন্দদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাপ কিছুমাত্র অবসন্ন না হইয়াই বরং সমুৎসাহে অবসর পাইলেই আপনার মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মোগল সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে যত্নবান হইতেন। কিন্তু আর বুঝি প্রতাপের এই অধ্যবসায় থাকে না, আর বুঝি প্রতাপের হৃদয় সেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পারে না, এইবার বুঝি দৈবের নিকট প্রতাপের পুরুষকার হার মানিয়া যায়। প্রস্তরকে বার বার আঘাত করিলে প্রস্তরও আপনার আকার রক্ষা করিতে পারে না, প্রস্তরও বিকৃতি প্রাপ্ত হয়,—সুতরাং প্রতাপের হৃদয় বিধাতা কর্ত্তৃক এইরূপ বার বার বজ্র-কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে অবসন্ন হইয়া যাইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কোথায়?

এ জগতের যিনিই বিধানকর্ত্তা হউন না কেন, তিনি যে মহাপুরুষগণকে বিপদ সাগরের অনন্ত অনুত্তীর্ণ ঘূর্ণীতে ফেলিয়া, তাঁহাদিগকে দুঃখের তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরীভূত করিতে ভাল বাসেন, এই অতি ধ্রুব সত্য কথাটী আমরা প্রতাপের জীবনী হইতে শিক্ষা পাই, এবং ইহাও শিক্ষা করি যে, মহাপুরুষেরা এই ঘূর্ণীতে পড়িয়া আরও শক্তিমান হইয়া উঠেন এবং এই ঘূর্ণীই তাঁহাদের জীবনকে লোকনয়ন সম্মুখে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে।

একদিন রাত্রে বনপ্রান্তে মরুভূমির সন্নিকটে, প্রতাপ ভূমির উপরে শয়ান রহিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বালিকা কন্যা বন্য পশু কর্ত্তৃক খাদ্য দ্রব্য অপহৃত হওয়ার জন্য অরুন্তুদ মর্ম্ম যাতনায় মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন প্রতাপের হৃদয় এই দুঃখ ভারে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন তাঁহার মনে হইল, আমা কর্ত্তৃক মিবার উদ্ধার বিধাতার অভিপ্রেত নহে, নহিলে কোন্ পাপে এই ক্ষুদ্র বালিকার খাদ্য দ্রব্যই অপহৃত হইল, নহিলে কেনই বা এই বালিকার রোদন আমার চিত্ত বিকার ঘটাইল। সুতরাং, তখন তিনি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকবরের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

দয়ার্দ্র হৃদয় বিরাট নিখিলের বিরাট বিধাতা যখন দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয় সন্তান প্রতাপ অবসন্ন হইয়া, আপনার জীবনের মহাব্রত ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তিনি প্রতাপকে পুনরায় উদ্বোধিত করিবার জন্য মহাকবি পৃথ্বীরাজকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দিয়া বলাইয়াছিলেন;—

"নহে লিখিবার—নহে বলিবার !
নহে ঢাকিবার—নহে সহিবার !
যে কাব্য লিখিতে আজ এই প্রাণ,
ছোটে আর্য্যাবর্ত্তে খুঁজে উপাদান,
হংসপুচ্ছে তাহা নাহি যায় লেখা,
এ মসিতে তার ফুটে না রে রেখা,
জীবন্ত সে কাব্য—জলন্ত সে ভাষা
প্রতি অঙ্কে তার বিকট পিপাসা ;
লেখনী তাহার উলঙ্গিনী অসি
অরাতি রুধির শুধু তার মসি।
* * *
রঙ্গ-ভূমি তার কর দরশন
যবনিকা ওই করি উত্তোলন—
দাঁড়ায়ে প্রতাপ একা নিঃসহায় ।"

মহাকবি পৃথ্বীরাজের এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবেগময় পত্র যখন প্রতাপের হস্তগত হইল, তখন তাঁহার হৃদয় স্বদেশ প্রেমরূপ বন্যার মহান্ প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; তখন তাঁহার এই প্রেম প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুকূল উছলিয়া কেবলমাত্র সমস্ত মিবারভূমি নহে, এমন কি মানসিংহ অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশকেও ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আকবরের অসীম অধ্যবসায় ও উৎকট রাজ্য পিপাসা বহু বৎসর চেষ্টা করিয়াও যাহা সম্পন্ন করিতে পারে নাই, প্রতাপ আজ স্বদেশপ্রেমের মহান্ বলে বলীয়ান হইয়া কেবল মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া এক বৎসরের মধ্যে তাহা সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চিতোর ব্যতীত সমস্ত মিবার মাত্র পুনরধিকার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ; যে ভারত-কুল-কলঙ্ক রাজপুত কুলের গ্লানি মানসিংহকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "রাণা তোমারই সম্মান রক্ষার্থ আমরা আমাদের ভগ্নী কন্যাকে তুর্কীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছি," যে আত্মগর্ব্বী, স্বদেশদ্রোহী মানসিংহকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "যে ভুল হইয়াছে, তাহার আর সংশোধন হয় না," যে ভারতের স্বাধীনতা লুণ্ঠনকারী, প্রতাপশত্রু দাম্ভিক মানসিংহকে বলিতে শুনিয়াছিলাম,"যদি যুদ্ধে তোমার গর্ব্ব বিনাশ না করিতে পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে," সেই আত্মম্ভরী মানসিংহেরও রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া তাহার গর্ব্ব বিনাশ করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাই।

এত জয় লাভের পরও প্রতাপের প্রেমময় হৃদয় একদিনের জন্য শান্তভাব ধারণ করিতে পারে নাই। প্রবাসের যে প্রেমময় বন্ধু-গৃহের যে শোভা, নয়নের যে আনন্দ বর্দ্ধন, বসন্তসমাগমে যে কোকিল কূজন, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির যে বহুদূরাগত বংশীধ্বনি, নিশীথ রাত্রির সুখময় স্বপ্নের যে অর্দ্ধস্মৃতি, শূরগণের যে ভয় ভঞ্জনের পাঞ্চজন্য, রোগীর যে ঔষধ, গোপাঙ্গনাগণের যে মোহন মুরলী ও সংসার মধ্যে যে জন্মভূমি, সেই জন্মভূমি চিতোর যে তাঁহার পিতার পাপে, তাঁহার পিতার অবহেলায় অপহৃত হইয়াছে, এ অপবাদ পিতৃভক্ত প্রতাপ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন না চিতোর অধিকার করিতে পারি, ততদিন হে অম্বর তুমি আমার অনাতপ, হে ধরণি তুমি আমার শয্যা, হে বৃক্ষপত্র তুমি আমার ভোজন পাত্র! মৃত্যুর সময়েও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাবিশিষ্ট, তাঁহার বদনমণ্ডল বিষাদপূর্ণ, তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাবনত, তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যখন সামন্তেরা দেবসাক্ষী করিয়া স্বীকার করিল, যে তাহারা কখনই মুসলমানের নিকট মস্তক অবনত করিবে না, তখন আমাদের হৃদয়ের রাজা, ভারত-গৌরব, মিবারবাসীদের নয়নতারা প্রতাপ নিশ্চিন্ত মনে মহাকালের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মিবারবাসীদিগকে কাঁদাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

প্রতাপ গিয়াছেন—আবার আসিবেন কি না জানি না! কিন্তু আমার হৃদয় আজ কি জানি কোন্ অজ্ঞাত অদৃশ্য শুভ্র হস্তের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল এই কথাই বলিতেছে যে—যে দিন পূর্ব্বকোণে স্নিগ্ধ প্রভাত-সূর্য্য উদিত হইয়া ভারতবাসীকে মহৎ কর্ত্তব্যপালনের জন্য আহ্বান করিবে, সেইদিন প্রতাপ আবার আবির্ভূত হইবেন, সেই মহাযুদ্ধের দিনে তিনি আবার আমাদের নেতৃপদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চালিত করিবেন। এ কথা অনেকের নিকট উচ্ছ্বাস, অনেকের নিকট কাহিনী, অনেকের নিকট নিশীথস্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস রহিয়া রহিয়া, আপনহারা হইয়া অনবসন্নচিত্তে কেবল এই কথাই বলিতেছে, আরঙ্গজেবের অত্যাচারে শিবাজীর উদ্ভব, মুসলমানদিগের ধর্ম্মদ্বেষিতায় গুরু গোবিন্দ ও রণজিতের আবির্ভাব; আর ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্গতির দিনেও যে কোনও অদৃষ্ট নামা মহাপুরুষেরও উদ্ভব হইবে এ কথা স্থির নিশ্চিত।

আজ আমরা আমাদের জাতির এই মহা বিপদের দিনে প্রতাপকে আদর্শ

পুরুষ বলিয়া অভিবাদন করিতে পারি। আজ তাঁহার অনুপস্থিতি সত্বেও তাঁহার জীবনী আমাদিগকে ভ্রাতৃস্নেহ, স্বদেশভক্তি, রাজনীতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের বিশাল বিরাট শিক্ষা পূর্ণরূপে প্রদান করিতে পারিবে, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে। আমরা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি যে, তাঁহার চরিত্র সদ্‌গুণের সমষ্টি এবং তাঁহার জীবনী কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফুলের মালা। এ ফুলের মালা বড় শুভ্র, বড় সুন্দর, বড়ই সুরভিময়। এ ফুলের মালা কখনো শুকায় না, কখনো বাসি হয় না, এ ফুলের বাস কখনো মরে না। যদি বিধাতার চরণতলে কোনও পুষ্পের অঞ্জলি দিতে হয়, তবে এই পুষ্পের, এই ফুলের মালার। আজ আকবরের রাজ্য পিপাসা গিয়াছে, মানসিংহের আত্মম্ভরিতা গিয়াছে, প্রতাপের দেহ আজ মাটির সহিত মিশিয়াছে, কিন্তু, আজ সমস্ত জগতের লোক প্রতাপের উজ্জ্বল দীপ্ত ললাট স্মরণ করিয়া, এই পুষ্পের মনোহর সুবাসে আকুল হইয়া মুসলমান কবি খানখানার সহিত এই কথাই স্মরণ করিতেছে, "এই জগতে সকলই ক্ষণস্থায়ী, ধন জন সবই একদিন যাইবে, রহিবে কেবল মহৎ ব্যক্তির পুণ্যনাম। প্রতাপ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনো মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দু রাজাদের মধ্যে তিনিই—একা তাঁহার জাতির সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।"

বাস্তবিকই আকাশের ঐ চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া গেলে যে ক্ষতি না হইবে, প্রতাপের এই প্রীতি ও পবিত্রতার সম্মিলনে যে পুণ্য পূত জীবন তাহা জগতবাসীর অন্তস্তল হইতে অন্তর্হিত হইলে ততোধিক যে অনিষ্ট সাধন হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এ কাহিনীর তুলনা নাই, ইহার প্রথম হইতে শেষ অবধি যে পরম মঙ্গল, যে আবেগময় প্রীতি, যে গভীর প্রেম, যে বিপুল সংযম, যে নির্ভীক বীরত্ব, যে অসীম ভ্রাতৃস্নেহ, যে নিবিড় আত্মত্যাগ, যে বিনীত পরোপকার প্রবৃত্তি, যে উন্মত্ত পিতৃভক্তি, যে বর্ণচ্ছটাবিহীন শুভ্র বৈরাগ্য, যে উদার ভক্তি, যে বিশাল ধর্ম্মপ্রাণতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার স্থান কে অধিকার করিবে?

ধন্য প্রতাপ, ধন্য তাঁহার স্বদেশভক্তি, ধন্য তাঁহার আত্মত্যাগ, আর ধন্য আমরা যে আমরা আজ তাঁহার পুণ্য কাহিনী আলোচনা করিয়া পবিত্র হইলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

কালীঘাটের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে। ইহাতে সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় বড়িসার জনৈক ভূম্যধিকারী ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আপনার জমীদারীর অন্তর্গত জঙ্গল কাটাইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং দেবীর পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫৯৩ বিঘা জমী দেবোত্তর করিয়া দেন। তিনি চণ্ডীবর নামক একজন ব্রাহ্মণকে দেবীর পূজার জন্য নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমান হালদারগণ এই চণ্ডীবরের বংশধর ও উত্তরাধিকারী। *

দেবী প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সম্বন্ধে যে পাঁচটী বিবরণ উপরে লিখিত হইল, তন্মধ্যে কোন্‌টী সত্য তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তদ্বিষয়ক যাথার্থ নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। তবে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মাণ হইবে বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশোদ্ভব কোন মহাত্মা এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আর দেবীর চরণের অঙ্গুলি ও প্রস্তরময় মুখ কালীকুণ্ড হ্রদের সন্নিকটে পতিত থাকেন ও তথা হইতে উঠাইয়া উহাকে স্থাপন করা প্রভৃতি বিবরণ জনশ্রুতি ব্যতীত আর কিছুই নয় এইরূপ বোধ হয়। আবার ব্রহ্মা নির্ম্মিত মুখের যখন উল্লেখ আছে তখন তাহা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন রাজ্যচ্যুত হইবার পর মুসলমানেরা বঙ্গদেশ জয় করিয়া আপনাদের রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন নৃপতি স্বাধীনভাবে মুসলমানদিগের প্রতিদ্বন্দীতা করেন। পাঠান ভূপতিগণ বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়েন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম আরাকান নৃপতির এবং ত্রিপুরারাজের শাসনাধীন ছিল। দক্ষিণ বঙ্গের সমগ্র বাগ্রী বিভাগ কায়স্থ রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং পাঠানদিগের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবার

---

* See W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. 1., Page 101.

পর পর্য্যন্ত কালীঘাট ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহ যশোহরের কায়স্থ নৃপতিবর্গের শাসনাধীন ছিল। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের ৩৭ খানি গ্রামের ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও উহার উপনগর যশোহর বিভাগভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত।

আবুলফজল প্রণীত আইন-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বঙ্গদেশের কায়স্থ ভূম্যধিকারিগণ সম্রাটকে সৈন্য এবং যুদ্ধোপযোগী সাজসজ্জা সরবরাহ করিত। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সেনাপতিগণ দেশ রক্ষার জন্য বিদেশীয় শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিত বলিয়া তাহারা সম্রাটের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্রাট আকবর সাহার শাসন কালে ক্ষমতাশালী বারোভূঁইয়া জমীদারদের নামের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালীঘাটে যে সমস্ত দেবোত্তর জমীর উপসত্ব হালদারেরা এক্ষণে ভোগ করিতেছেন তাহা পরিমাণে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৯৫ বিঘা ৯ কাঠা এবং ৭ ছটাক। এই জমী খাসপুর পরগণার ষষ্ঠ গ্রাণ্ড ডিভিসনের অন্তর্গত। ই, এফ্, এম্, পি, কিউ চিহ্নিত সবডিবিসন।* কোন মহাত্মা এই জমী দেবতার নামে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা একাল পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ বলেন বড়িসার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কেশবরায়, আবার কেহ বলেন তাঁহার পুত্র সন্তোষ রায়। কিন্তু সাবর্ণদিগের দান খয়রাতি জমীর তায়দাদে এই দেবোত্তর জমীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর কেহ কেহ বলেন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ এই জমী দেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কালীঘাট যখন জঙ্গলাকীর্ণ সে সময়ে রাজা শিলাদিত্য এলাহাবাদে অর্থাৎ প্রয়াগে, ব্রাহ্মণদিগকে অনেক জমী ব্রহ্মোত্তর করিয়া দেন সত্য, কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গে তিনি যে কাহাকে কিছু দান খয়রাত করিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন বা সন্ধান পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নৃপতিবর্গ দেবপাল, মহীপাল, ভীমপাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন ইহার নিদর্শন আছে কিন্তু উহাতে কালীঘাটের দেবীর নামে কোন

* Sub-Division marked E. F. M. P. Q. in the Grand Division of Pargunnah Khaspur.

স্থাবর সম্পত্তি দানের কোন উল্লেখ নাই। শূর বংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয় রাজা এবং আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের জামাতা। কিন্তু আদিশূর বা তাঁহার বংশধরগণ যে কালীদেবীর নামে কোন স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমান নৃপতিবর্গ যদিও বঙ্গদেশে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল তত্রাচ পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামের হিন্দু ভূপতিগণ ১৩০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে ছিলেন। মুসলমান নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হন নাই।* কারণ লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ১৩৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং দেবতার নামে অনেক স্থাবর সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীঘাটের কালীদেবীর নামে কোন সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, এরূপ নিদর্শন কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দক্ষিণ বাঙ্গালার কায়স্থকুলতিলক রাজা কান্তরায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে যশোহরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে অনেক স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে দানের উল্লেখও কোথায় দৃষ্ট হয় না।

জমীর রাজস্ব সম্বন্ধে প্রজাদের সহিত রাজা যে বন্দোবস্ত করেন তাহাকে ওয়াশীলতুমার জমা কহে। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সাহার রাজত্বকালে যখন বঙ্গদেশে ঐ রাজস্ব সম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ হয়, তখন কালীঘাটের জন্য রাজস্ব স্বরূপ কোন অর্থ গৃহীত হয় নাই। ১৭৭২ খৃঃ মুরশীদ কুলিখাঁর সময়ে যখন দ্বিতীয় বার ঐরূপ তত্ত্বাবধারণ হয় তখনও কালীঘাটের কোন রাজস্ব গৃহীত হয় নাই। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দাওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পর কালীঘাট সাবর্ণ চৌধুরীদের জমীদারীভুক্তও ছিল না এবং ইংরাজ রাজের পঞ্চান্ন গ্রামের অন্তর্ভূতও ছিল না। অধিকন্তু কালীদেবীর সেবাএতগণ কালীঘাটের ভূমি সম্পত্তি স্বেচ্ছানুসারে কুলীন বংশীয় ব্রাহ্মণবর্গকে দান করিয়াছিলেন। তাহাতে সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় ভূম্যধিকারিগণ কোন প্রকার ওজর বা আপত্তি করেন নাই। ইহা হইতে বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে যে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় ভূম্যধিকারিগণ বড়িসা গ্রাম অধিকার করিবার পূর্ব্ব হইতেই কালীঘাটের

* See W.W. Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. V. page 119.

কালীদেবীর দেবোত্তর ভূমি সম্পত্তি দেবীর সেবাএতদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরাজরাজের প্রভাব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে সামরিক ও রাজ্য শাসনের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত হইল। কিন্তু রাজার রাজস্ব কর আদায় করিবার ভার পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ভূম্যধিকারিগণের হস্তেই রহিয়া গেল। তৎপরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজরাজ বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দাওয়ানী প্রাপ্ত হইবার কারণ ২৬,০০,০০০৲ টাকা প্রদান করতঃ রাজস্ব কর নিজ সরকারীতে তহসিল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দাওয়ানী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নবাবের আমলে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল তাহা রহিয়া গেল। দাওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের হিন্দু সিপাহীদিগকে কালী পূজার নিমিত্ত ১০৮৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে হুজুরীমল্ল নামক একজন সৈনিক ইংরাজ রাজের যথেষ্ট সহায়তা করে। তদানীন্তন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা ভার্সলেট (Verslet) সাহেব তাহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কালীদেবীর অধিকারভুক্ত ১২ বিঘা ভূমি দেবোত্তর জন্য তাহাকে দান করেন। হুজুরীমল্ল নিজের মনোমত জমী বাছিয়া লইয়া নিজ ব্যয়ে তদুপরি গঙ্গার ঘাট ও মহাদেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই বার বিঘা জমী ব্যতীত কালীঘাটের নিকট মুদিসান গরস্থিত অপর ১২ বিঘা জমী হালদারগণকে তিনি ব্রহ্মোত্তর করিয়া দেন। বর্ত্তমান কালীঘাট পুলিশ ও বাজার হুজুরীমল্লের জমীতে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে আলিপুরের কলেক্টার সাহেবের হস্তে ন্যস্ত আছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ শাসনকর্ত্তা ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস (Warren Hastings) এ দেশীয় জমীদারদিগের সহিত রাজস্ব কর সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করেন। টেলার (Taylor) ও রিচার্ড (Richard) সাহেবদ্বয় জমীর মাপ করিয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে কালীঘাট অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। উক্ত জমী দেবোত্তর সম্পত্তি। নিশ্চয়ই সেই কারণেই উহা রাজস্বদের জমীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস (Lord Cornwallis) যখন জমীদারদিগের সহিত ১০ বৎসরের জন্য রাজস্বদেয় জমীর কর নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করেন এবং পরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন উহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়, তখনও

কালীঘাট সে জমীর অন্তর্ভূত হয় নাই। সুতরাং উহা সন্তোষ রায়ের জমীদারীর মধ্যেও নাই এবং ইংলিস কলেক্টরেটের(English Collectorate)মধ্যেও নাই। কালীঘাট পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়া গেল, জমীদার বা ইংরাজ কলেক্টার তাহার কোন কর গ্রহণ করিল না। কালীঘাটের কর কোন কালেই আদায় তহসীল হয় নাই। এইরূপভাবেই উহা বহুকাল চলিয়া আসিল। অবশেষে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের ডেপুটী কলেক্টার (Deputy Collector) গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের আমলে মেজর আর, স্মিথ (Major R. Smith)২৪পরগণার জরীপ করিয়া এক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। সেই মানচিত্রে ইংরেজ রাজের পঞ্চায় গ্রামের মধ্যে কালীঘাটকে ভুক্ত করা হয়,এবং উহা রাজস্বদেয় জমী বলিয়া নোটীস (notice) জারি করা হয়। গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে আপনার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া শেষ মীমাংসার জন্য গভর্ণমেণ্টে পেস করেন।* কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের গোলমালে সে সময়ে উহার মীমাংসা হয় নাই। বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইবার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঐ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া যায় এবং কালীঘাট লাখরাজ অর্থাৎ রাজস্বদেয় নয় বলিয়া মঞ্জুর হয়।†

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

ডোরা।

পিতৃব্য অজ্ঞাতে কিন্তু, ডোরা দয়াবতী
পাঠাইত যাহা ছিল তাহার সঙ্গতি।
তার পর, শস্য যত সংগ্রহের কালে,
মৃত্যু তা'রে তুলে নিল আপনার কোলে।
শুনি মৃত্যু, ধীরে বালা, অতি ধীরে চলে,
অনাথা বিধবা যেথা ল'য়ে শিশু কোলে
ভেসে যায় আঁখিজলে—ভাবে মনে আর
ডোরার কারণ এই দুর্ভাগ্য আমার।
ডোরা কিন্তু কহে তারে, পিতৃব্যের মতে
বাধ্য হ'য়ে এতদিন ছিনু কোন মতে।
কিন্তু, এবে দেখিতেছি, আমারি কারণ
যত কিছু অমঙ্গল ঘটিল এমন!
আজি কিন্তু তা'রি তরে গিয়েছে যে চলে—
সাধের প্রিয়ারে—আর ক্ষুদ্র শিশু ফেলে—
আসিয়াছি তোর পাশে,—ভাবিতেছি মনে
অর্পিব পিতৃব্য করে তাহারি সন্তানে।
পঞ্চম বরষ পরে প্রচুর ফসল
হেরিয়া এবে ত বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল;
তার মাঝে পায় যদি এ ক্ষুদ্র সন্তান
আশীষ্ করিয়া এরে করিবে গ্রহণ।

অনাথ শিশুরে ল'য়ে ধীরে ধীরে আসে,
অতি ভয়ে, ত্রাসে ডোরা পিতৃব্যের পাশে!
হেরি তা'রে কহে বৃদ্ধ,"কাল ছিলি কোথা?
কা'র শিশু ল'য়ে তুই এলি আজ হেথা?"
রুদ্ধ কণ্ঠে কহে ডোরা, অধোমুখে চেয়ে,
"এনেছি অভাগা সেই উলির তনয়ে।"
গর্জ্জিল শুনিয়া বৃদ্ধ, অতি রোষ ভরে,
"করিনি নিষেধ? করিনি' নিষেধ তোরে?"
"দোষী যদি হ'য়ে থাকি," কহে বালা ধীরে,
"যেবা ইচ্ছা দাও শাস্তি আমারি উপরে!
কিন্তু এ মিনতি মম—লহ পুত্র তার
গিয়েছে ছাড়িয়া যেই সাধের সংসার!
রোষভরে কহে বৃদ্ধ, চাহি' ডোরা পানে,
"এসব চাতুরী তোর বুঝেছি এক্ষণে।
কিন্তু একি স্পর্দ্ধা তোর! কর্ত্তব্য আমার
শিখিতে হইবে আজ তোর কাছে হায়!

* See Report No. 4 D 15-1-55-of the Deputy collector.
† See Commissioner's *Sheha* no. 8 of 1861 62 and No. 36 *Roobkase* of 1860.

বেদবাক্য সম আজ্ঞা জানিস্ আমার,
তথাপি অবজ্ঞা তুই করিলি তাহার !
ভাল ভাল, তাই ভাল—লইব ইহারে ;
কিন্তু তুই দূর হ'য়ে যা'রে একেবারে !"
টানিয়া লইল শিশু বৃদ্ধ তা'র:পরে,—
প্রণিপাত করি' বৃদ্ধে ডোরা গেল ফিরে।

গেল অস্তে দিনমণি দিবসের পরে,
একাকিনী চলে ডোরা বিজন প্রান্তরে।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসি' দিলা দরশন
তিমির বসনে ঢাকি' প্রান্তর, কানন।
নীরবিল চারিদিক, আঁধার গগন,—
ভগ্ন প্রাণে চলে ডোরা যেথা মরিশন্।
চারিদিক স্তরে স্তরে অন্ধকারে ভরা,
নীরব নিষ্কম্প স্থির যেন এই ধরা !
ভেদ করি নীরবতা ঘন অন্ধকার,
শিশুর রোদন-রোল শ্রবণে তাহার
পশিতে লাগিল যেন যায় যত দূরে,—
ব্যথিত অন্তরে ডোরা চাহে ফিরে ফিরে !

শত শত ধন্যবাদ হেরিয়া ডোরার
অপার আনন্দে মেরি দিলা বিধাতায় !
কহিতে লাগিলা ডোরা, "লয়েছে সন্তানে।
কিন্তু তাই আর মোরা থাকি দুইজনে।
বিদায় করেছে মোরে পিতৃব্য আমার ;
কয়েছে জনমে কিন্তু আসিওনা আর !"
শুনিয়া কহিলা মেরি, "কভু সে হ'বে না !
আমার কারণ কেন সহিবে যাতনা ?
বিশেষতঃ, তারে কভু দিব না তনয়,
যার শিক্ষা পেয়ে শিশু হইবে নির্দ্দয়।
চল্ ভাই, লয়ে আসি শিশুরে আমার,
মিনতি করিয়া আমি, কহিব আবার
লইতে তোমারে ফিরে, নাহি ল'ন যদি—
একত্র রহিব বোন্, দোঁহে নিরবধি।
পালিব দু'জনে মিলে যাবৎ বালক,—
মোদের পালিবে পরে হইলে যুবক।"

কহি এত দোঁহে দোঁহা সস্নেহ চুম্বনে
বাঁধিলা উভয়ে স্বীয় বাহুর বন্ধনে।
চলিলা তাহার পর দুই জনে মিলে,
একাকী আলেন্ যেথা ক্ষুদ্র শিশু কোলে—
চুমিছে, খেলিছে, কভু হেরিয়া সে মুখে,
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে হাসিতেছে সুখে !
ক্ষুদ্র শিশু কভু হেসে চায় বৃদ্ধ পানে,
কভু বৃদ্ধ কণ্ঠহার ধরিয়া বা টানে।
অন্তরাল হ'তে দেখি, ডোরা, মেরি পরে—
প্রবেশিলা দুইজনে গৃহের ভিতরে।
হেরিয়া জননী, শিশু করিল রোদন,
নামাইয়া দিল তা'রে আলেন তখন।
ক্ষণ পরে ধীরে মেরি কহিলা তাহারে,—
"শিশু কিম্বা উলিয়েম্ কিম্বা মম তরে
আসি নাই ভিক্ষা হেতু পিতঃ তব দ্বারে !
মিনতি আমার শুধু—লও ডোরা ফিরে !
আর এক কথা পিতঃ জানাব তোমারে,—
মৃত্যু যবে ধীরে তার আসিল শিয়রে—
কহিল আবেগে হায় ! পিতৃবাক্য মম
কেন নাহি পালিলাম বেদবাক্য সম !"
শুনি ইহা নতমুখে কহিল আলেন্,
"ঈশ্বর মঙ্গল তার করুন এখন !"
"কিন্তু পিতঃ !"কহে মেরি,"দাও শিশু মোর,
রহিলে তোমার ঠাঁই হইবে কঠোর।
লহ ফিরে স্নেহময়ী দুহিতা তোমার,
শিশু লয়ে যাই ফিরে আমিও আবার !"

নীরব, নিস্পন্দ, স্থির, বসি' নত শিরে
আছিল আলেন্ বৃদ্ধ ক্ষণেকের তরে।
অকস্মাৎ কাঁদি' বৃদ্ধ গুমরি' গুমরি'
কহিতে লাগিল, "হায়, আমি পুত্র-অরি !
হীন পুত্রঘাতী আমি, বধেছি তনয়ে !
কিন্তু, তারে বাসিতাম ভাল সব চেয়ে !
প্রেমময় হে ঈশ্বর ! ক্ষম মোর দোষ !
আয় বৎসে ডোরা মেরি ত্যজি' যত রোষ !"
উভয়ে তাহার এবে চুম্বিল চরণ,
বৃদ্ধ কিন্তু, পৌত্র বুকে করিল রোদন।
রুদ্ধ স্নেহ-পারাবার প্রস্রবণ প্রায়
উথলিল শত মুখে সে বৃদ্ধ হিয়ায়।
স্নেহের বাঁধনে বৃদ্ধ বাঁধিয়া সবারে,
নিরমিল সুখ-কুঞ্জ সে ক্ষুদ্র কুটীরে।
কালের অনন্ত স্রোতে মিশাইল পরে
দিন পরে কত দিন। মেরি কিন্তু ফিরে
তার পর অন্য জনে করিলা বরণ,—
অনূঢ়া রহিলা ডোরা যাবৎ জীবন !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

ভক্তি ও জ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়তঃ, এখন দেখা যাইতেছে গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজেরও সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায় (পিতা মাতার ন্যায়) রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও তেমনি ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিশালী, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকে না, এজন্য রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ-পুরুষগণও যথাযোগ্য ভক্তির পাত্র;—কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং ধর্ম্মত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা ভক্তির পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য। আমার এই সমস্ত কথায় আপনারা কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে যাঁহার দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত হই, তাঁহাকে আমি সেইরূপ পরিমাণে ভক্তি করিব। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও আমাদের কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এখানে একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে—মনে কর, তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। এইরূপ সমাজের শিক্ষক, জগতের শিক্ষকদিগের প্রতি ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা হয় না—শিক্ষাই উন্নতির মূল, অতএব ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই।

যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী তিনিও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক নীচ জাতীয় মূর্খ হইলেও ভক্তির পাত্র।

আর কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির—নিতান্ত পক্ষে সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পারত ভক্তিও করিবে।

সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকার করিবে। উন্নতির জন্যই ভক্তির এত অধিক প্রয়োজন, এই জন্য ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলা যায়।

আমাদের দেশের ভক্তেরা ভক্তির নয়টি লক্ষণ স্থির করিয়াছেন :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা।

অর্থাৎ ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও ভগবানের পদ সেবা করা, অর্চ্চনা করা, বন্দনা করা, ভগবানে নিজের দাস্যভাব হওয়া, সখা ভাবে ভগবানকে দেখা—এবং ভগবানে আত্মোৎসর্গ এই নয়টি ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি গুলির মধ্যে ভক্তি, প্রীতি ও দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায়। প্রীতি ভগবানে ন্যস্ত হইলে তাহা ভক্তি হয় এবং আর্ত্তে ন্যস্ত হইলে তাহা দয়া নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রীতি যে কেবল ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই ভক্তি হইবে এমন নহে—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রীতিও ন্যস্ত হইয়া ভক্তি আনয়ন করে। ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়া অনেক সময়ে কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। এই কারণে আমাদের বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবেরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভগবানের প্রতি এই পাঁচ প্রকার অনুরাগ—স্বীকার করেন। এই পাঁচটি ভক্তি, প্রীতি ও দয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে ইহার কোনটি মিশ্র, কোনটি অমিশ্র। যেমন শান্ত,—সাধারণ ভক্তের যে ভাব, ইহা একমাত্র ভক্তি সুতরাং অমিশ্র।

দাস্য,—হনুমান প্রভৃতি যে ভাবে ভগবানের সেবা করিয়াছেন। ইহা ভক্তি ও দয়ার সংমিশ্রণ।

সখ্য,—শ্রীদাম প্রভৃতি রাখাল বালকের যে ভাব। ইহা প্রীতি—সুতরাং অমিশ্র।

বাৎসল্য,—নন্দ যশোদা যে ভাবে ভজনা করিতেন। ইহা প্রীতি ও দয়ার মিশ্র।

মধুর,—রাধা যে ভাবে ভজনা করিতেন। ইহা ভক্তি, প্রীতি ও দয়ার সংমিশ্রণ।

আপনারা মনে করিতে পারেন, বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের যে ভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার দয়া কোথায়? কিন্তু স্নেহ আছে নিশ্চয়। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ উৎপন্ন হয়;—সুতরাং মধুর ভাবের মধ্যে দয়াও আছে। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, ভক্তি প্রীতি দয়া মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তি গুলির মধ্যে প্রধান;—তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্ব প্রধান। এই ভক্তি ভগবানে ন্যস্ত হইলেই অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হন এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইহাতে সম্যকরূপে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চাহেন—তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হউক। কিন্তু ইহা হওয়া দু এক দিনের কার্য্য নহে, ক্রমে এক একটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভগবানে অর্পণ করা শিখিতে হয়, সম্পূর্ণ অর্পণ হইলে তখন প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায়।

সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মালোচনাদিতে জ্ঞান ভক্তি এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী ধর্ম্মবীর-গণ অভিমান ভরে ভাবিয়া থাকেন,—ভক্তি জিনিসটা আর কিছুই নহে তাহার ষোল আনা কেবল ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। উহার অনু-শীলনে মন দুর্ব্বল হইয়া সাধককে নিতান্ত কাপুরুষ ও হীন বীর্য্য করিয়া ফেলে, উহাতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অপর পক্ষে ভক্তি পথের পথিকগণ জ্ঞানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করতঃ বলিয়া থাকেন, জ্ঞান ভক্তি পথের বিরোধী, নিতান্ত নীরস ও দুর্ব্বোধ্য পদার্থ, জ্ঞানের প্রচণ্ড ও খরতর উত্তাপে ভক্তি রস বিশুষ্ক হইয়া যায়, পরিণামে মায়াবাদ ও নাস্তিক-তায় বিজড়িত হইয়া সাধক নিস্তারের পথ হারাইয়া ফেলে;—এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল ও অহঃরহ জাগরূক থাকাতে তাঁহারা জ্ঞানের

নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন, তাহার নিকটে যাইতেই আশঙ্কায় আকুল হন। এই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সংস্কার দুইটি কি প্রকৃত? প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তিতে কি বাস্তবিক কোন প্রভেদ আছে?—একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলে, সমস্ত জ্ঞানাপেক্ষা এই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, হে পার্থ,—দ্রব্যময় অর্থাৎ দৈবাদি যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম্মই কালের সহিত জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে।

পরমেশ্বরে যে একান্ত অনুরাগ তাহাই ভক্তি। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদি অভিভূত জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক ভোগ সাধনভূত অর্থাভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী, এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যোগযুক্ত আত্মজ্ঞানী ভক্তই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ভক্ত আমার স্বরূপ, তিনি আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই স্থানে "জ্ঞান ভক্ত" এই বাক্যটির দ্বারা উল্লিখিত প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তরটি পাওয়া গেল অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির একত্রে সমাবেশ না হইলে প্রকৃত সাধন পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে অধিকারী তিন প্রকার, তন্মধ্যে যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ব বিচার, সাধন বিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা পরমাত্মারূপী ভগবান বাসুদেবের প্রতি যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার পাদপদ্মে যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উপজাত হইয়াছে, তিনিই উত্তম ভক্ত। যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যমাধিকারী, আর যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান, অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তির দ্বারা যাহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাহাকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী জানিতে হইবে।

তবেই দেখা গেল, জ্ঞান ও ভক্তি এক অন্যে, উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ। যাহারা একদেশদর্শী, যাহারা শাস্ত্রের সার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহিরের খোসা লইয়া বাক্ বিতণ্ডা করেন তাঁহারাই এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অবলোকন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জ্ঞানরূপ কষ্টি পাথরে ভক্তি

সোনাকে ঘসিলেই তাহার ময়লা ও আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত হইয়া গিয়া তাহা শুদ্ধ ও স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ প্রতিভাত হয়, নতুবা তাহা ভাবুকতার আবিল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে,—প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না। ভক্তি কেবল ভাবুকতায়ই পর্য্যবসিত হয়। আবার জ্ঞানকে ভক্তি রসামৃতে সিক্ত না করিলে তাহা বিশুষ্ক মর্কট বৈরাগ্যে উপনীত হইয়া পরিণামে মায়াবাদ ও জড়বাদে পরিণত হয়। তাহাতে তদনুগামিগণ জ্ঞান দধির সারভার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট নবনীত পরিত্যাগ করিয়া কেবল কূট কুতর্ক-রূপ অসার তক্রই পান করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও ভক্তিতে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য শাস্ত্রে যে বিধি ব্যবস্থা আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া সাধু মহাজনগণ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন উহাই প্রকৃত ও প্রশস্ত পথ।

উপরে যে যে বিষয় বলা গেল তাহাতে বুঝিলাম কি—যে জ্ঞানী সেই ভক্ত এবং যে ভক্ত সেই জ্ঞানী। জ্ঞান ও ভক্তি একই, উহার কোন প্রভেদ নাই এবং জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ভক্তই ভগবানকে জানে ও পূজা করে এবং ভগবানও জ্ঞানী ভক্তের পূজক। জ্ঞানী ভক্ত যে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে একটি পৌরাণিক গল্প বলিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

এক সময়ে দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে তৎসমীপে উপস্থিত হন। দেবর্ষি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ভগবান কয়েকটি মূর্ত্তি পূজায় নিযুক্ত আছেন,—সে মূর্ত্তি গুলি বহু মূল্য রেশমী বস্ত্রের দ্বারা আবৃত ছিল। নিকটে বহু মূল্য আধারে সুগন্ধি পুষ্প রাশি স্তূপীকৃত ছিল, ভগবান উঁহা হইতে পুষ্প লইয়া মূর্ত্তি গুলিকে পূজা করিতে করিতে আনন্দে আপ্লুত হইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ত্রিজগতে কে এমন আছেন, যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিতে পারেন? তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না;—যিনি সকলের মূল, এবং সকল কারণের কারণ, তাঁহার অপেক্ষা কে আবার বড় এবং কে তাঁহার ভক্তি ও পূজার পাত্র হইতে পারেন?—যদিও দেবর্ষি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি সে সময়ে তিনি এই পরম প্রেমময়ের প্রেম ব্যাপার সন্দর্শনে নিজেই প্রেমাপ্লুত হইতে ছিলেন। ঐ আবরিত মূর্ত্তি গুলি হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল,

সেরূপ জ্যোতি দেবর্ষি কখন দেখেন নাই, এবং সে বিষয় কখন শুনেনও নাই। পরে ইহার রহস্য ভেদে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অতীব প্রেম ও ভক্তি সহকারে গললগ্নীকৃতবাসে ও করযোড়ে ভগবৎ সমীপে নিবেদন করিলেন প্রভো, যিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম সনাতন, সকল কারণের কারণ, তিনি আবার কিরূপে অন্যকে পূজা করিতে পারেন তাহা বুঝিতে আমি সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ। প্রভো, তবে কি আপনার অপেক্ষা কেহ বড় আছেন? দয়া করিয়া এ দাসের এই সংশয় বিদূরিত করুন। কিন্তু চতুর চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছলে ও কৌশলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দান হইতে এড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভক্তপ্রধান নারদও ছাড়িবার পাত্র নহেন, বারম্বার কাতরে ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; অবশেষে ভগবান উহা আর গোপন রাখিতে পারিলেন না। আবরণ উন্মোচন করিলেন। ভগবানের পূজার পাত্রনিচয় নারদের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। দেবর্ষি উহা দেখিয়া চমকিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

নারদ আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীরে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় প্রেমানন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবর্ষির এরূপ অবস্থা হইবার কারণ এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতেছিলেন তাহা আর অন্য কাহারও নহে—তাঁহারই জ্ঞানী ভক্তবৃন্দের এবং ঐ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নারদ তাঁহার নিজ মূর্ত্তিও সংস্থাপিত দেখিলেন। গীতায় ভগবান যাহা বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তান্ তথৈব ভজাম্যহম্"

তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা অনন্য ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পূজা করেন তিনিও তাঁহাদিগকে প্রীতি পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতেছিলেন উহার মধ্যে প্রধানতঃ ব্যাস, অম্বরিষ, পরাশর, নারদ ও প্রহ্লাদের মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। যাঁহারা জ্ঞানী ভক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভগবানের যে কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা স্বয়ং ভগবানই কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তত্ত্বনিধি।

কালীঘাটের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কালীকুণ্ড হ্রদ কালীপুরীর ঠিক পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহাকে দেখিলে একটী সামান্য পুষ্করিণী বলিয়া অনুমিতি হয়। ইহার বর্ত্তমান আয়তন ১০ কাঠার অধিক নয়। ইহার পূর্ব্ব আয়তন যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কালীর মুখ প্রভৃতি এই হ্রদের কূলেই প্রথমে দৃষ্ট হয়। অনেক যাত্রী আদিগঙ্গায় স্নান না করিয়া এই পুষ্করিণীতে স্নান করে। পূর্ব্বে ইহা অতল-স্পর্শ দহ ছিল, কিন্তু ভাগীরথীর পূর্ব্বতট ক্রমে ক্রমে ভরাট হইয়া উচ্চ হওয়াতে ইহা এক্ষণে হ্রদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

গঙ্গার গর্ভ অপেক্ষা এই হ্রদ গভীর এবং ইহার প্রবল প্রবাহ বলিয়া ইহা ভরাট হয় নাই। সুতরাং দহের পশ্চিমভাগে অবস্থিত নদীর গর্ভদেশ উচ্চ বলিয়া নদীর প্রবাহ বহুদূরে গমন করত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ কালীকুণ্ড অপেক্ষা বড় হইলেও ইহা ঐ হ্রদের প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে। কালীঘাটের সম্মুখস্থ গঙ্গানদীর ৫০০ বা ৬০০ হস্ত দূরে কূপ খনন করিতে গিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে যে, সমুদ্রের বালুকাময় তলের ন্যায় ঐ স্থানের জমী বালুকাস্তরে সঞ্জীভূত। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী জমী পূর্ব্বতন কালে গঙ্গাগর্ভে নিহিত ছিল, পরে কালসহকারে ক্রমে ক্রমে ভরাট হইয়া উহা জমীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সকল জমীতে এক্ষণে মনুষ্যের আবাসস্থল হইয়াছে।

ভাগীরথী কালীর মন্দিরের ২০০ হস্ত দূরে প্রবাহিত। দেবীর সেবাএত হালদারবংশীয়গণ তথাকার আদিম নিবাসী হইলেও মন্দিরের পশ্চিমাংশে কথনই বসতি করেন নাই। মন্দিরের পূর্ব্বে ও দক্ষিণাংশে তাহাদের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, হালদারগণ যথন এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তথন ভাগীরথী মন্দিরের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ছিল। কালীকুণ্ডের পশ্চিমাংশে একটীও পুরাতন বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। কালীঘাট সমুদ্রের সমতল ভূমি অপেক্ষা ১১ হাত উচ্চ। তত্রাচ বর্ষাকালে গঙ্গার জলে অনেক স্থান প্লাবিত হইয়া থাকে। যথন এই হ্রদের এ প্রকার অবস্থা তথন

উহার জল অবশ্যই বিস্বাদ। যদিও ইহার জল সমুদ্র জলের ন্যায় লবণাক্ত নয় তত্রাচ উহা অপরিষ্কার, কৃষ্ণবর্ণ ও স্বাদহীন। ইহার জল নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য দুইবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রথম বার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কালীদেবীর সেবাএতগণ সাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই টাকায় উহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আলিপুর মিউনিসিপালিটী দ্বিতীয় বার চেষ্টা করেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক উহার জল পরিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু জল নিষ্কাশন-যন্ত্রের (pump) দ্বারা কোন ক্রমেই সমস্ত জল উঠাইতে সমর্থ হয় নাই। স্মরণাতীতকাল হইতে দেবীমূর্ত্তি এই হ্রদের কূলে বর্ত্তমান ছিল।

কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে দেবীর একটী ছোট মন্দির ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, এই মন্দির যশোহরের বসন্ত রায় প্রস্তুত করাইয়া দেন, কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন নাই। ঐ সময়ের পূর্ব্বে দেবী একটী পর্ণকুটীরে স্থাপিত ছিলেন।

এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত যে, কেশবরায় দেবীর জন্য একটী কুটীর প্রস্তুত করাইয়া দেন। কিন্তু ঐ কুটীরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া তদীয় পুত্র সন্তোষ রায় একটী ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র রাজীবলোচন রায় ঐ মন্দিরের জীর্ণাবস্থা দেখিয়া তদানীন্তন কালেক্টর ইলিয়ট সাহেবের অনুমত্যনুসারে বড় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ সন্তোষ রায় নির্ম্মিত ছোট মন্দিরের অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িল যে, তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রের আমলে নূতন মন্দির নির্ম্মাণের আবশ্যক হইল। যাহা হউক, সেই ছোট মন্দির যাহার স্থানে বড় মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বহুকাল পূর্ব্বে সন্তোষ রায় বা তাঁহার পিতা কেশব রায় প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন।

প্রখ্যাত হুজুরী-মল্ল আপনার কীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্ন দেদীপ্যমান করিবার জন্য কালীঘাটস্থিত ভূমি ব্যতীত অপর কোন পুরস্কার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার ঘাট ও চাঁদনী এবং কতিপয় শিবমন্দির প্রস্তুত করেন এবং তাহা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়াছিলেন। যদি সে সময়ে দেবীর মন্দির না থাকিত, তাহা হইলে তিনি অগ্রে দেবীর মন্দির প্রস্তুত না

করাইয়া ঘাট, চাঁদনী ও শিবমন্দির কখনই প্রস্তুত করাইতেন না। ইহাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেবীর মন্দির বিদ্যমান ছিল। পরে সন্তোষ রায় একটী বড় মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবার মনন করেন। অধিকন্তু ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের জনৈক কানুনগো দেবী দর্শনার্থ কালীঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্যাম রায় দেবীর মন্দিরে অবস্থিত। তদ্দর্শনে তিনি শ্যাম-রায়ের জন্য আপন ব্যয়ে একটী কুটীর প্রস্তুত করাইয়া দেন। তৎকালে কেশব রায় বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং কেশব রায়ের বহুকাল পূর্ব্বে দেবী মন্দিরে বিরাজিত ছিলেন বুঝা যাইতেছে।

কালীর পুরী উত্তর দক্ষিণে লম্বা। সমগ্র কালীপুরীর জমীর আয়তন ১ বিঘা ১১ কাঠা ৩ ছটাক। তন্মধ্যে মন্দিরটী ৮ কাঠা। তোরণ দ্বার পশ্চিম দিকে। কালীপুরীর জমী সমুদ্রের সমতল জমী হইতে ১১ হাত উচ্চ। মন্দিরের বহির্দ্দেশের উচ্চতা ৬০ হস্ত। উহার ভিতরের উচ্চতা ৫০ হস্ত। এই মন্দির ৭ বা ৮ বৎসরে নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণ করিবার ব্যয় ৩০,০০০৲ টাকা। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়।

সন্তোষ রায় কলিকাতা ও তাহার দক্ষিণ উপনগরের হিন্দু সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ মহাজন কালীপ্রসাদ দত্ত কলিকাতার দক্ষিণ উপনগর সমূহের ব্রাহ্মণগণকে কোন সামাজিক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন। সন্তোষ রায় বড়িসা, সরসুনা, কালীঘাট প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কালীপ্রসাদ দত্তের বাটীতে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। কালীপ্রসাদ দত্ত ব্রাহ্মণদের সম্মান রক্ষার্থ ২৫০০০৲ টাকা বিদায় স্বরূপ সন্তোষ রায়ের নিকট প্রেরণ করেন। সাবর্ণ চৌধুরীরা শাক্ত। সে সময়ে কালীঘাটের যাত্রীর সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যে মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহাও ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের সম্মতি লইয়া কালীপ্রসাদ দত্ত প্রদত্ত টাকায় কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নূতন মন্দির প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রামনাথ রায় ও তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র রাজীবলোচন রায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য শেষ করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কালীর মুখ যাহা কালীকুণ্ড হ্রদে প্রাপ্ত হওয়া

যায়, তাহা পুরাণের মতে ব্রহ্মার দ্বারা নির্ম্মিত এবং উহা স্মরণাতীত কাল হইতে হ্রদের পশ্চিমাংশে নিহিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে সেই মুখটী সেই ভাবেই আছে তাহা নহে, সে মূর্ত্তি এক্ষণে বহু মূল্য অলঙ্কারে ভূষিত। সেই সকল অলঙ্কার ধনবান হিন্দু ভক্তগণ দেবীকে দান করিয়াছেন। এই অলঙ্কার সম্বন্ধে এক্ষণে এই প্রথা প্রচলিত, যে যদি কেহ কোন অলঙ্কার দেবীকে দান করেন তাহা হইলে পুরাতন গুলি খুলিয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নূতন গুলি দ্বারা দেবীকে সাজান হয়। সর্ব্ব প্রথমে খিদিরপুরের সন্নিকট ভূকৈলাশ নিবাসী দাওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল দেবীর জন্য চারিটী রৌপ্যময় হস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এক্ষণে যে সুবর্ণময় চারিটী হস্ত দেখিতে পাওয়া যায় উহা কলিকাতা নিবাসী সুবর্ণবণিক জাতীয় ধনকুবের কালীচরণ মল্লীক প্রদান করেন। বেলিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী রাম নারায়ণ সরকার সুবর্ণ মুকুট প্রদান করেন। দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশোদ্ভূত পাইকপাড়ার মহারাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ সুবর্ণ জিহ্বা এবং নেপালের সার জঙ্গ, বাহাদুর রৌপ্য নির্ম্মিত ছত্র প্রদান করেন। সুবর্ণময় ভ্রান্ত এবং অন্যান্য অলঙ্কার সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে প্রদান করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি অলঙ্কার চুরি যায়, কিন্তু ধনকুবের ভক্তগণ শীঘ্রই তাহা পূরণ করিয়া দেন।

মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর উপর্য্যুপরি সজ্জীভূত করিয়া তাহার উপরিভাগে ব্রহ্মা নির্ম্মিত মুখটী সংস্থাপিত করা হইয়াছে এবং চারিটী হস্ত শরীরের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সতীর চরণাঙ্গুলী প্রস্তর আবৃত করিবার যে বস্ত্র তন্মধ্যে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। যে স্থানে দেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে তাহার নিম্নদেশে একটী কূপ আছে। এই কূপের সহিত কালীকুণ্ড হ্রদের যোগ আছে। দেবীর চরণামৃত সেই কূপের অভ্যন্তর দিয়া পরিচালিত হইয়া কালীকুণ্ড হ্রদে পতিত হয়।

যখন কালী দেবীর পূজার ভার তান্ত্রিক ও কাপালিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল তখন রাজসিক ও তামসিক নিয়মানুসারে তাঁহার পূজা সম্পাদিত হইত। তখন ছাগাদি জন্তু ব্যতীত দেবীর সম্মুখে নরবলি পর্য্যন্ত হইত। এক্ষণে সে নিয়ম রহিত হইয়াছে। তাহার কারণ, ভবানী দাস নামধেয় বর্ত্তমান হালদারগণের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনিই সেই নিয়ম রহিত করিয়াছিলেন। কেবল মহা নবমীর দিনে একটী মাত্র ছাগ ব্যতীত

আর কোন বলি দিতেন না। অদ্যাপি সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আর যাত্রিগণ দেবীর উদ্দেশে প্রত্যহ যে ছাগ বলি দিয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রথমটী মাত্র দেবীকে উৎসর্গ করা হয়।

উপরোক্ত ভবানী দাসের পৌত্র লোকান্তরিত হইবার পর তাহার বংশে অপর কেহ ছিল না। সুতরাং সেই অবধি দেবীর দৈনিক পূজার জন্য অপর পূজক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে দেবীর অধিকারীগণ তাঁহার দৈনিক পূজা নির্ব্বাহের ব্যয় প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে আপনারা বহন করেন। দেবীর পূজার জন্য যে রূপ পুরোহিত বা পূজক নিযুক্ত আছে, সেইরূপ তাঁহার প্রসাধনের জন্য মিশ্র নামধের অপর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে।

দৈনিক পূজার পর প্রতিদিন অপরাহ্নে দেবীকে মাংস নিবেদন করা হয়। তৎপরে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। আরতি ও শীতলের জন্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়।

কালীঘাটের চতুঃসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূমির মধ্যে দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা একেবারে নিষিদ্ধ।

কালীঘাটে মহাষ্টমীর দিন অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয় এবং পৌষ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে তথায় অনেক যাত্রী যায়।

কালীপুরীর মন্দিরের পশ্চিমাংশে শ্যাম রায় নামক এক বিগ্রহের গৃহ ও তাহার দোলমঞ্চ। দেবীর সেবাএতদের পূর্ব্ব পুরুষ ভবানীদাস শ্যামরায়কে আনিয়া কালীঘাটে স্থাপন করেন। সে সময়ে দেবী একটী ছোট মন্দিরে ছিলেন সুতরাং শ্যাম রায়ও সেই মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বাওয়ালীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীদের পূর্ব্ব পুরুষ উদয় নারায়ণ মণ্ডল, মুর্শিদাবাদের সেই কানুনগো নির্ম্মিত ছোট কুটীরটী সমূলে ভূমিসাৎ করিয়া শ্যাম রায়ের জন্য এই বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রস্তুত করাইয়া দেন। দোলযাত্রা শ্যাম রায়ের প্রধান উৎসব। প্রতি বৎসর রামনবমীর দিনে ঐ উৎসব মন্দির মধ্যেই সমাধা হইত। কিন্তু সাহানগর নিবাসী মদন কোলে১৮৫৮খৃষ্টাব্দে একটী দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়াতে এক্ষণে ঐ উৎসব দোলমঞ্চেই হইয়া থাকে।

শ্যাম রায়ের মন্দিরের পশ্চিমদিকে আর একটী বিগ্রহ অপর একটী মন্দিরে স্থাপিত আছে, উহাকে কেহ কেহ শ্যাম রায় বলে। কিন্তু ঐ বিগ্রহের যথার্থ নাম গোবিন্দ রায়। এই বিগ্রহটী সেটবসাকদের গোবিন্দপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ বিগ্রহের নাম অনুসারেই গোবিন্দপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজরাজ গোবিন্দপুর ক্রয় করিয়া তথাকার অধিবাসী-দিগকে স্থানান্তরিত করেন, তখন এই বিগ্রহটীকে কালীঘাটে আনা হয়।

কালীপুরীর মধ্যে অন্য অন্য বিগ্রহ ও দেবতা আছেন। ভিন্ন ভিন্ন লোক জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উঁহাদিগকে স্থাপন করেন। সে সকল বিগ্রহের বা শ্যাম রায় ও গোবিন্দ রায়ের আয়ের উপর হালদারদের কোন অধিকার বা সত্ব নাই।

নকুলেশ ভৈরব কালী মন্দিরের উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। কালীমূর্ত্তি আবিষ্কার হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত ইহার মন্দির ছিল না। তৃণাচ্ছাদিত কুটীরেই ইনি অবস্থান করিতেন। দেবীর বড় মন্দির ও শ্যাম রায়ের মন্দির প্রস্তুত হইবার পর নকুলেশের প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত হয়। সুদূর পঞ্জাব নিবাসী তারা সিংহ নামধেয় জনৈক প্রখ্যাত বণিক স্বদেশ হইতে প্রস্তর আনয়ন করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা বঙ্গদেশের সৌধ নির্ম্মাণ বিধি ও রুচি অনুসারে নির্ম্মিত হয় নাই। কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরের স্তম্ভের উপর ছাদটী সংরক্ষিত হইয়াছে। সমগ্র মন্দিরটী প্রস্তরেই গঠিত হইয়াছে। ইষ্টকের নাম গন্ধও নাই। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় ইতিহাস বড় কৌতুকাবহ। উপরোক্ত পঞ্জাবীয় বণিক তারা সিংহ কোন ব্যবসায়ে অপরিসীম লাভ করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে উক্ত লভ্যাংশের এক কপর্দ্দকও নিজে লইবেন না। ঐ টাকায় কাশীধামে যাত্রীদের অবস্থান উপযোগী একটী মঠ প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। তিনি মনে মনে এই সংকল্প করিয়া ঐ মঠ প্রস্তুত করিবার উপযোগী আবশ্যকীয় প্রস্তর সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা নৌকায় বোঝাই দিয়া কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীর নিকট নৌকা উপস্থিত হইলেও নাবিকেরা কোন প্রকারেই কাশীর ঘাটে উহা লাগাইতে সমর্থ হইল না। নৌকা গঙ্গার প্রবাহে পরিচালিত হইয়া অবশেষে কালীঘাটের নিকট আসিয়া থামিয়া গেল। তারা সিংহ কালীঘাটে আসিয়া নকুলেশের মন্দির নাই দেখিয়া তাহার জন্য তাঁহার আনীত প্রস্তর দ্বারা মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

নকুলেশের বৎসরে দুইটী পার্ব্বণ হয়। শিবরাত্রি এবং নীলাষষ্ঠী। এই পর্ব্ব উপলক্ষে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গঙ্গার ঘাটে যে মন্দিরটী কালীর মন্দিরের সম্মুখে স্থিত, সেইটীই কালীঘাটের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন শিব মন্দির।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

নহর খাঁ।

রাঠোরপতি যশোবন্তসিংহের প্রতি মোগলসম্রাট আউরঙ্গজেবের বৈরীভাব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সম্রাট সাহজাহানের জীবনের শেষ ভাগে কুমারবৃন্দ পিতৃ সিংহাসন লাভ করিবার উচ্চাশায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরের সহিত রণপ্রবৃত্ত হয়েন, তখন রাজপুত-গৌরব যশোবন্ত, সাহজাদা দারার পক্ষ সমর্থন করিয়া আউরঙ্গজেবের সহিত নর্ম্মদা তীরে ভীষণ সংগ্রামে আপন বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিধিলিপির আনুকুল্যে চতুর আউরঙ্গজেবই সফলকাম হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বীর রাঠোরকুলতিলকের নির্ভীকতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই কৌশলে তিনি যশোবন্তসিংহকে আপন ওমরাহ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাকে নানা বিশ্বস্ত উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং পুরাতন প্রতিশোধাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য অশেষ প্রকার গুপ্ত উপায়ে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প করিতেন।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিমান যশোবন্তও "শঠে শাঠ্য"আচরণ করিতে বিমুখ হইতেন না। এবং তাঁহার প্রভুভক্ত পরাক্রমশালী কার্য্যদক্ষ যোদ্ধাগণের সাহস ও বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রভূত বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। কুম্পাবৎদিগের নেতা নহর খাঁ যশোবন্তের ঐ শ্রেণীর একজন সেনানায়ক ছিলেন।

এই রাঠোর বংশাবতংশ প্রভুভক্ত বীরের অবশ্য প্রকৃত নাম নহর খাঁ ছিল না। ইহাঁর প্রকৃত নাম মুকুন্দ দাস। কেবল মুকুন্দ দাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সাবধানতায় বহুবার সম্রাটের প্রতিহিংসা বহ্নি আপন হৃদয় মধ্যেই লুকায়িত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। সুতরাং সুচতুর মোগল সম্রাট, মুকুন্দদাসের প্রাণ সংহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। মুকুন্দ দাসও রাঠোরদিগের প্রথানুসারে অপরের নিকট মস্তকাবনত করিতে শিখে নাই বা অযথা তোষামোদে আপনার ভূপতি ব্যতীত অপর কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে শিখে নাই। একদিন সম্রাট আপনার দূতমুখে শুনিলেন যে মুকুন্দদাস দুর্ব্বিনীত ভাবায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। বাদশাহ যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন। তখনই আজ্ঞা দিলেন নিরস্ত্র হইয়া মুকুন্দদাসকে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুলের পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

নির্ভীকচিত্তে হাস্তমুখে গর্ব্বিত রাঠোর শার্দ্দূলের পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইলেন। নরশোণিত পিপাসা চরিতার্থ করিবার মানসে হিংস্রক মুকুন্দদাসের সম্মুখীন হইল। নরশার্দ্দূল চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া ভীমনাদে কহিলেন—"মিঞার ব্যাঘ্র যশোবন্তের ব্যাঘ্রের বিক্রম প্রত্যক্ষ কর।" মুসলমানদিগকে হিন্দুগণ তখন মিঞা বলিত।

নরব্যাঘ্রের সেই রোষকষায়িত নেত্র দেখিয়া বন্য পশু হারি মানিল। সে জানিত মনুষ্য তাহার খাদ্য। মানুষের চক্ষে সে কখনও ওরূপ দৃষ্টি দেখে নাই। ভীত হইয়া শার্দ্দূল শনৈঃ শনৈঃ পিঞ্জরের অপর প্রান্তে গিয়া শায়িত হইল। যাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছিল তাহারা বিস্মিত নেত্রে রাঠোরের মুখপানে তাকাইল।

মুকুন্দ বলিলেন "দেখিলেন—জাঁহাপনা। রাঠোর হইয়া ভীত শক্রর সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব। আপনার ব্যাঘ্র ত' আমার সম্মুখীন হইতে পারিল না।"

শক্র দমনে অকৃতকার্য্য হইলেও জাঁহাপনার বীর হৃদয় প্রশংসায় ভরিয়া গেল। বীরের মর্য্যাদা বীরেরা বুঝিতে পারে। সম্রাট তাহাকে পারিতোষিক দানে তুষ্ট করিলেন।

তাহার পর আউরঙ্গজেব বলিলেন—মুকুন্দ তোমার ত' পুত্রাদি আছে? তাহা না হইলে তোমার এ বিক্রমের উত্তরাধীকারী হইবে কে?

মুকুন্দের প্রভু যশোবন্ত সে সময় কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, বলা বাহুল্য এ নিয়োগে রাঠোরগণ সন্তুষ্ট ছিল না। বীর মুকুন্দ অমনি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল—"সে কি জাঁহাপনা? আপনার আজ্ঞাতেই ত' আমরা স্ত্রী পরিজন ছাড়িয়া আটক পারে বাস করি। আমাদের পুত্রাদি হইবে কেমন করিয়া?"

সেই অবধি মুকুন্দদাসকে সকলে নহর খাঁ বা "শার্দ্দূল প্রভু" বলিয়া অভিহিত করিত।

বিক্রমশালী নহর খাঁর আদৌ বাক্‌সংযম ছিল না। একবার রূঢ় ভাষায় প্রত্যুত্তর দানে, তিনি সাহজাদার কোপভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"এই অশিষ্ট আচরণের জন্য তোমার এইরূপ শাস্তির বিধান করিলাম। দ্রুতগামী অশ্বের উপর হইতে ছুটিবার সময় ঐ লম্বমান বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া পড় আর তোমার পদ নিম্ন হইতে ঘোড়া ছুটিয়া যাক।"

[illegible] বাহুল্য, কার্য্যটি বড়ই দুরূহ, কিন্তু তাদৃশ শক্তির পরিচায়ক নহে।

নহর বলিলেন—সাহাজাদা কি আমায় বানর বিবেচনা করিলেন। এমন শাস্তি দিন যাহাতে আমার অসীম বিক্রমের পরিচয় দিতে পারি।

সম্রাটতনয় সে সময় রাঠোর সৈন্য লইয়া শিরোহাধিপতি দেবরাহ বংশসম্ভূত রাজা সুরতানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে সমাসীন ছিলেন। সম্মুখ সমরে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া সুরতান পাহাড়ের মধ্যে বাস করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। সাহজাদা বলিলেন —"আচ্ছা তোমার বিক্রম বুঝিব, তুমি শৈলাবাস হইতে সুরতানকে বন্দী করিয়া লইয়া আইস।" সাহসী নহর তাহাতেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

আপনার কতকগুলি বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া নানা গিরিপথ পরিভ্রমণ করিয়া গভীর নিশীথে শিরোহাধিপতির গুপ্ত আবাসস্থলের দ্বারে আসিয়া রাঠোর বীর উপনীত হইলেন। তথায় একটি মাত্র প্রহরী দ্বার রক্ষা করিতেছিল। চিৎকার করিবার পূর্ব্বেই রাঠোরের অসি হতভাগ্যের গ্রীবা চুম্বন করিল। নিদ্রিত রাজা নহরের নিকটে বন্দী হইলেন।

আপন পাগড়ীতে রাজার হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া নহর খাঁ তাঁহাকে রাঠোর অনুচরদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। বিস্মিত শিরোহী বীরগণ ব্যাপার কি জানিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রু হস্তে আপনাদিগের প্রভুকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার উদ্ধারের জন্য সজ্জা করিতে লাগিলেন। স্মিত মুখে মুকুন্দদাস তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন।

উচ্চকণ্ঠে রাঠোর বলিলেন—দেবরাহ্‌গণ নির্ব্বোধের মত আচরণ করিওনা, তোমাদিগের ভূপতি এক্ষণে আমার হস্তে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাঁহার প্রাণনাশ করিব। আমার প্রভুর নিকট ইঁহাকে লইয়া যাইতে দাও।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শিরোহীবাসিগণ পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। নর-শার্দ্দূল বলিলেন—তস্করের মত তোমাদের রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া না গিয়া তোমাদিগের সমক্ষে তাঁহাকে লইয়া চলিলাম। তাই তোমাদিগকে ডাকিয়া ছিলাম।

এই বলিয়া অমিতপরাক্রমশালী রাঠোর বীর একলম্ফে বন্দীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। স্তম্ভিত দেবরাহগণ তাহাকে ধরিবার প্রয়াস করিবার পূর্ব্বে নহর তাহাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিলেন।

যশোবন্তসিংহের সমক্ষে নীত হইলে যশোবন্ত সুরাতানকে সম্রাটের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন।

রাজা সুরতানের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

মহারাজা যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর যখন সম্রাট তাঁহার পুত্র অজিতের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তখন নহর খাঁ বীরত্বের চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করেন। ইতিবৃত্তকার টড্ বলেন রাঠোর মাত্রেই ঐরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিত। কেবল রাঠোর কেন, প্রায় প্রত্যেক রাজপুতই সে সময় বিক্রমশালী ও বীর ছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। যদি সমগ্র রাজপুতানা এক জাতীয় কেতনের নিম্নে সমবেত হইয়া হিন্দুজাতির মুক্তির প্রয়াস করিত তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সামান্য ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মান অপমান লইয়া হিন্দুগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করিত বলিয়া তাহাদের জাতীয় শত্রুর সিংহাসন ভারতের বক্ষে সুদৃঢ় ভাবে বসিয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

নাটকের নাটকত্ব।

প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে, অমুক নাটকের নাটকত্ব অধিক, অমুক নাটকের অল্প। কেহ কেহ স্বীয় মত সমর্থনার্থ উদাহরণ দিয়া থাকেন "প্রফুল্ল" নাটকে যখন পাষণ্ড রমেশ সুকুমার ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবকে অনাহারে তিল তিল করিয়া বিনাশ করিতেছিল, তখন সেই তৃষাতুর বালকের কাতর জল প্রার্থনা, যাহা সহস্র সহস্র দর্শকের নয়নে অবিরল জলধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়, সেরূপ নাটকত্বের চরমোৎকর্ষ আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। কেহ বলেন "রাজা ও রাণীতে" যখন সুমিত্রাদেবী কুমারসেনের ছিন্ন মস্তক হস্তে শিবিকাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বলিলেন—

"যার লাগি দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে
লহ মহারাজ! ধরণীর রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির"

তখন [illegible] দর্শকবৃন্দ মধ্যে কি উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়! সেরূপ নাটকত্বের [illegible] কেহ বলিয়া থাকেন যদি প্রকৃত নাটকত্বের কথা বল তবে

"নীলদর্পণ" নাটকের সেই দৃশ্যের কথা মনে কর, যখন কামাতুর রোগসাহেব অসহায়া কৃষক কন্যার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতেছিল সে দৃশ্য কি লোমহর্ষণকর! শুনা যায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া পাষণ্ডকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! আবার মধ্যে মধ্যে নাট্যশালার বিজ্ঞাপনীতেও বড় বড় অক্ষরে দেখা যায় "নাটকত্বের চরমোৎকর্ষ! দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন!" ইত্যাদি। এইরূপ নানা মুনির নানা মতের মধ্যে পতিত হইয়া নাটকের নাটকত্ব একটী অশরীরী ও অব্যক্ত পদার্থে জনসাধারণে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত বস্তুটী যে কি হইতে পারে বক্ষ্যমাণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে যৎসামান্য আলোচিত হইয়াছে।

রাজার যেরূপ রাজত্ব, মনুষ্যের যেরূপ মনুষ্যত্ব, প্রভুর যেরূপ প্রভুত্ব, ক্ষমতার যেরূপ প্রভাব, তদ্রূপ নামেই প্রতীয়মান হইতেছে নাটকত্বই নাটকের সর্ব্বস্ব। অতএব দেখিতে হইবে নাটকের সর্ব্বস্ব কি? কি উদ্দেশ্য ও কি কর্ত্তব্য সাধনার্থ নাটক রচিত হয়? নাট্যকার কবি যে আবহমান কাল প্রতিভার মন্দিরে অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন ইহার কারণ কি? কতকগুলি ললিত পদবিন্যাস, কতকগুলি করুণ রুদ্র প্রভৃতি বিবিধ রসের উচ্ছ্বাস প্রকটিত করিয়াই কি তাঁহারা এই উচ্চাসনের অধিকারী হইতে প্রত্যাশা করেন? ওই কার্য্য সাধন করিয়াই কি তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্যের অবসান হয়? যদি মনোমধ্যে করুণ প্রভৃতি রসের উদ্রেক করাই নাটকের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহার জন্য মানবের নাটকের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি? শ্মশানভূমে নিরাশ্রয়া বিধবার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, অনাহারীর আহার বিহনে অরুন্তুদ যন্ত্রণা, আশ্রয়হীনের রৌদ্র ও বারির অবারিত নির্য্যাতনে কাতরতা, এ সকল দৃশ্যে ত অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। কেবল এই উদ্দেশ্যের ভার স্কন্ধে ন্যস্ত থাকিলে নাটক এত উচ্চাসন প্রাপ্ত হইত না। তাহার মুখ্য ও মহান্ উদ্দেশ্য মঙ্গলোদ্দেশে লোকশিক্ষা।

বিধাতার অনন্ত সৃজনে অনন্ত কোটী মানব আছে। অনন্ত কোটী মানবের অনন্ত প্রকারের মানসিক গতি আছে। তাহাতে কত আকারের, কত প্রকারের, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, গোচর ও অগোচর, অনুমেয় ও অননুমেয়, সৎ ও অসৎ বৃত্তি নিচয়ের বীজ বর্ত্তমান। বীজে অঙ্কুর উদ্ভূত হইতেছে সৎক্ষেত্রের উর্ব্বরতায়, সুশিক্ষার অনুকূল বায়ুভরে, অসৎ বীজের অঙ্কুর নির্ম্মূল হইয়া সদঙ্কুর মুঞ্জরিত হইতেছে। আবার কোথাও ক্ষেত্রের কাঠিন্য দোষে কুশিক্ষার

দুষ্টের প্রবলে সৎ বিনষ্ট হইয়া অসত্যের অঙ্কুর কণ্টকিত হইতেছে। বিকাশের গুণে কত মঙ্গল সাধিত হয়, দোষে কত সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। এই সমাজের অহিত নিবারণ ও হিতসাধনের গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া নাটক কঠিন ব্রতে ব্রতী। তাহার এই ব্রত উদ্‌যাপনের উপায়—নানাছলে লোক-শিক্ষা প্রদান।

লোকশিক্ষা কি প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে? মানবের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা এবং তজ্জনিত ভ্রম প্রদর্শনই লোকশিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট উপায়। ভ্রম ও দুর্ব্বলতাজনিত যে অনর্থ ঘটিতেছে তাহা যদি মানবকে স্পষ্ট প্রতীয়মান করান যায় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনাকে সংশোধন করিতে যত্নবান হয়। বিধাতা মানবকে এরূপভাবে সৃজন করিয়াছেন যে, যখনি সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে ইহা ভ্রম ও অসত্য,সেই মুহূর্ত্ত হইতে ক্রমশঃ তাহার মন তাহা হইতে দূরে যাইতে থাকে। একটা দিকে অটল বিশ্বাসে তাহার মানসিক গতি প্রধাবিত হইতেছিল, যদি বিশ্বাস চলিয়া গেল, যদি অসত্যের বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া মন একবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তবে আর জীবনে সেদিকে যাইতে চাহিবে না। অথচ স্থির থাকাও মনের ধর্ম্ম নহে। সৃজনে কোন বস্তুই স্থির থাকিতে পারে না। বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীনে সর্ব্ব সৃষ্টই অবিরত কার্য্যে রত। কার্য্য ব্যতিরেকে কিছুরই অস্তিত্ব নাই। হয় পুষ্প বিকশিত হইতেছে, নয় ঝরিয়া মরিতেছে, হয় শরীর দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে নয় হ্রাস হইতেছে, হয় জাতি উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে, নয় অবনতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে। মন সম্বন্ধেও এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। ভ্রম বুঝিয়া মনের গতি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেও সে হতাশভাবে স্থির থাকিবার পাত্র নহে। আর একটা পথে আকুল হইয়া ছুটিয়া যাইবে।

এই গতি কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? যে পন্থা সত্য বলিয়া মানবের মনোনীত হয়, যে পথে চলা ভ্রম নহে বলিয়া তাহার ধারণা জন্মে, যে পথে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, মানবের মন স্বতঃই সেই পথে প্রবাহিত হইবে ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এই নিয়মের প্রত্যবায় কোথাও নাই। বালক ক্রীড়ায় মত্ত ছিল, বিশ্বসংসারে ক্রীড়াই তাহার মনে একাধিপত্য করিতেছিল, এতকাল সে খেলার চিন্তা, খেলার ভাব ও খেলার ভাষাতেই তন্ময় ছিল ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহার মন বুঝিতে লাগিল এত শুধু ক্রীড়া, ইহাতে ত প্রকৃত বস্তু কিছুই নাই, তখন হইতেই সে শনৈঃ শনৈঃ তাহা হইতে দূরে

যাইতে আরম্ভ করিল। সংসারের ভোগাসক্তি ও তাহার সম্পূরণ বাঞ্ছনীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইল। সে ক্রীড়া ভুলিয়া তদবলম্বনে বিভোর হইল। আবার সেই ভাবেরও অসারতা সে একদিন উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারে যে আত্মসুখ পরিতৃপ্তিই ত সর্ব্বস্ব নহে, যাহারা আমার আশ্রিত, আমার মুখাপেক্ষী তাহাদের সুখান্বেষণ ও ভবিষ্যৎ চিন্তা আমার প্রকৃত কার্য্য। সে আপনার কথা ভুলিয়া যায়! আশ্রিতদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অর্থ সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করে। তাহার পর যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটনার নিষ্ঠুর পীড়নে, অবস্থার বিপর্য্যয়ে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে তাহার ক্ষমতায় কিছু হয় না, সমস্তই অসীম ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় সাধিত হয়, তখন মানব নিশ্চিন্ত হইতে পারে। তাই বলিয়াছি, যে পথ ভ্রমাত্মক বলিয়া মানব বিবেচনা করিবে কখনই সে সেই পথে যাইবে না। নাট্যকার কবি! প্রতিভাবলে তুমি যাহা হৃদয়ঙ্গম কর, মানবের যে ভ্রম, তুমি আশীদত্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হও তোমার নাটকে তাহার অজস্র উদাহরণ প্রদর্শন করাইয়া মানবকে ভ্রম হইতে রক্ষা কর, তাহার নয়নে সত্যের আলোক প্রতিভাত করিয়া দাও, উন্মার্গগামী জীবন সুপথে আনিয়া অশান্তির বিনাশ কর। ইহাই তোমার অতি মহান, অতি গরীয়ান কর্ত্তব্য। ইহাই তোমার নাটকের নাটকত্ব। এই মঙ্গলময় কার্য্যে নিয়োজিত বলিয়াই তোমার আসন এত উচ্চে।

সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও মানব অনেক সময় চরিত্রগত দুর্ব্বলতাবশতঃ সে পথে বিচরণ করিতে অক্ষম হয়। দুর্ব্বলতাবশতঃ জড়তা আসিয়া তাহাকে ঈপ্সিত কর্ম্মে প্রতিবন্ধ প্রদান করে। বাগুরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় দুর্ব্বলতাপাশে আবদ্ধ হইয়া মনের কার্য্যকরী ক্ষমতা লুপ্ত হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুর্ব্বলতার পদতলে আত্ম বিক্রয় করিয়া মন তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলে। এই দুর্ব্বলতা বিষয়েও সমুচিত সতর্ক হইতে শিক্ষা প্রদান নাটকের নাটকত্বের অঙ্গীভূত।

প্রতিভাবান নাট্যকারগণ কিরূপে নাটকত্বের বিকাশ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন, তাহার দুই চারিটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। ইহাতে নাটকের নাটকত্ব কোথায় বোধ হয় বোধগম্য হইতে পারে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বিল্বমঙ্গল" নাটকে বিল্বমঙ্গল একজন বারাঙ্গনাসক্ত যুবক। তিনি বেশ্যার পদতলে আত্ম বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রেমে বিল্বমঙ্গল অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন শত কর্ত্তব্যের

মধ্যে প্রণয়িণীর জন্য তাহার মন আকুল হইয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল ভাবিলেন বুঝি তাহারও মন এরূপ আকুল হইয়াছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া বিল্বমঙ্গল প্রিয়ার উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কৈ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাত নয়। এই খানে নাট্যকার তাহার ভ্রম প্রথম দেখাইয়া দিলেন। বিল্বমঙ্গল আকুল হইয়া বলিলেন "নশ্বর সংসারে তবে হায় প্রাণ দিছি কারে।" বিশ্বাস টলিয়া গেল। মন স্বধর্ম্মবশে যে পথ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল সে পথে ছুটিয়া গেল। প্রতিভাবান নাট্যকার তাহাকে সত্যপথ প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। সত্যপথ পাইলেও দুর্ব্বলতাজনিত যে অনিষ্ট হইতে পারে সে চিত্র প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বিল্বমঙ্গল স্বীয় মনকে সত্যপথে নিয়োজিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন; কামিনীর অলঙ্কার শব্দে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। অসৎ প্রবৃত্তিবশে তিনি রমণীর অনুসরণ করিলেন। কিন্তু বিধির কৃপায় আবার তাহার বিবেক বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইয়া বিল্বমঙ্গলকে জড়তার সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে উদ্ধার করিল। দুর্ব্বলতার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে যে সকলি পণ্ড হইয়া যায় ও পরিণাম কি ভীষণ হয়, মহাকবি Shakespear তাঁহার Macbeth নাটকে অঙ্কিত করিয়াছেন—

প্রথমতঃ Macbethএর চরিত্রমূল Lady ম্যাকবেথ প্রমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছে।

It is too full o'the milk of Human kindness
To catch the nearest way, thou wouldst be great;
Art not without ambition, but without
The illness should attend it, wouldst not play false
And yet wouldst wrongly win.

চতুরা Lady Macbeth স্বামীর হৃদয়নিহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় অবগত হইয়া সমস্ত প্রতিবন্ধক দূরীকরণার্থ বদ্ধপরিকরা হইলেন।

Duncanএর হত্যাসাধনে প্রবৃত্ত Macbethএর হৃদয়ে সুমতি আসিয়া বলিয়াছিল, না একার্য্য কখনই তাহার কর্ত্তব্য নহে, একে আত্মীয় তায় অতিথি He is here in double trust.

First, as I am his kinsman and his subject
Strong both against the deed; then, as his post
Who should against his murderer shut the door,
Not bear the knife myself.

Macbeth বুঝিতে পারিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাহাকে এ গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়েছে। তিনি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—We will proceed

no further in the business. কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, পাপরূপিনী পত্নী তাঁহার দুর্ব্বলতায় ইন্ধন প্রদানার্থ মনুষ্যত্বে আঘাত প্রদান করিয়া কহিলেন—

"Wouldst thou have that
Which thou esteemest the ornament of life,
And live a coward in thine own esteem
Letting "I dare not" wait upon I would
Like the poor cat on the adage?

উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বলতায় তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান জড়তা প্রাপ্ত হইল। তিনি পাপ পথে অগ্রসর হইলেন। বিবেক তাঁহাকে সত্যপথ প্রদর্শন করিলেও দুর্ব্বলতাই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল।

রবীন্দ্র বাবুর "রাজা রাণী" নাটকেও ভ্রমের চিত্র সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রাজা বিক্রমদেব রাণী সুমিত্রাকে ভালবাসিয়াছিলেন। রাণী যে চক্ষুর অন্তরাল হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার পদমূলে তিনি রাজকার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম সকলিই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। এত করিলেও নাট্যকার তাঁহাকে ঈপ্সিত বস্তু হইতে দূরে রাখিয়াছেন। রাজা অরুন্তুদ যাতনায় কেবল বলিতেছেন "প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি"। বাস্তবিক এই অবস্থায় রাজার অদৃষ্টে অশেষ নির্য্যাতন ভিন্ন আর কিছুই সম্ভবে না। তিনি বড় ভুল করিয়াছিলেন, প্রেমের যে প্রকৃত সাধনা আত্মত্যাগ, রাজা সে পথে না যাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা কল্পে প্রাণপাত করিতেছিলেন। আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি কল্পে তিনি বিশ্বসংসার তুচ্ছ করিয়া প্রেমের আবরণে আত্ম পূজায় রত ছিলেন। কিন্তু সত্য বড় কঠোর ও নির্ম্মম। তাই প্রতিভাবান কবি তাহাকে উত্তরোত্তর বাঞ্ছিত বস্তু হইতে দূরে ফেলিয়াছিলেন। ইহার পর কুমার সেনের প্রণয়িনী ইলার বাক্যে তাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। বালিকা প্রিয়ের বিপদাশঙ্কায় কাতরা হইয়া যখন বলিল "তবে পথ বলে দাও অবলা রমণী আমি, তাঁর তরে জীবন সঁপিব একা" তখনি রাজা প্রেমের সত্য বস্তু যে আত্মবিসর্জ্জন তাহাই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। স্বীয় ভ্রমাত্মক বর্ত্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। চঞ্চলতা দূর হইয়াছিল, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হইয়াছিল। তখন তিনি প্রকৃত বর্ত্মে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীউমাচরণ ধর।

শরতের চিত্র।

দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত করিয়া যে মহাপুরুষটী দাঁড়াইয়া আছেন;—যাঁহাকে কেহ কখন চিনিতে পারে নাই—যাঁহার যথার্থ রূপ এ পর্য্যন্ত কাহারও নয়নগোচর হয় নাই—যাঁহার স্বরূপ বর্ণনায় কত বাল্মীকি-বেদব্যাস-ভবভূতি-কালিদাস যুগযুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নাই;—তিনি-ই এই ভবনাট্যশালার প্রধান নাট্যাচার্য্য ও নটচূড়ামণি; উঁহারই নাম কালপুরুষ। কি চিত্রনৈপুণ্যে—কি দৃশ্যপট সংস্থাপনে—কি পটপরিবর্ত্তনে, সর্ব্বত্র এমন শৃঙ্খলাপূর্ণ দক্ষতা আর কাহারও দেখা যায় না। মুহূর্ত্ত হইতে অনন্ত পর্য্যন্ত কত কোটি দর্শক যে, দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন-পারিপাট্য দেখিতে দেখিতে, তন্ময়তায় আত্মহারা হইয়া, কত দূরদূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কত অসংখ্য মনীষিই যে ঐ দৃশ্যপটে নয়ন স্থাপন করিয়া, কতরূপ রূপ পরিগ্রহ করিতে করিতে, অনন্তের অন্বেষণে ছুটিয়াছে;—তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সে তথ্য নিরূপণ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

এই অনন্ত পরিবর্ত্তনে কত নেমি-চক্র দিন-রাত্রি কত পক্ষ-মাস-ঋতু-বর্ষ অতিক্রম করিয়া, কত কাল পরে কাল আবার একখানি অতি পুরাতন দৃশ্যপট নূতন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। অতি পুরাতন, জীর্ণ ছিন্ন হইলেও দৃশ্যপটখানি কি মনোরম! কি নয়নানন্দবর্দ্ধক!!

সম্মুখে শরৎ এই বিচিত্র চিত্রপটখানি হাতে করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বুঝি ভাবিতেছে "প্রকৃতির এ কেমন আব্দার!! চিরকালই কি আমাকে ঠায় খাড়া থাকিয়া, লোকে দেখুক না দেখুক, বুঝুক না বুঝুক, এই পট ধরিয়া, কিছুদিনের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে? ভাল! আমি যদি বলি যে, আমি আর পারিনা; প্রকৃতি! তুমি অন্য কাহাকে এ ভার দাও! তা হইলে কি হয়? ও হরি! তাও কি আবার বুঝাইতে হইবে? এখনই সে সরলতামাখা ঢল ঢলে মুখখানি অভিমানের কালমেঘে ঢাকিয়া দিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে বারিবর্ষণ না অশ্রুবর্ষণ!! সে ত' প্রাণে সহিবেনা, এ সঙ্কল্প-বালুকার বাঁধ ত' সেখানে টিকিবে না!! শেষকালে সে অভিমান-অশ্রুবর্ষণের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইব!! হায়! হায়! প্রণয়ীর কি এত জ্বালা! প্রণয়ে কি তর্ক নাই, বিচার নাই,

কেবলই প্রণয়ীর মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া থাক! তার ইঙ্গিতেই যাতায়াত কর, তারই সুখের আশায় নিদ্রা যাও, তার কার্য্যের জন্যই জাগিয়া থাক।

শরৎ বলিতেছে—"দেখ! দেখ মানব!! কি সুন্দর দৃশ্য দেখাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাও! বেশীক্ষণ থাকিব না, এখন না দেখিলে, আর দেখা হইবে না, চলিয়া গেলে অনুতাপ করিবে। এই পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ-পূর্ণ সংসারের শত সহস্র জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে, একবার ক্ষণকালের জন্য, আমার করধৃত এই বিচিত্র চিত্রপটখানি দেখিয়া লও! প্রাণ মন মুগ্ধ হইবে—অতীত অনাগত ভুলিয়া যাইবে—বর্ত্তমান শিশিরসম্পৃক্ত হস্তে মনের সন্তাপ শীতল করিবে—এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দ স্রোতে হৃদয় ডুবাইয়া দিবে।

দেখ! বর্ষার সে কলুষিত নদী, সেই সকর্দ্দম-পিচ্ছিল সরণি, সে নিবিড়-ঘনঘটান্ধতমোময় দিবস আর সেই কাদম্বিনী সঙ্গিনী নিত্যতামসী তমস্বিনী, ইহারা সকলেই বুঝি একত্র পরামর্শ করিয়া, আপন আপন কলঙ্ককালিমা এক সময়েই মুছিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতির নূতনরূপে, অভিনব সৌন্দর্য্যে দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। বর্ষার জলে ধৌত কলেবরা ধরিত্রী স্নানান্তে দিব্য বসন ভূষণ পরিধান করিয়া, আবার বুঝি নবযৌবনের গরিমা, পূর্ণতার মহিমা ও তরলতার মধুরিমা ছড়াইয়া দিতেছে। পথে আর কর্দ্দম নাই—ধূলি নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝর্‌ঝর্ করিতেছে; নদীর নির্ম্মল জল দক্ষিণানিলের মৃদুমন্দ করাকর্ষণে তর্-তর্ করিতেছে। গাছের পাতায় মলা মাটী নাই; কার অদৃশ্য হস্ত সেই পুরাতন পত্র গুলিকে ধুইয়া—মুছিয়া পরিষ্কৃত করিয়াছে। নিয়ত জল-ভারাবনত সে দূরবিলম্বিনী ঘনাবলী এখন আর আকাশ ঢাকিয়া রাখে নাই; কচিৎ দুই এক খানা ভাঙ্গা মেঘ নির্ম্মল আকাশে বিচরণ করিতেছে। দূরে দূরে ভাসমান সেই সমস্ত অম্বুবাহ শ্রেণীর মধ্যে কখন বা দুইখানি নিতান্ত কাছাকাছি হওয়ায় পূর্ব্বপরিচয়ের প্রেমাভিনয় করিতেছে। সেই প্রেমালিঙ্গনসম্ভূত শব্দে পথিকেরা সহসা চমকিত হইয়া, আকাশে চাহিয়া দেখিতেছে;—বুঝি দুই বীরের প্রেমালাপ-সম্ভূত হাস্যধ্বনিও কখন কখন দুর্ব্বলের কর্ণপুটে প্রতিধ্বনিত হইয়া গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনের মত অনুমিত হয়। অন্যত্র গম্যমান দুইখণ্ড মেঘে সেই অতীত যৌবনের ঢলঢলে রূপ, তরতরে লাবণ্য, আর সে নিয়ত কর্ম্মময় জীবনের ঝর্‌ঝর্ বারিবর্ষণ স্মরণ করিয়া, একটু দুঃখের হাসির বিজলী খেলাইয়া, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া চলিয়া গেল। হায়! বৃদ্ধ বয়সে গতযৌবনের কত স্মৃতি আসিয়া,

কতবার যে ঐ রকমে কাঁদাইয়া যায়, হে কর্ম্মকুশল যুবক! তুমি কি তাহা বুঝিতে পার?

পশ্চিমগগনে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িতেছেন; প্রেমানুরাগে এখনও তাঁহার বদন রাগরঞ্জিত। এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছেন, এখনও কেহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে কি না। সে কি কমলিনী না ছায়া? জল দর্পণে নিমজ্জমান সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া, এক সূর্য্য শত সূর্য্যের মত দেখাইতেছে, তীরস্থ বনরাজি আপন আপন মুখ দেখিতে কি সূর্য্যের অস্তগমন দেখিতে জলের ভিতর উঁকিঝুকি দিতেছে বলা যায় না। বোধ করি শুধু মুখ দেখা নয়, ভিতরে যেন কিছু লুকোচুরি প্রেমরহস্য আছে; নচেৎ সূর্য্যই বা কেন জলের ভিতর দিয়া, বনরাজির প্রতিবিম্ব দেখিবেন, আর বনরাজির মুখেই বা কেন সহসা লজ্জার আরক্তিম রেখা ফুটিয়া উঠিবে? মৃদু মারুত টিপি টিপি পা ফেলিয়া, গজেন্দ্রগমনে যাইতে যাইতে, একবার ফুলের পাপড়ি, একবার নবকিশলয়, একবার নদীতরঙ্গ চকিতের মত স্পর্শ করিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। সহসা পাখীরা ডাকিয়া উঠিল; সে কি বিষাদের গান, না বিলাপের করুণ ক্রন্দন!! হায়! হায়! জগৎ আঁধার করিয়া, দিনমণি ডুবিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, দেখিল তিনি নাই; অনেকক্ষণ অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছেন। অভাগিনী হতাশে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল; হায়! তার যে অনেক দিনের আশা!! এই মহামহিমাময় পুরুষটীকে দেখিবার জন্য, সে যে কতদিন হইতে বুকের ভিতর আশাকে পোষণ করিয়াছে, নিত্য নিত্য ছুটিয়া আসে, নিত্যই ওঃ যাঃ আর একটু আগে আসিলেই হইত। হায়! হায়! চিরদুঃখিনীর দুঃখে কষ্টে হতাশে অভিমানে হৃদয় উছলিয়া, অশ্রুকণায় ক্ষিতির কঠিন অঙ্গ ভাসাইয়া দিল। লোকে কিছু না দেখিয়া না বুঝিয়া বলিল, "শিশির পড়িয়াছে।"

প্রণয়িনীর কাতরতা দেখিয়া, সুধাংশু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে গগনপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। অসহনীয় দুঃখে আপনার লোককে দেখিয়া হৃদয় যেমন আশ্বস্ত হয়, তেমনই দুঃখের রুদ্ধপ্রবাহ প্রবলতর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বলিত হইয়া, তাহাকে কাতরও করে। নতুবা পতিদর্শনে পুলকিত হইয়া, সন্ধ্যা যখন ইন্দুকে আলিঙ্গন করিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়েই কোথা হইতে সুপ্তস্মৃতি জাগাইয়া, অভিমান উছলিয়া, সন্ধ্যার নয়ানজলে বয়ান ভাসিয়া যাইবে কেন? সেই উচ্ছ্বাস-উচ্ছ্বলিত অশ্রুকণা মুক্তাহারের সৌন্দর্য্য সন্নিবেশ করিয়া, নীলদূর্ব্বাদলে নিপতিত হইল।

ক্রমে রাত্রি; একটী একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে; দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ তারার মালায় ঢাকিয়া ফেলিল। মনে হইল যেন হীরকের কারুকার্য্যখচিত একখানি নীল চন্দ্রাতপ পৃথিবীর আস্তরণ স্বরূপে লম্বমান রহিয়াছে। উহারই নীচে নীলদূর্ব্বাদলে শিশিরকণার মুক্তাহার!! সে বুঝি সবুজবর্ণের কোমল শয্যা!!

এই ভব-রঙ্গ-মঞ্চে প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যপটে যে চিত্রপটখানি প্রদর্শিত হইয়াছিল, মনে করিয়া দেখ, সে খানিতে শিশুর অস্ফুট সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ চিত্রিত করিয়াছিল। তখন বিন্দু বিন্দু হিমপাত নির্ম্মল সুকোমল চিত্তবৃত্তি তখনও অকলঙ্ক; তাহাতে একটুও বিষাদের দাগ পড়ে নাই। সেই হেমন্তের প্রথম প্রভাতে, অদন্ত অবাকৃসুন্দর মুখখানি ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল। মৃদু মধুর হাস্য কণায় সেই ফুটন্ত মুখ খানিকে সমুদ্ভাসিত করিয়া, দ্বিতীয় পটে শিশির কালের শুষ্ক সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করাইয়া, তৃতীয় দৃশ্যে বয়ঃসন্ধির অবতারণা করাইয়াছিল। সে তখন বিগত শৈশবের লুপ্তলাবণ্যময় স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-শৈত্যে এবং আগামী গ্রীষ্মের উদ্দাম উষ্ণতার মাঝখানে পড়িয়া, নববসন্তে অনতিদূরাগত যৌবনের সূচনা করিয়া, দর্শকের অতুলানন্দ উপভোগের কারণ হইয়াছিল। সে তখন সবে মাত্র সুপ্তস্মৃতি জাগাইয়া—কত জন্মজন্মান্তর সংস্কারের ছায়ায় মিশাইয়া—এক অপূর্ব্ব অননুভূত আনন্দে ডুবাইয়া ক্রমশঃ অগ্রগামী হইতেছে। সেখানে সঞ্চয় নাই—বর্ষণ নাই—কর্ম্ম নাই—বিশ্রাম নাই—ভোগ নাই—ক্ষয় নাই;—আছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ,—অননুভূত আনন্দ—অক্ষুণ্ণ স্ফূর্ত্তি আর পরিপূর্ণ উৎসাহ। তখন জ্বালা যন্ত্রণার বোধ নাই—অন্ধকারের অনুভূতি নাই, তখন সর্ব্বত্র সুশীতল সুস্নিগ্ধ আলোক। তখন লতায় লতায় ভাবের হিল্লোল, বৃক্ষে বৃক্ষে নবকিশলয়, পুষ্পে পুষ্পে সৌরভ সৌন্দর্য্য। তখন কোকিলকণ্ঠে পঞ্চম স্বর ভ্রমর পক্ষে মধুর ঝঙ্কার বায়ু হিল্লোলে মলয়রজঃ আর সর্ব্বত্রই অপরূপ সৌন্দর্য্য। ধরিত্রী তখন পরমাসুন্দরী; তার প্রতি পদক্ষেপে প্রতি করকম্পনে লাবণ্যতরঙ্গ উছলিয়া পড়িতেছে। তখন জানে নাই যে, তরঙ্গে তুফান আছে, কুসুমে কীটু আছে, মলয় মারুতে ঝড় আছে, বায়ুর হিল্লোলে রোগজননতা আছে—সূর্য্যকিরণে জ্বালা আছে। যে হিমকণা নগ্ন সৌন্দর্য্যে প্রথমেই তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সে এখন বসন্তের বয়ঃসন্ধির পূর্ণতায়, যৌবনে আসিল, কি উদ্দাম তেজস্বিতায় কর্ম্মময় জীবনের কার্য্যকারিতা দেখাইতে পারে, গ্রীষ্ম তাহা দেখাইয়া বুঝাইয়া শেষে বার্দ্ধক্যে

পরিণত হইল। সেই শান্ত শিশির বিন্দু আজ ঘোরতর গর্জ্জনে পূর্ণ ধারাপাতে, পৃথিবী ভাসাইয়া ডুবাইয়া কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেল। উত্তরোত্তর এই পাঁচখানি দৃশ্য পটে শৈশব, বাল্য, বয়ঃসন্ধি, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের অবতারণা করাইয়া, কর্ম্মময় জীবনের অবসানে বর্ষণের শান্তি স্রোতে সব ভাসাইয়া, এই পঞ্চমাঙ্কের যবনিকা পড়িয়া গেল।

শেষ পট পরিবর্ত্তনে নূতন দৃশ্য!! এই প্রতিনিয়ত জন্ম মৃত্যুর ঘোরতর সংগ্রামের অবশেষে, জীবন ও মরণের পরপারে আসিয়া একটী সুন্দর দেবযান-তুল্য পরম রমণীয় অবস্থার দৃশ্য আজ সকলকে আনন্দে আত্মহারা করিয়াছে। এখানে যেমন বাল্যের চপলতা নাই, তেমনই যৌবনের মদ গর্ব্বিতা নাই; কৈশোরের কমণীয়তা ও বার্দ্ধক্যের কঠোরতা ভেদ করিয়া, কেবল আনন্দ-আলোক ঔজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রমাগত ছুটিতেছে।

যেখানে এখন আসিয়াছি—এখানে যেন কর্ম্মময় ভুবনের সুপ্ততা ঘুচিয়া নিয়ত-শান্তিময় একটী আনন্দলোকের আভাস উদ্ভাসিত হইতেছে। এখানে হিম নাই, শীত নাই—আছে শুধু বসন্ত;—গ্রীষ্ম নাই—বর্ষা নাই, সর্ব্বত্রই শরৎ। শৈশবের অবিকশিত স্ত্রী ও বাল্যের সে কঠিন কমনীয় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া, নব-বসন্তের আবেগময়—স্বপ্নলোকের সুখস্মৃতিময় মলয়মারুত বহিয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মের সে তীব্ররোষ আর বর্ষার সে অভিমান অশ্রুবর্ষণ দূর করিয়া, হাস্যময়—শান্তিময়—প্রীতিময়—সুপ্তিময়—শরৎ রাত্রি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত জগৎ সুষুপ্ত; সে কর্ম্মময় জীবনের খরতর স্রোতের অবসানে অনন্ত শান্তিসমুদ্র ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। একটী প্রাণীও সজাগ নাই; বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্ম পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলেই অনন্ত শক্তিশালিনী ত্রিগুণাত্মিকা জগদ্ধাত্রীর ক্রোড়ে আনন্দময় কোষগৃহে মায়া-আবরণে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া সুখে ঘুমাইয়াছে। সত্ত্বগুণময় বিরাট পুরুষ এই শান্তিসলিলে সমস্ত শরীর ঢালিয়া, মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত সুখ নিদ্রায় নিমগ্ন।

শরৎ রাত্রির ঊষা দেখা দিয়াছে। সেই সুপ্ত বিরাট পুরুষের নাভিস্থ বোধ-পদ্ম বিকশিত হইয়া, কর্ম্ম সৃষ্টির বিষয়ীভূত রজোগুণাত্মক ব্রহ্মার নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে। ঊষা পূর্ব্বগগনে মৃদুমধুর হাস্যচ্ছটায়,—পুলকিত মুখখানি তুলিয়া কি দেখিতেছে। সেই রূপের আলোকে—নাতিতীব্র নাতিমৃদু—না উষ্ণ—না শীতল, সেই সুন্দর আলোকে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মার নয়নে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। জগতের সবই সুষুপ্ত স্থির—নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝখানে কার্য্য ও

কারণ পাশাপাশি যমজ সহোদরের মত দাঁড়াইয়া আছে ; বুঝি ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার জন্য। আশা, আকাঙ্ক্ষা গা ঝাড়া দিয়াছে—বুঝি প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু এ কি! এ!! এই দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভের ঘোর বিদ্রোহ দমন না করিলে প্রভাতেই বুঝি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে। যে মহাপুরুষ কার্য্যকারণের মধুরতা ও তীব্রতার সমন্বয় করিতে সক্ষম, তিনি ত' জগজ্জননীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখে নিদ্রিত ; সেই সত্বগুণময় কালপুরুষকে কে জাগাইবে?

যে অপরিসীম আবরণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপৃত করিয়াছে, মহামোহরূপিণী মহামায়ার আবরণ ভেদ করিয়া, তিনি স্বয়ং না জাগিলে, এই বিরাট পুরুষকে কে জাগাইবে? ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার মানস-সরোবরে মুদ্রিত বাসনা প্রস্ফুটিত হইল এবং সরস্বতী সহসা নিদ্রোত্থিতের মত বাগ্‌বাহিনী শিরাপথে ব্রহ্মার বদনে আবির্ভূতা হইলেন। কে তোমাকে জাগাইবে মা! তুমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিস্বরূপা, তুমি স্বয়ং না জাগিলে, তোমাকে কে জাগাইতে পারে? তুমি স্বাহা! তেজোময়ী অগ্নিস্বরূপা ; তুমি যখন স্বতেজে সমগ্র জগৎকে স্বরূপে আনয়ন কর, তখন-ই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড জাগরিত হয় ; অন্যথায় সুপ্ত। তুমি স্বধা—পিতৃরূপা! এই অনন্ত লোকের তুমি জনক এবং তুমিই জননী। তোমার তেজে তোমারই গর্ব্ভে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জগৎ এক্ষণে জনগর্ব্ভে নিমগ্ন, সে তোমারই গর্ব্ভাশয়। এই গর্ব্ভশয্যায় ঐ মহাপুরুষ এক্ষণে সুষুপ্ত, তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে জাগাইবে মা? হে অক্ষরে! যুগযুগান্তর ধরিয়া, কত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জন্মমৃত্যুপথে গতাগতি করিতেছে, কেবল তুমিই পূর্ব্বাপর একভাবে অবস্থিতি করিতেছ তাই বুঝি তোমাকে জড় প্রকৃতি বলিয়া থাকে। হে অব্যক্তে! এ পর্য্যন্ত কেহই তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে নাই। উন্নতি অবনতি সকলেরই আছে, কৌমার যৌবন জরা মৃত্যুর অধীন কে নয়? সে কেবল তুমি। তুমি একমাত্র চিৎস্বরূপ হইয়াও ত্রিমাত্রাত্মিকা—স্বত্ব-রজ-স্তমোময়ী। তোমার সংযোগে পূর্ণমাত্রা, অবশিষ্টে অর্দ্ধমাত্রা ; সেই পরম পুরুষের সত্বা তোমাতেই অনুভব করি ; তাই নিতান্ত অনুচ্চার্য্য অর্দ্ধমাত্রা তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা হইতেই জগতের সৃষ্টি—তুমি ধারণ করিয়া থাক বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব থাকে—আবার এখন তুমি আপনার স্নেহময় অমৃতময় শীতল ক্রোড়ে তাহাকে লুকাইয়া, আপনি ঘুমাইয়াছ বলিয়াই বর্ত্তমানে সংহৃতিরূপা। পুনরায় তুমি না জাগিলে এ সমন্বয়-কারী কালপুরুষের ক্রিয়াশূন্যতা কে দূর করিবে? মা! মহামায়ে!! মহা-

মোহরূপিণি! মোহ ঘুচাইয়া ঐ বিরাট পুরুষকে জাগাইয়া দাও মা!! জাগৃত শক্তি উঁহাকে কর্ম্মভুবনের মাঝখানে আনিয়া, কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলুক!! কার্য্য-কারণরূপে সমুদ্ভূত মধুকৈটভের শক্তি সংহার পূর্ব্বক উভয়ের সামঞ্জস্য সমন্বয়ে সৃষ্টির বিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হোক!!

ব্রহ্মার মানস-সম্ভূতা বাণী জগজ্জননীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ঐ দেখ! অনন্ত সমুদ্রশায়ী ভগবান্ ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন। নেত্র, আস্য, নাসিকা, বাহু ও হৃদয়ের অসাড়তা দূর হইতেছে। মোহময়ী প্রকৃতি ধীরে ধীরে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইলেন, কর্ম্মময়ী প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল।

উদ্বোধিত মহাপুরুষ ব্রহ্মার বিনাশে কৃতনিশ্চয় মধু ও কৈটভকে বিনাশ করিয়া কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন; সৃষ্টির সমন্বয় সমর্থনে সমুদ্রগর্ত্ত হইতে পৃথিবী ভাসিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

বাদলে।

(Longfellow র Rainday র ভাবাবলম্বনে)

হর্ষহীন দিন আজি শীতল আঁধার
অবিরাম বায়ু বহে ঝরে জলধার;
ভগ্ন প্রাচীরে লগ্ন রয়েছে লতিকা
অনুক্ষণ শুষ্ক পত্র ফেলিছে ঝটিকা;
আঁধার দিবস আজি তমসায় ঘেরা।
বিষণ্ণ জীবন মম অন্ধকার ভরা,
নিরাশ্য বাতাস বহে, ঝরে আঁখি ধারা;
চিন্তা রাশি আছে ঘিরে বিস্মৃত অতীতে,
যৌবনের সুখ স্মৃতি জাগিছে মনেতে।
জীবনের ক'টা দিন কাল কূট পোরা!
অভাগা বিষণ্ণ চিত্ত! কেঁদনাক আর,
আলোক পিছনে আছে, আগেতে আঁধার;
তোমার জীবন হয় সকলের মত,
সবারি জীবনে হয় বারি বিন্দু পাত।
জীবনের দিন গুলি সুখে দুঃখে ভরা!

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বিদেশী আক্রমণ।

বেদ-গাথা-মুখরিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্লাবিত রত্নপ্রসূ আর্য্যাবর্ত্ত চিরদিনই লোভলোলুপ রজঃপ্রধান বিদেশীর আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছে। ধবল তুষার-মণ্ডিত হিমাচল পরিখার অন্তরালে থাকিয়া উর্ম্মিমালা শোভিত পয়োধি বেষ্টিত হইয়া আপনাদিগের সুউচ্চ নীতি সুমহান ধর্ম্মজ্ঞান হৃদয়গ্রাহী আচার ব্যবহার লইয়া আর্য্য হিন্দুগণ যতই বিদেশীয় জাতীনিচয় হইতে পৃথক থাকিতে ভালবাসিত, অপরাপর সাহসী জাতিও তেমনি ভারতের ধনরত্নের অংশ পাইবার জন্য, শস্য শ্যামল ভাগীরথিতীরস্থিত প্রদেশের উর্ব্বরতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া এদেশ লুণ্ঠন করিতে আসিতে সুখবোধ করিত। তাহার ফলে অতি পুরাকাল হইতেই গ্রীক, আসীরিয়, প্রাচীন পারস্য, সাইদীয়, হুন, বক্ত্রীয়, গেটে বা জীট এবং পরিশেষে আরব, আফগান প্রভৃতি নানা জাতীয় বিদেশী আসিয়া শান্তস্বভাব হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর যখন পাশ্চাত্যের এবং উত্তর পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন জাতি গুলির ধ্বংসে ইউরোপে আধুনিক সভ্য জাতিদিগের অভ্যুত্থান হইল তখন দীনেমার, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জাতিগণও যশোদীপ্ত ভারতবর্ষের প্রতি লোভদৃষ্টিতে চাহিল। ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া ভ্যাস্কোডিগামা, আমেরিগো ভেস্পুসি কলম্বাস প্রভৃতি বিস্তৃত ভূখণ্ড আবিষ্কার করিয়া জগতের সম্পদরাশি বর্দ্ধিত করিয়াছে।

এ প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে বিদেশীয়দিগের ভারত আক্রমণের ইতিহাস আলোচনা করিব।

কথিত আছে গ্রীকদিগের পৌরাণিক দেবতা ব্যাকাশ (Bacchus) ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইতিবৃত্তকার টড্ সাহেব নানা প্রকার সুযুক্তি কুযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের বীর পরাক্রম রাজপুত জাতি উত্তর আসিয়ার তাতার, সাইদীয় গেটে জাতি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই কিম্বদন্তী লইয়া তিনি আপনার ধারণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নূতন প্রমাণ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাঙ্, ধুতুরার নেশায় বিভোর সুন্দরবপু "বাঘেশ" বা মহাদেবকে আপনার ক্রোড়ে প্রেমময়ী গৌরীমূর্ত্তি লইয়া ত্রিশূল হস্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া

উর্ব্বরমস্তিষ্ক যশঃপ্রার্থী টড্ মহাপ্রভু তাঁহাকে গ্রীক জাতির মদ্যপায়ী ঢুলু ঢুলু লোচন ব্যভিচার রত ব্যাকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা বাগেশ ও ব্যাকাশ একই শব্দ। সংযমী মহাযোগী মহাদেবের সহিত পাশ্চাত্যের উপদেবতার তুলনা করা যে কতদূর মহাপাতক তাহা সে সময় টড্‌কে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়।

যাহা হউক, ব্যাকাশের ভারত বিজয় কাহিনীটা কিম্বদন্তী ব্যতীত অপর কিছুই বলিতে পারা যায় না। কিন্তু অতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পুরাণেও আপনাদের দেবতার কৃতিত্বের পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে ভারতবিজয়ের সুযশ অর্পণ করিবার প্রয়াস হইতে বুঝা যায় প্রাচীন জগতের অধিবাসীবৃন্দ কিরূপ সশ্রদ্ধ অথচ লোভলোলুপ দৃষ্টিতে রত্নপ্রসূ পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের দিকে চাহিয়া থাকিত।

সেমিরামিস্।

গ্রীক ইতিবৃত্তকার ডাইওডোরাস বর্ণিত কাহিনী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উত্তর পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন রাজস্ব আসীরিয়ার রাজমহিষী সেমিরামিস্ ভারতবর্ষ জয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আসীরিয়ার বিখ্যাত ভূপতি নীনার মহিষী সেমিরামিস্ প্রথমে একজন সেনানায়কের পত্নী ছিলেন। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ন্যায় তিনি আসীরিয়া-পতি নীনার প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বামীর অবস্থা প্রায় হতভাগ্য সের আফগানের অবস্থার সমতুল্য হইয়াছিল এবং নুরজাহানের মত সেমিরামিস্‌ও নীনেভি প্রতিষ্ঠাতা নিজ স্বামী নীনা অপেক্ষা যশস্বী হইয়াছিলেন।

উক্ত আছে প্রাচীন ব্যাবিলন (Babylon) নগরের প্রতিষ্ঠাত্রী সামিরা-মিস্। আপনার অদম্য উৎসাহ বলে বীরাঙ্গনা আসীরিয় সৈন্য লইয়া পশ্চিম আসিয়ার প্রায় সকল প্রদেশ একে একে আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুদূর বক্ত্রীয় প্রদেশেও রাজমহিষীর বিজয় কেতন উড্ডীয়মান হইয়াছিল; তখন সামিরামিসের উচ্চাশার সীমা বর্দ্ধিত হইল, তিনি সংকল্প করিলেন প্রবলস্রোত খরবাহী সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া প্রচুরশস্য সুদৃশ্য ভারতবর্ষ জয় করিয়া তিনি তথাকার অসংখ্য বুদ্ধিমান অধিবাসিবর্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রী হইবেন।

রণকুশল রাজমহিষী দেখিলেন মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া স্বল্পব্যয়ে আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিবার আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং তাঁহার সমগ্র সৈন্যবল একস্থলে

কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি এ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ হইলেন। কিন্তু তরঙ্গায়িত সিন্ধুনদের সুপ্রশস্ত বিরাট আকার দেখিয়া আসীরিয়ার বীরাঙ্গনাকে চিন্তিত, হইতে হইল। পরপারের হস্ত্যাদি চতুরঙ্গ সেনা সুরক্ষিত শস্য শ্যামল বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন তাঁহার চক্ষে বারেক স্বপ্ন রাজ্যের মত প্রতীয়মান হইল।

সাম্রাজ্ঞী হিন্দুরাজার সৈন্যবল দেখিয়া স্থির করিলেন নৌ বাহিনী এবং হস্তী সৈন্য ব্যতীত তিনি সিদ্ধ মনোরথ হইবেন না। সুতরাং বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি ফিনিসিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকা নির্ম্মাণ করিবার শিল্পী আনয়ন করিলেন। তাহার পর বক্ত্রিয়ায় সেই সকল কারিগরের সাহায্যে কতকগুলি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করাইয়া সেগুলিকে স্থলপথে আনিয়া সিন্ধুবক্ষে ভাসাইয়া দিলেন। এরূপ উৎসাহ, এবম্প্রকার উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, সুতরাং এ ইতি-হাস সত্য হইলে সকলকেই বলিতে হইবে সামিরামিস সাম্রাজ্ঞী চিরকাল শ্লাঘনীয়া।

উদ্যোগ পর্ব্বের এই খানেই শেষ হইল না। আসীরিয়ানগণ দেখিল হস্তী সৈন্য দেখিয়া তাহাদের সুদক্ষ অশ্বসেনা ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য মধ্যে কোনও প্রদেশেই সাম্রাজ্ঞী হস্তী সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তখন কৌশলে তিনি কার্য্যসিদ্ধি করিতে মনস্থ হইলেন। তিন লক্ষ বৃষ মারিয়া তাহাদের চর্ম্মে বড় বড় উষ্ট্রকে আচ্ছাদিত করিয়া তিনি মায়া হস্তী নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দারাই হস্তীর কার্য্য সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। বলা বাহুল্য, দূর হইতে সেগুলিকে প্রকৃত হস্তী বলিয়াই মনে হইত।

নৌকা নির্ম্মাণ করিতে, উষ্ট্রকে হস্তী সাজাইতে অপরাপর বাহিনী একত্র করিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। কোনও কোনও গ্রীক লেখকের মতে সর্ব্বসমেত তিনি বহু ক্রোর সৈন্য লইয়া আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিতে গিয়াছিলেন। টিসিয়সের (Ctisias) মতে তাঁহার সহিত।তিন লক্ষ পদাতিক, পাঁচ লক্ষ অশ্বারোহী, দুই সহস্র নৌকা এবং বহু মায়া হস্তী লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

এদিকে হিন্দু ভূপতি স্তবব্রত (Stabrobates) আপনার স্বদেশে বিদেশীর আগমন বার্ত্তা পাইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনিও নাকি সামিরামিস অপেক্ষা এক বৃহত্তর বাহিনী লইয়া সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব কূলে বিজাতীয় শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আততায়ীর দুই সহস্র নৌকার

সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য চারি সহস্র বেঁতসী নির্ম্মিত নৌকা সংগ্রহ করিলেন। সিন্ধুর উভয় তীরে সংগ্রামের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল।

সেমিরামিসের নৌ বাহিনীর সহিত প্রথমে মহারাজা স্তবব্রতের নৌ বাহিনীর সংঘর্ষণ হইল। কিন্তু সে যুদ্ধে বিদেশীর জয় হইল, হিন্দু নৌকাগুলি কতক ভাঙ্গিয়া, কতক ডুবিয়া, কতক কর্ণধার বিহীন হইয়া সিন্ধুর খর-স্রোতে ভাসিয়া গেল। নদের উভয় কূলই উৎসাহ সম্পন্না অমিত পরাক্রম বীরাঙ্গনার আয়ত্তাধীন হইল। উভয় কূল সুরক্ষিত করিয়া তিনি সিন্ধুনদের উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সেতু সাহায্যে তাঁহার বিপুল বাহিনী পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হিন্দুভূপতি স্তবব্রত জলযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগ্নমনোরথ হয়েন নাই। তিনি তাঁহার পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে মহা সংগ্রাম বাধিল। অশ্বপদোত্থিত ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইল, সেনাকলরবে, দামামা, দুন্দুভি মৃদঙ্গের নিনাদে রণস্থল এক অম্বু-নিধি সদৃশ প্রতীয়মান হইল।

অশ্বযুদ্ধেও হিন্দুগণ বিশেষ সুবিধা পাইলেন না। শেষে স্তবব্রত হস্তী দ্বারা শত্রু সৈন্যকে আক্রমণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। এই সময় দূত আসিয়া আততায়ী সেনার হস্তীদিগের স্বরূপ বর্ণনা করিল। তখন "হর হর মহাদেব" বলিয়া বীর ক্ষত্রিয়বৃন্দ রণস্থলে অবতীর্ণ হইল। সে গতি প্রতি-রোধ করা আসীরিয়দিগের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

এই পলায়নের সময় মায়া হস্তীদিগের অবস্থা স্মরণ করিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। কোন উষ্ট্রটী হস্তীর চর্ম্ম ফেলিয়া পলাইল, কেহও বা চর্ম্মে রুদ্ধ হইয়া প্রকৃত হস্তীর পদতলে প্রাণ হারাইল। যুদ্ধাবসানে হিন্দু ভূপতি বিজেতা হইয়া আপনার পুণ্যভূমি বিদেশীর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন।

ডাইওডোরাস, টিসিয়স্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তকারগণ সামিরামিসের ইতিহাস বর্ণিত করিলেও অনেকে সামিরামিসের কাহিনী একেবারে কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। কিম্বদন্তী আছে সামিরামিস শেষ জীবদ্দশায় ঘুঘু হইয়া ঘুঘুদিগের সহিত বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, ইহা কেবল প্রাচীন জাতি কর্ত্তৃক আপনাদিগের প্রিয় সাম্রাজ্ঞীকে উচ্চ আসন দিবার চেষ্টা মাত্র; তাঁহাকে একটা অমানুষিক অথচ কোমল শক্তিতে মণ্ডিত করিবার বাসনা মাত্র।

সেমিরামিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও উত্তর পশ্চিম আসিয়ায় নানা প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগর গুলি তাঁহার নামে এখনও অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সামিরামিসকে একেবারে কল্পনা কল্পিত বলা যাইতে পারে না।

ডেরায়স।

হেরোডোটাস, টিসিয়স্ প্রভৃতি গ্রীক ইতিবৃত্তকারদিগের লেখনী হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন পারস্যের বিখ্যাত ভূপতি ডেরায়স ভারতবর্ষের কতক অংশ স্বীয় সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া ছিলেন এবং তথা হইতে কর গ্রহণ করিতেন। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তকার গ্রোট প্রভৃতি এ কাহিনী বিশ্বাস করেন। গ্রীকদিগের মতে এ বিষয়ে প্রাচীন পারস্যে অনেক বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডেরায়স বা ধর্য্যবশের শাসননীতি এবং বীরত্ব ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অগ্নিউপাসক ধর্য্যবশ তুরাণীদিগের পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে জোরোয়াস্ত্রিয় ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আপনার বিশাল সাম্রাজ্যকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা সেট্রাপীতেও বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি এক এক জন শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখিয়া শাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল সুবা বা প্রদেশকে পারসিকগণ "ক্ষত্রপাভ" বলিত। আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে নক্সি রস্তম নামক পর্ব্বতকে কাটিয়া তিনি স্তম্ভ প্রভৃতি সুশোভিত সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটি সমাধি মন্দির * নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সমাধি মন্দিরের এক স্থলে তাঁহার অষ্টবিংশ ক্ষত্রপাভের একটী তালিকা প্রদান করেন। সেই তালিকার মধ্যে ভারতবর্ষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান জয় করিতে আসিয়া ডেরায়স বা ধর্য্যবশ সিন্ধু নদীর উৎপত্তি স্থল নির্ণয় করিবার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাবিক সাইলক্ষকে (Scylax) নিয়োগ করেন। সাইলক্ষ নদী বাহিয়া একেবারে মিশর দেশে গিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর, কথিত আছে পারস্যের সম্রাট ভারতবর্ষ জয় করেন এবং এখান হইতে মবলক সুবর্ণ রজত প্রভৃতি কর স্বরূপ লইয়া যান। কিন্তু গ্রীক ইতিবৃত্তকার প্রদত্ত বিজিত ভারতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যদি এ কাহিনী সত্য হয় তাহা হইলে পারসিকগণ প্রাচীন ভারতের গুজ্জর প্রভৃতি দুই একটি উত্তর পশ্চিমের প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন মাত্র।

* আধুনিক অগ্নি উপাসক পারসিকদিগের মধ্যে কিন্তু শবদাহ বা শব সমাধির প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় সমাধি মন্দিরটি স্মৃতিমন্দির মাত্র।

প্রাচীন পারসিকদিগের হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তাহা গ্রীকদিগের বর্ণনা * হইতে স্পষ্ট জানা যায়। তাঁহারা যে সকল জাতিকে হিন্দু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেকে বোধ হয় আদৌ হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল না। পদয়ী (Padaei) নামক পার্ব্বত্য জাতির বর্ণনায় তাঁহারা বলেন "পদয়ী জাতি কেবল কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে।" অপর একটি জাতির খাদ্য কেবল কাঁচা মৎস্য। বলা বাহুল্য, এরূপ অমানুষিক জাতির সহিত হিন্দু জাতির কোনও সম্পর্ক ছিল না বা তাহারা প্রকৃত হিন্দুস্থানের কোনও অংশ অধিকার করিত না।

কিন্তু ঐ সকল বর্ণনার মধ্যে প্রকৃত হিন্দু সমাজের চিত্রও পাওয়া যায়। ডেরায়স খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তখন শাক্যসিংহের "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" মত ভারতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাই গ্রীক লেখক বলিয়াছেন, পারসিকগণ দেখিয়াছিল হিন্দুস্থানের অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী। সংসারে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের উল্লেখও এতদ্ কল্পে পাওয়া যায়।

কিন্তু জড় প্রকৃতির উপাসক রজঃপ্রধান পাশ্চাত্য লেখক হিন্দুস্থানের সুবর্ণ প্রাচুর্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। তখন নাকি নানা সুবর্ণের আকর আর্য্যাবর্ত্তে বিদ্যমান ছিল এবং নদীর কূলে কূলে সুবর্ণ পাওয়া যাইত। আমরা এখন নদীর কূলে কূলে কেবল শান্তিপ্রদ শ্মশান মাত্র দেখিতে পাই বলিয়া গ্রীক বর্ণিত সুবর্ণের আকর গুলিকে স্বপ্নবৎ মনে হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

শরতের চিত্র।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভাবের জগতে মধ্যাহ্ন; মধ্যগগনে সমুদিত সূর্য্য স্বতেজে সহস্রকর বিস্তার পূর্ব্বক করগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প। বৃক্ষলতা সে তেজে ম্রিয়মাণ; পশু পক্ষী গতি-

* বলা বাহুল্য লেখক মূল গ্রীক পড়িয়া এ প্রবন্ধ সংকলন করেন নাই। ইংরাজি অনুবাদ হইতে তিনি তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্পাদক।

হীন শব্দহীন আহারান্বেষণে বিরত থাকিয়া, যে যেখানে একটু ছায়ার আশ্রয় পাইয়াছে, সে সেইখানে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে।

ভাবের কার্য্য চলিতেছে। উপরে অনন্ত আকাশ প্রজ্বলিত করিয়া ঐ তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া, কত শত গ্রহ নক্ষত্র অনবরত ছুটিতেছে। নিঃসাড়—নিঃশব্দ—কিন্তু নিস্পন্দ নয়। ভাবের কার্য্যে শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, নিদ্রা নাই। সেই ভাবময় কর্ম্মময় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তিনটী ভাবের সুস্পষ্ট সত্তা নিরন্তর ভাসমান থাকিয়া, অবিরোধে পরস্পর কার্য্য করিয়া যাই-তেছে। একটি পশুভাব, যাহা ক্রমোন্নতিবিধানে যে যাহার অপেক্ষা শক্তিমান্ সে তাহাকে গ্রাস করিয়া, আত্মপোষণ চরিতার্থ করিতেছে। দ্বিতীয় বীরভাব বা অসুরভাব; সে জড়ত্বের ভিতর দিয়া দৃশ্যমান সুখময় পদার্থের অন্বেষণে স্বীয় বিচারশক্তি ও কার্য্যতৎপরতার সহায়তায়, জাগতিক সর্ব্ব সুখসমষ্টির জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিতেছে। সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, কাহারও মুখাপেক্ষা করে না—আত্মমদে বসুন্ধরা কাঁপাইয়া, বীরদর্পে আস্ফালন করিতেছে।

তৃতীয়টী দিব্যভাব; এখানে জ্ঞানশক্তি ও বিবেকশক্তি একযোগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, সাধারণ কার্য্য সৌকর্য্যের জন্য, কর্ম্মকুশলতা এবং তদভাবে আলস্য বা নিষ্কামতা নিত্য বিরাজ করিতেছে। এই দিব্যভাব সর্ব্ব ভাবের সার বস্তুর মত পশুত্ব ও বীরত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, স্বভাব ও সেভাব সঙ্কলনে, সকলের সামঞ্জস্য সমন্বয়কারী ত্রিভাবের ভাবুক বিরাট পুরুষও কখন কখন স্বভাব সমন্বয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, যখন যখন সেই অসুর ভাব সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া, দিব্য ভাবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। অসুরেরা যখন প্রবল পরাক্রমে দেবতাকে ক্রমাগত নিষ্পীড়ন করিতে থাকে, তখন অন্তরস্থ নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইবার জন্য দেবতারা একতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। সেই একতার অবশ্যম্ভাবী সুফলে সমুদ্বোধিত মহাশক্তি সদর্পে অসুরকে পরাজিত করিয়া, দেবকুল পুনঃ স্থাপিত করেন।

দৃশ্যমান জগতের এই ভাবময় মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান ক্রমোন্নতির পরম উৎকর্ষ-দ্যোতক মহিষাসুর মহা পরাক্রমে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছে। সে প্রবল পরাক্রমে পরাজিত দিব্যভাব সমূহ স্থানচ্যুত হইয়া কে কোথায় পড়িয়াছে ঠিক করা যায় না।

ভয়ঙ্কর রাজা! দুর্ব্বিষহ রাজশক্তি!! নিজ নিজ স্থান স্থির রাখিতে কাহারও শক্তি নাই; সকলেই পদভ্রষ্ট; মাতালের মত ইচ্ছা না থাকিলেও

অন্যের স্কন্ধে হেলিয়া পড়িতেছে। সৌন্দর্য্যরত্নে উজ্জ্বলিত সদ্‌গুণসুশোভিত সকামা স্ব-পত্নী যখন পতি সম্ভাষণে প্রেমময়ী, তখন কোথা হইতে হত্যাকারিণী প্রবৃত্তি আসিয়া, যেন তাহাকে হত্যা করিল। এবং ব্যভিচারিণী যখন পুত্র হত্যাপরাধে যথাযোগ্য দণ্ড প্রাপ্তির আশঙ্কায়, বিচারকের সমক্ষে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে তখন যেন, কেমন করিয়া কামনা আসিয়া তাহাকে বিচারকের অঙ্কে বসাইয়া দিল। এইরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া দেবতারা ভাসিয়া গেলেন, অসুরেরা রাজ্যেশ্বর হইল।

স্বর্গ মর্ত্ত্যে অদম্য সংঘর্ষ; দেবতারা যেখানে শৃঙ্খলা সংস্থাপনে সমুৎসুক, অসুরেরা সেইখানেই বিশৃঙ্খলার জন্য ব্যতিব্যস্ত। যে ভগ্নাংশ দিক্‌পালেরা সংস্কার করিতেছে, অসুরেরা তাহাকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও দিকে দিকে উৎকীর্ণ করিতেছে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—অগ্নির দাহিকা—যমের দণ্ড—বরুণের পাশ—বায়ুর উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুবেরের ধনৈশ্বর্য্য সবই—মহিষাসুর গ্রাস করিয়াছে। উন্নতিশীলের ক্রমোন্নয়নের তীক্ষ্ণতায়, উন্নতের আস্ফালন ক্রমশঃ হাহাকারে পর্য্যবসিত হইতেছে।

উপায় কি? নিষ্কৃতির কোন পন্থা না পাইয়া, স্বীয় শক্তি-পরিচালনায়, ক্রমাগত পরাজিত হইয়া, দিক্‌পালেরা একতা অবলম্বন করিলেন। সকলে যুক্তি সহকারে ব্রহ্মাকে লইয়া সংহারের সহায়তায় স্থিতিস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিষ্ণু ও মহেশের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কেমন করিয়া মহিষাসুর দেবতাদিগকে নিরাশ করিয়াছে, কত অত্যাচার পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রাত-নিয়ত প্রকাশিত হইতেছে, কত অনাচার ধরিত্রীর পবিত্রতাকে দলিত ও কলুষিত করিতেছে, ধীরে ধীরে দেবতারা তাহা বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে শিব-বিষ্ণু-বিধাতার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া, অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই সংক্রামিত-অগ্নিজ্বালা অন্যান্য দেবতারও ক্রোধাগ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া, দেখিতে দেখিতে জ্বালাময় পর্ব্বতের আকৃতি ধারণ করিল। দেবতারা দেখিলেন দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত সেই তেজোরাশি যেন দিক্ সমূহ দগ্ধ করিতে ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে। ক্রমশঃ তাহা একত্র হইয়া, নিমেষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে সুন্দরীর কিরীটে আকাশ ঠেকিয়াছে—পদভরে পৃথিবী কাঁপিতেছে, হুঙ্কারে নাগলোক টলমল করিতেছে। সে রূপের অনলে অসুরকুল পতঙ্গের মত পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; রহিল একমাত্র মহিষাসুর। তাহার আস্ফালন-গর্জ্জন-উল্লম্ফন-প্রকম্পনে দেবতারা শনৈঃ

শনৈঃ মলিন হইতেছেন ;—দেবীরও ক্রোধাগ্নি ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া, মহিষকে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু যাহাকে বিনাশ করিবার জন্য রোষানল প্রজ্বলিত হইতেছে সে কৈ? ও ত' সিংহ; সিংহই বা কোথায়? এ যে দেখি প্রমত্ত হস্তী; শুণ্ডাস্ফালনে বৃংহিত গর্জ্জনে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সেও ত' নাই? আবার যে মহিষ সে মহিষ। এইবার জগজ্জননীর অসিপ্রহারে মহিষাসুরের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইল। কিন্তু ;—কিন্তু একি এ! অর্দ্ধমৃত মহিষাসুরের মধ্য হইতে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !! অর্দ্ধ পুরুষাকারে নূতন রূপের অবতারণা !! তাহাকেও বিধ্বস্ত করিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন।

দেবতারা অবাক্ ;—এ কি হইল !! ইহার অর্থ কি !! এ কেমন নূতন মূর্ত্তি !!—কোথা হইতে অদৃশ্যবাণী দেবতার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ;—"বিস্মিত হইও না ; ত্রিদিববাসিন্! তোমাদের চির শত্রু বিনষ্ট হইল ;—যে মূর্ত্তি দেখিয়াছ, উহা পশুর ক্রমোৎকর্ষ। উহারও পরিণামে হস্ত-পদ বিশিষ্ট মনুষ্য জাতি সৃষ্ট হইবে। সমগ্র শক্তির একত্র সম্মিলনে তাহারা সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। কখন তাহারা দেবতার সহিত বিরোধ করিবেনা ; দেব নরে চির সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু যখন মনুষ্যের ভিতর হইতে এই আদিম পশুত্ব বহির্গত হইয়া, মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে, তখন-তখন আমি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এইরূপে সামঞ্জস্য সমন্বয় করিব।

এখন একবার চাহিয়া দেখ! তোমার চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া যে মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে—আজ আমরা যাঁহার আগমনকল্পনায় সাগ্রহে চিত্রপ্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্য্যে ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতেছি—ঐ-ই সেই মূর্ত্তি। উনিই জগজ্জননী আমাদের আদিপুরুষের সৃষ্টিকর্ত্রী——জাগতিক সর্ব্বভাবসমষ্টির সাম্যসংরক্ষয়িত্রী, সৃষ্টিস্থিতিসংহারের পুঞ্জীভূত শক্তি। ঐ দেখ! আট দিকে আট হাত বিস্তার করিয়া, দিকপালগণকে রক্ষা করিতেছেন, আর দুই হাতে অসুরদলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পদতলে দণ্ডায়মান সিংহরূপী ধর্ম্ম ভাবী মনুষ্যের অসুরস্বরূপ অধর্ম্মকে খণ্ডিত করিতেছে। এবং নাগপাশদণ্ডে তাহাকে বেষ্টন করিয়া স্বায়ত্ত করিতেছে। ভবিষ্য মানবকুলের মঙ্গলের জন্য ঐ দেখ! দক্ষিণে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতি মৃদুমন্দ হাস্যে শুণ্ডাস্ফালন করিতেছে। ওদিকে শিখিবাহনে নবীন বঙ্গযুবকের বিলাসময় সৌমমূর্ত্তির অভ্যন্তরে, ছদ্মবেশে শৌর্য্য,বীর্য্য গুপ্ত রহিয়াছে—ভাল করিয়া দেখ! বীরত্বের পরমোৎকর্ষ কার্ত্তিকের

নিয়তশক্তি-উত্তেজনার জন্য আচ্ছাদিত বহ্নিবৎ বামে বিরাজ করিতেছে। এদিকে ভোগ-সুখ-ধনৈশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমা লক্ষ্মী-দেবী দেবীর দক্ষিণে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করিতেছে। মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয়; তাহাকে সংযত রাখা কঠিন; সে আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বৈরাগ্য সব ভাসিয়া যায়। তাহার তীব্রগতির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ঐ দেখ! দেবীর বামভাগে বিদ্যা জ্ঞান ধর্ম্মের বুদ্ধিসাধিকা সরস্বতী বীণার স্বরে সমগ্র সংসারকে আহ্বান করিতেছেন। এখন ঐ বীরত্ব মর্য্যাদা, ধন ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ভক্তি ও বিবেক বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া, যদি তুমি সমান ভাবে চলিয়া যাও, তবে হে মানব! সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান সর্ব্বভাবের সর্ব্বনিয়মের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের উত্তরতটে অবস্থিত সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরম্পুরুষ প্রত্যক্ষ করিবে।

একতায় উৎপন্ন—একতায় বদ্ধ—একতায় উন্নত ঐ জগজ্জননীকে তিন দিন ধরিয়া পূজা করিয়া, আজ চতুর্থদিনে আমরা তাঁহার প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলাম, চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার করিয়া মা চলিয়া গেলেন।

মা গেলেন; আমরা বৎসরের জন্য মাতৃহারা হইলাম। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, আজিকার মত মাতৃদর্শন প্রবৃত্তি যেন সমান থাকিয়া যায়; মায়ের শিক্ষা যেন হৃদয়ের প্রতি পর্দ্দায় প্রতিধ্বনিত হয়—মায়ের দীক্ষা যেন আমাদের হৃন্মর্ম্মে গুপ্ত থাকিয়া, আমাদের উদ্যম, উৎসাহ ও একতাকে চিরদিনের জন্য জাগাইয়া রাখে। আমরা এত দিনে যাহা বুঝিয়াছি;—আমরা এক মায়ের সন্তান;—আমরা সহোদর—এক মাতৃস্তন্যপায়ী—আমাদের মায়ের উৎপত্তি একতায়—তাঁহার স্থিতি ঐ ঐক্যে—সংরক্ষণবৃত্তি একতারই অন্তর্নিহিত শক্তি—একথা আমরা কখন ভুলিব না।

তবে একবার সকলে সমস্বরে বল ভাই! **বন্দে মাতরম্**; এস! ভাই সকল!! আলিঙ্গন করি; এস বয়োজ্যেষ্ঠ!! প্রণাম করি;—এসো কনিষ্ঠ!! আশীর্ব্বাদ করি। রাশিচক্র ঘুরিতে থাকুক; কাল তাহার প্রতি-নেমিতে পদার্পণ করিয়া পরাবৃত্ত হইতে থাকুক;—দ্বাদশ রাশিচক্রের অতিক্রমে আবার মা'য়ের দর্শন পাইব। তা বলিয়া জননীকে ভুলিয়া কুলাঙ্গার হইব না। বর্ষপরে আবার এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রীর একতাময়ী চিত্র আঁকিয়া উৎসাহ, অধ্যবসায়কে পুনরুত্তেজিত করিব। আশীর্ব্বাদ করি, সুখে স্বচ্ছন্দে বর্ষ পরিবর্ত্তিত হোক্।

এস! পৌরাঙ্গনাগণ!! তোমরা মাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছ, আমরাও তোমাদের অভ্যর্থনা করি। তোমরা গৃহলক্ষ্মী; গৃহের অধিষ্ঠাত্রী;—মায়ের সদ্‌গুণ কন্যায় সংক্রামিত হয়; তোমরা মায়ের অনুকরণে সংসারে স্বর্গসুখের সৃষ্টি কর!! এস প্রণাম-আশীর্ব্বাদে স্নেহ ভক্তি বন্ধনে আমরা ভাই ভগিনী একত্র হই!! সুখে স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত কর!

এস বঙ্গবিধবা! হিন্দুর আদর্শ! একপার্শ্বস্থিত পতিত ধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হিন্দু আচারের মধ্যে পবিত্র ব্রহ্মচারিণি! তুমি যদি না থাকিতে, সংসার ছারখার হইত। আত্মপরিহারিণি! পরসুখে উল্লাসিনি! তুমি বিপদের বন্ধু—অসহায়ের সহায়—পিতৃহীনের পিতা—মাতৃহীনের মা;—তুমি সকলের ভগিনী; তোমার তুল্য গুণবতী এ ভারতে আর কে আছে? রোগীর শয্যাপার্শ্বে তুমি ক্রীতদাসী, যখন যেটী প্রয়োজন অকাতরে সাধন করিতেছ। তুমি বিপন্নের জননী; তোমার তুল্য নিঃস্বার্থ প্রেমময়ী কোথায় পাইব? তুমি বয়োজ্যেষ্ঠাই হও, আর কনিষ্ঠাই হও—তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম!! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাদের প্রতি অবিচলিত ভক্তি থাকে; আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের এ ব্রহ্মচর্য্য অক্ষয় অক্ষুণ্ণ হোক্।

এস, তবে পাঠক! এস শ্রোতৃবর্গ!! আমরাও পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে, সুখসম্মিলনে মিলিত হই। প্রণাম, আশীর্ব্বাদে পরস্পরে সহানুভূতি শিক্ষা করি। রাশিচক্র যে ভাবে পরিবর্ত্তন করে করুক্;—গত বর্ষ-চক্রে যে শোক দুঃখ ভোগ করিয়াছি. তাহাতেই বা দুঃখ কি? যে বিপদ-কালিমা নির্ম্মল অন্তরকে কলুষিত করিয়াছে, তার প্রতিই বা আক্রোশ কি? সেই কু-চক্রীর চক্রে রাশি-চক্র সুখ দুঃখ যাই কেন আমাদের বুকের উপর নিষ্পিষ্ট করুক না, আমরা মায়ের সন্তান; আজ মায়ের সন্তানের মত নির্লিপ্ত থাকিয়া একপ্রাণে সংসারের সকল জ্বালা সহ্য করি। সুখে দুঃখে—বিষাদে বিপদে—যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে "আমরা এক জননীর জরায়ুসম্ভূত"। এস তবে প্রণাম! কোলাকুলি! পুনঃ প্রণাম! আশীর্ব্বাদ কর, দিন যা'ক্! ধৈর্য্য-থাক্'! শান্তি থাকুক্! সিদ্ধি লাভ হোক্!! ওঁ শান্তিরোম্!!!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

রাজা ও রাণী।

নাটক লেখা অতি দুরূহ কার্য্য—একথা সার্ব্বভৌমিক এবং সর্ব্ববাদী-সম্মত। এমন কি আখ্যায়িকা, উপন্যাস প্রভৃতি শ্রব্য-কাব্য লেখার চেয়ে নাটক লেখা শক্ত। কারণ নাটক স্বভাবতঃই কতকটা পরাধীন। নাট্যকার শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে আবদ্ধ—যথেচ্ছাক্রমে আকাশে বিচরণ করিতে অক্ষম। ঔপন্যাসিক যেমন স্বরচিত উপন্যাসের কিয়দংশ ভাব, কিয়দংশ কার্য্য, গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রকাশিত করেন এবং অন্যান্য অংশে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ংই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন; নাট্যকারের অদৃষ্টে তেমন সুযোগ ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। কারণ নাটকের সমস্ত ভাব, সমস্ত কার্য্য, শুদ্ধ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে, উপন্যাসাদি প্রণয়নে প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা অপেক্ষা, এই প্রতিভা অনেকাংশে ন্যূন।

কিন্তু আজ কাল যাঁহারা নাট্যকার হইতেই হইবে, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া নাটক লিখিতে বসেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ নাট্যকারই (?) কথোপকথন-ছলে পুস্তক লেখাকেই নাটকের প্রাণ বলিয়া জানেন। তাহার উপর যদি উহা কবিতা, গীতাদি সম্মিলিত হইয়া এবং অঙ্কে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত হইয়া বিরচিত হয় তবে ত কথাই নাই, সে আর খাঁটি নাটক না হইয়া যায় না!

এমন আনাড়িও অনেক আছেন, যাঁহারা দ্বিজেন বাবুর 'দুর্গাদাসকে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণীকে' মহানাটক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। আমার বোধ হয়, কবি স্বয়ং একথা শুনিলে হয়ত লজ্জিত হইয়া, বলিবেন,—"ভগবান, আমাকে এমন বন্ধুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করুন।"

গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, মুকুল মুঞ্জরা প্রভৃতি কতকগুলি নাটক—খাঁটি নাটক। কারণ উক্ত গ্রন্থগুলি—নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত। এমন কি তাঁহার দুই চারি খানি নাটককে আমরা মহানাটক বলিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'রাজা ও রাণীর' অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে উহা নাটকীয় শরীরধারী মাত্র—নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত নহে। সুতরাং নাটক নহে—নাটকীয় শরীর মাত্র।

বর্ত্তমান গ্রন্থে নানারকম গুণপনা থাকিলেও থাকিতে পারে। কাব্যাংশে

কল্পনাংশে, গদ্য পদ্যাদি ভাষার সংগঠনে, উহা উৎকৃষ্ট গ্রন্থরূপে গণ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু নাটকাংশে—নাটকীয় কার্য্যের নিয়মীকরণের হিসাবে, 'রাজা ও রাণী' কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাই আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। উক্ত গ্রন্থে পাণ্ডিত্য, রুচি, সুবিচার শক্তি, রসিকতা, সূক্ষ্মদর্শন, মানব প্রকৃতিতে জ্ঞান,—এই সকল বিভিন্ন শক্তির কোথায় সংযত ও সামঞ্জস্য ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে কোন্ সাহসে উহাকে নাটক বলিতে সাহসী হও? নাটকীয় ক্ষমতার প্রধান অঙ্গ—চরিত্র চিত্রন। চরিত্র চিত্রনে নাট্যকারের সিদ্ধ হস্ত হওয়া চাই। ইহাতে সেই চরিত্র-বিকাশই ঠিক রূপে হয় নাই। স্বীকার করি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র অঙ্কন করিতে কবিবরের পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্র অঙ্কিত করা এক কথা; আর বিশাল চিত্রপট অঙ্কিত করা, আর এককথা। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত রকমে ব্যর্থপ্রয়াস। এই পুস্তকের মুখ্য চরিত্র বিক্রমদেবকেই দেখিলে সে কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

প্রথম দৃশ্যে বিক্রমদেব ও দেবদত্ত পরস্পরে যখন রমণী চরিত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, সেই সময়ে 'স্তূপাকার রাজ্য ভার স্কন্ধে নিয়ে' মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বিক্রমদেব 'রাণীর রাজত্বে' অর্থাৎ অন্তঃপুরে আশ্রয় লইতে পলায়ন করিলেন। এইখানে আমাদের সীতারামকে মনে পড়ে। তিনিও স্ত্রীর জন্য স্বীয় রাজ্যের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি এইরূপ উদাসীন হইয়াছিলেন। রূপ ভোগ তৃষ্ণাই যেমন সীতারামের পতনের কারণ। বর্ত্তমান গ্রন্থেও কবি সেইরূপ তৃষ্ণাই—ভার্য্যা সম্ভোগের সেই তৃষ্ণাই—বিক্রমদেবের পতনের কারণ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে সীতারামের এই ভোগলিপ্সার কারণ ছিল। কারণ,—সীতারামের সহিত স্ত্রীর বাল্য-সংসর্গ ঘটে নাই। শ্রী হঠাৎ তাহার পরিপূর্ণ যৌবন, অতুল্য রূপরাশি লইয়া সীতারামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শুধু কি ইহাই? তাহার উপর আবার "স্ত্রী বাঘ ছালে বসিয়া বাক্যে মধু বৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী।" দারুণ তৃষায় হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিবে না। সীতারামের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। কারণ

শ্রী ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী। আর এই উভয়ের হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনা-স্রোত তর্ তর্ বেগে বহিয়া গিয়াছে। কোথাও বিন্দুমাত্র বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

কিন্তু বিক্রমদেবের এমন দুর্দ্দশা ঘটিল কেন? তাঁহার সুমিত্রাত শ্রী নহে, আর বিল্ব-ঙ্গলের চিন্তামণিও নহে। তবে তাঁহার এ অধঃপতনের কারণ কি? বিক্রমদেব-সুমিত্রার সংসর্গে বহুকাল কাটাইয়াছেন, বিপদে সম্পদে তাঁহার গুণ বুঝিয়াছেন, সুখ দুঃখের বন্ধনে তাঁহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছেন। আর সুমিত্রাও স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে যে বিদ্যার আবশ্যক,—সে বিদ্যায় অপারদর্শী ছিলেন না। তিনি নিজেই একস্থানে কুমার সেনের নিকট সে কথার পরিচয় দিয়াছেন,—

" নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে;—সন্ধেবেলা:বসে তারে
তোমার মনের মত সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ কাব্যরস।"

আর একস্থলে বিক্রমদেব সুমিত্রার প্রণয় সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন? ... ...
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছল ছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন;
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়!
কোথা ছিল গৃহ কাজ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসার ভাবনা!

সুমিত্রা।—তখন ছিলাম শুধু ছোট
দুটি বালক বালিকা; আজ মোরা রাজরাণী।

বিক্রম।—রাজরাণী! কে রাজা? কে রাণী?
নহি আমি রাজা! শূন্য সিংহাসন কাঁদে!
জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে!

সুমিত্রা।—শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছি ছি মহারাজ,
একি ভালবাসা? ... ...
... ... শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,

তার বেশী নই—আমারে দিওনা লাজ,
আমারে বেসোনা ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!

কিন্তু বিক্রমদেবের ইহাতেও তৃপ্তি নাই। তাঁহার দিবারাত্র ইচ্ছা যে,—

"অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।"

এই বাল্য-সহচরী সুমিত্রার প্রতি বিক্রমদেবের এইরূপ উন্মত্ততা আমাদের নিকট কিরূপ বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই স্থলে মনে হয়, কবি যেন ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া চরিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। Tragedy করিতেই হইবে, এই মনে করিয়া কবি যেন বিক্রমদেবকে জোর জবরদস্তি করিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় লইয়া যাইতেছেন। সত্য সত্যই বিক্রমদেবকে এখানে যেন মনুষ্যত্ব বিহীন পশুবৎ বলিয়া মনে হয়। নতুবা সুমিত্রার মত যাহার সহধর্ম্মিণী তাহার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিবার কি সম্ভাবনা? ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন—

"যোগাসনে লীন যোগীবর—
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?"

বিক্রমদেবের প্রেম যদি এতই গভীর হয়, যদি তিনি এতই আপনা-হারা হইয়া ভালবাসিতে সক্ষম; তবে তিনি ইলাকে দেখিয়া সুমিত্রার উদ্দেশে আবার একথা কেন বলিলেন যে—

যাও তবে! একেবারে চলে যাও দূরে!
জীবনে থেকোনা জেগে অনুতাপরূপে!
দেখা যাক্ যদি এইখানে—সংসারের
নির্জ্জন নেপথ্য দেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর।

ইলাকে সম্বোধন করিয়া আর এক স্থলে বলিতেছেন—

... ... সব শূন্যময়!
রাজ্য ধন না থাকিত যদি—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—"

তাই বলিতেছিলাম, গ্রন্থকার স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু সংযত শক্তির অভাব বশতঃ তাহা নারকীয় চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিক্রমদেব তোতা পাখীর মত যথেষ্ট প্রেমের বুলি কাটিতে পারেন; এবং 'প্রেম' বলিতে বলিতে কামের তাড়নায়ও অধীর হইয়া উঠেন। বিক্রমদেবের চরিত্র প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ অসঙ্গত দোষে দূষিত হইয়াছে।

এইরূপ অতিশয়োক্তি-দোষে ত্রিবেদীর চরিত্রও ফুটিতে পারে নাই। গ্রন্থকার তাহার ভণ্ডামির মাত্রাটা এত অধিক চড়াইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে তাহার চরিত্র নিখুঁত হইতে পারে নাই। ত্রিবেদী যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি আবার মহাভণ্ড। কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলে বুঝা যায়, তাহার ধূর্ত্ততার সহিত তাহার ভণ্ডামির মিশ্‌ খায় নাই। একদিন ত্রিবেদী মালাজপ করিতে করিতে দেবদত্তের নিকট আসিয়া বলিলেন—"তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ ? ... ...তা তুমি মর্‌বে ! হরি হে দীনবন্ধু !"

দেব। ব্রাহ্মণ বাক্য মিথ্যে হবে না—তা আমি মরব। ....

ত্রিবেদী। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেচে ! দয়াময় হরি !

দেব। তা কি করে জান্‌ব ?...আর কিছু প্রয়োজন আছে কি ?

ত্রিবেদী। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়। তা তোমার চালে যদি দু একটা বেশী কুম্‌ড়ো ফলে থাকে ত দিতে পার—আমার দরকার আছে।

দেব। এনে দিচ্চি। (প্রস্থান)

তোমার সম্মুখে তোমার মৃত্যু কামনা করিয়াই তদ্দণ্ডে তোমারি দ্রব্য প্রার্থনা করা—এ নিতান্ত বাড়াবাড়ি নহে কি ? এখানে ত্রিবেদীর ভণ্ডামির উচ্ছ্বাসের বেগে তাহার ধূর্ত্ততা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দেবদত্তের মত বুদ্ধিমান লোকের নিকট এরূপ বাড়াবাড়ি ধরা পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ইহা ত্রিবেদীর মত লোকের জানা উচিত ছিল। তাই বলিতেছিলাম, যে ত্রিবেদী, বিক্রমদেব প্রভৃতি এক একটা আস্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই,—সাংসারিক মানবত্ব ছাড়িয়া দিলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। আর ইহা হইবার পধান কারণ, কবি চরিত্র চিত্রনে, চরিত্র হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারেন না।

শুধু কি তাই ? আর এক বিড়ম্বনার কথা বলি। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত, এবং তাহারি ফলে একটির পর একটি ঘটনা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য ভাবে সংযোজিত হইয়া কাব্যের অঙ্গ সমূহকে পুষ্ট করিতে থাকে—'রাজা ও রাণী'তে তাহার কিছুমাত্র নাই।

আমরা দেখিলাম,—যে যুধাজিৎ ও জয়সেনের অত্যাচারে বিক্রমদেবের রাজ্যে ভীষণ অরাজকতা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, যাহাদের পাপাচরণে রাজ্যে হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া গিয়াছিল, যাহারা এই ভয়ঙ্কর Tragedyর প্রধান উপলক্ষ্য ;—তাহাদের দণ্ড বিধানার্থে যখন রাজা বিক্রমদেব সৈন্য

সামন্ত লইয়া বহির্গত হইলেন, তখন আবার আর একদিক হইতে সুমিত্রা কুমারসেনের সাহায্যে সেই পলাতক রাজদ্রোহীদের বন্দী করিয়া জালন্ধরপতি বিক্রমদেবের শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই সময়ে "রমণীর সনে সাক্ষাতের এ নহে সময়!" এই বলিয়া স্বীয় সেনাপতিকে শিবিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ইহার দুইটি দৃশ্য পরেই দেখিলাম, সেই রাজদ্রোহী যুধাজিৎ ও জয়সেন বিক্রমদেবের শিবিরে বসিয়া তাঁহাকে কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিতেছে। বলিতেছে,—

চল, মহারাজ চল
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাও,—সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।

বিক্রমদেব অমনি বলিলেন,—

তাই চল।

... ...

এই বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীদের সহিত রাজার এই অদ্ভুত মিলন ব্যাপার এবং নির্দ্দোষী কুমারেসন বেচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা, এই সব অভূত-পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিবার কারণ দেখাইবার জন্য, কবি উপরিউক্ত দৃশ্যের পূর্ব্ব দৃশ্যে নারায়ণী ও দেবদত্তকে খাড়া করাইয়া দেবদত্তের দ্বারা ওকালতি করাইয়াছেন।

নারায়ণী বলিল,—হাঁগা, সে কি কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ॥ ... .

অমনি দেবদত্ত নারায়ণীর মত 'ন্যাকা' মেয়ে মানুষকে সব বুঝাইতে বসিলেন। বলিলেন, "বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেচে—মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। এটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কি হতে পারে? এই শুনে মহারাজ আগুন হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্ৎসনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবা পুরুষ, সহ্য করতে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে থাকবে।"

আচ্ছা, তাহাই যেন হইল। মানিয়া লইলাম, 'বন্দী বিদ্রোহীরা' কোন এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বনে রাজাকে উক্তরূপ বুঝাইবার অবসর পাইয়া থাকিবে। কিন্তু বিক্রমদেবের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজা, যিনি চন্দ্রসেন ও রেবতীর

হৃদয়ের 'প্রকৃত মূর্ত্তিখানা' একদণ্ডে চিনিয়া লইয়াছিলেন, যিনি সভাসদগণের 'স্তুতি বৃষ্টি' বুঝিতে এবং উপেক্ষা করিতে সক্ষম, তিনি কিনা যুধাজিৎ ও জয়সেনের মত লোকের উপরি উক্ত রকমের কথা শুনিয়াই গলিয়া গেলেন! এ ক্ষেত্রে বিক্রমদেবকে ফরমায়েশী বোকা ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। এখানে যে শুধু চরিত্র-চিত্রণ দোষ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। এই 'নাটকের' উপন্যাসের বিকাশ ও পরিণতির জন্য উক্তরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের অবতারণা করিতে গিয়া নাটকীয় সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তক—উপন্যাস হইলেও হইতে পারে—নাটক হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। আরব্য উপন্যাসে সহস্রাধিক উপন্যাস আছে—কিন্তু আরব্য উপন্যাস নাটক নহে।

এই 'নাটকে' এমন অনেক গুলি দৃশ্য আছে যাহা অনায়াসে পরিবর্জ্জন করিতে পারা যায়; এবং তাহা করিলে, আমার বিশ্বাস এই পুস্তকের উপাদেয়তা ও গুরুত্ব হ্রাস হয় না, উপরন্তু বৃদ্ধি পায়।

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ, দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, বিক্রমদেব ও তাঁহার সভাসদদিগের কথাবার্ত্তা, কাশ্মীরের হাটে লোক সমাগম প্রভৃতি দৃশ্য গুলি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাই বলিতে ছিলাম, যাঁহারা 'রাজা ও রাণীকে' প্রকৃত নাটক বলেন, সেই সকল নাটকবিদ্‌গণের (?) বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে নাটক কাহাকে বলে, নাটকত্ব কি, তাহা তাঁহারা জানেন না।

যে পুস্তকে ক্রিয়ার, কথার ও হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীয় কার্য্য স্রোত অঙ্কে অঙ্কে অবাধ গতিতে ছুটিয়া থাকে এবং কেবল তাহারই সহায়তায় সমগ্র প্লট ও নাট্য ক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের প্রকৃতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে,—আমি তাহাকেই বলি প্রকৃত নাটক। এবং ইহাকেই বলি নাটকের নাটকত্ব। কিন্তু যাহাতে ক্রিয়ার প্রতিরোধক ও ক্রিয়াবিহীন ভাব এবং ভাবুকতার প্রতিপোষক বাক্য সকল সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—তাহা 'নাটক' নামাঙ্কিত হইলেও যে প্রকৃত নাটক নহে একথা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

"মশাই—সর্ব্বনাশ হয়েছে,"—হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া এই কথা বলিয়া গোপাল নায়েব বসিয়া পড়িল!

জমিদার রাজীবলোচন তখন একটা মখমল-মণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া আলবোলার নলটা মুখে দিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। হঠাৎ গোপালকে ঐ কথা বলিতে শুনিয়া রাজীবলোচন চক্ষু ফিরাইয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে গোপাল!"

গোপাল বুঝিল শশীশেখরের সহিত তাহার বিবাদের প্রতিশোধ লইবার এই উপযুক্ত অবসর। শশীশেখর তাহার অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। একটা অবলা রমণীর উপর সে একবার অত্যাচার করিতে যায়, শশীশেখর তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। তিন চারি বার সে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিয়াছে। গ্রামের মধ্যে জমিদার রাজীবলোচন বড়ই স্বদেশদ্রোহী ছিল এবং শশীশেখর একজন প্রকৃত মাতৃসেবক ছিলেন, সুতরাং এই বিরুদ্ধ মতাবলম্বনের নিমিত্ত শশীশেখরের উপর রাজীবলোচনের অনেক দিন হইতে একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। গোপাল এ সংবাদ জানিত। রাজীবলোচন পূজার সময় বিলাতী চিনি ও কাপড় কিনিবার জন্য গোপালকে ১৫০৲ টাকা প্রদান করে। গোপাল এক ঢিলে দুই পাখি মারিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না সুতরাং সে সেই টাকা আত্মসাৎ করিয়া এবং শশীশেখরকে একটু শিক্ষা দিবার আশায় কহিল—"মশাই সর্ব্বনাশ হয়েছে। দেখুন শশে বাঁড়ুয্যেটার কত স্পর্দ্ধা! আমি আপনার হুকুম মত বিলাতী কাপড় ও চিনি কিন্‌তে গিয়েছিলাম এবং হাটের দোকানদারদের দেশী জিনিষ রাখতে নিষেধ কর্‌তে গিয়েছিলেম, শশে বাঁড়ুয্যে গিয়ে সব দোকান-দারকে বল্‌লে "তোরা যদি দেশী ছাড়া বিদেশী জিনিষ রাখবি,তা'হ'লে তোদের সব জিনিষ পুড়িয়ে দেব।" তারপর মশাই আমি জিনিষ নিয়ে আসছি বেটা সেগুলো সব কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিলে আর আপনাকে ও আমাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল দিলে, বল্‌লে আজ ফিরিঙ্গীর পুষ্যি পুত্তর বেটার কুশপুত্তলিকা দাহ কর্‌ব। বেটার দলে প্রায় ৫০।৬০টা ছোঁড়া আছে,সকলে বন্দে মাতরং করে—"

"বটে বটে এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার অপমান, পাঁড়েজি আবি শশী বাঁড়ুয্যেকো পাকড়কে লে আও।" এই কথা বলিয়া, রাজীবলোচন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হুকুম পাইবামাত্র নেমকের চাকর রঘুনাথ "যো হুকুম" বলিয়া আধুনিক পুলিসের রেগুলেশন লাঠির অনুরূপ একগাছি লগুড় স্কন্ধে দণ্ডায়মান হইল। রাজীবলোচন আরক্তলোচনে তাহার প্রতি কহিল— "কাহে খাড়া হ্যায়"—

রঘু। হুজুর জুড়িদারকো জানেকা হুকুম দি যিয়ে।

রাজীব। কাহে তোম এক আদমী নাহি সকেগা?

রঘু—কাহে নেই সকেগা হুজুর। আল্‌বৎ সকেগা লেকেন একটা বাৎ, ঐ বদমাস আদমী "বন্দে মাতরম্‌" কয়তা, বহুত লেড়কাবি ওস্কো সাথ্ হ্যায়। উপযুক্ত জমিদারের উপযুক্ত নায়েব গোপাল এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বলিল "বেটারা জানে কেবল ডাল রুটীর শ্রাদ্ধ কর্‌তে ও বেটাদের দ্বারা যদি কোন কাজ হয়! চল্ আমিই তোর সঙ্গে যাচ্ছি"। ক্রোধে রাজীবলোচনের চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল শশীশেখরকে পাইলে সে তাহার গোটা মাথাটা চিবাইয়া খাইয়া ফেলে। যখন দেখিল পেয়ারের গোপাল নায়েব রঘুনাথকে লইয়া যাইতেছে তখন রাজীবলোচন গোপালকে কহিল "দেখ গোপাল মতে ডোমকে সঙ্গে লয়ে যাও; রঘুনাথ শশের গলায় গামছা দিয়ে টেনে আন্‌বে আর মতে তার পিঠে জুতো মার্‌তে মার্‌তে আস্‌বে।" গোপাল কহিল—"আপনার কিছুমাত্র বলবার দরকার নাই —যখন আপনার গোপাল স্বয়ং যাচ্ছে তখন সে শশে কেন তার চৌদ্দ পুরুষকে যমের কাছথেকে টেনে বেঁধে নিয়ে আস্‌বে।" এই কথা বলিয়া মহা দম্ভে গোপাল রঘুনাথের সহিত মতের বাটী ছুটিল এবং তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপর জমিদার বাবুর হুকুম বুঝাইয়া বলিল। গোপালের কথা শুনিয়া মতের চক্ষু স্থির হইল! শশীকে সে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত, সে বলিল সে কি রকম কথা বাবু! শশী যে বামুণ তার গায়ে কি করে হাত দেব? গোপাল বলিল, বেটা আমার যুধিষ্ঠির হয়েছেন! বাবুর হুকুম অমান্য কর্‌বি?

মতে।—হুকুম অমান্যি কর্‌ব কেন বাবু তবে শশী বামুণের ছেলে, অতি ভাল লোক, যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ তেমনি স্বভাব, তার উপর আমার—

গো।—চুপ্ রও হারামজাদ! তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। ভাল চাস্ শীঘ্র চল, নইলে তোর রক্ষা থাক্‌বে না।

মতে।—বাবু আমায় মাপ করুন—

গোপাল। পাঁড়ে মতেকে বাঁধ—

গোপালের কথা শেষ না হইতেই মতের চক্ষুদ্বয় বাঘের মত জ্বলিয়া উঠিল

কিন্তু সে সেভাব গোপন রাখিয়া বলিল,—"বাঁধবার আর দরকার কি, আমি আপনিই সঙ্গে যাচ্ছি—"

গোপাল তখন মতেকে একবার কাছারী বাড়ীতে লইয়া না গিয়া,তাহার অবাধ্যতার সমুচিত দণ্ড না দিয়া শশীশেখরের উদ্দেশে গমন করিতে পারিল না।

রাজীবলোচন তখনও কাছারীবাড়ীতে শশীশেখরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মনে মনে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেছিল, এমন সময়ে গোপালকে ফিরিতে দেখিয়া কহিল "কি গোপাল ফিরলে যে? শশে কই?" গোপাল কহিল—"বাবু আপনার মতে ডোম বেটা ভারি অবাধ্য সে যেতে চায় না, বামুণের গায়ে হাত দিতে চায় না, অনেক বুঝাইলাম সে কোন প্রকারেই কথা শুনিতে রাজী নহে—তাকে সঙ্গে এনেছি, যা হুকুম হয়—"

গোপালের কথা শুনিয়া রাজীবলোচনের ক্রোধানলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল! ক্রোধ কম্পিতস্বরে কহিল—"গোপাল তুমি এখনও এর কোনও শাস্তি বিধান করনি? বেটাকে গুণে পঞ্চাশ জুতো লাগাও, তাতে কথা না শুনে ফের পঞ্চাশ—"

মতে ডোম স্বকর্ণে নিজের দণ্ডের কথা শ্রবণ করিল। তাহার বিরাট বপু, সু-উন্নত মস্তক, সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল, ঈষৎ কম্পিত হইল! ভয় নহে, রাগে। তাহার চক্ষু হইতে যেন জলন্ত অগ্নি-শিখা বাহির হইতে লাগিল। তবু সে তাহার মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইল না। সে আজীবন ডাকাতের সর্দ্দারের কাজ করিয়াছে এবং শশীশেখরের চেষ্টাতেই, তাহারই সদুপদেশে সেই জঘন্য বৃত্তি ছাড়িয়া জমিদারের বাটীতে চাকুরি করিতেছে। শশীশেখরকে সে গুরু জ্ঞান করে।

(২)

এক দুই তিন করিয়া পঞ্চাশ ঘা জুতা মতের পৃষ্ঠদেশে পড়িল। মতে ধীর স্থির। সে ইচ্ছা করিলে তদ্দণ্ডেই সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিত; সে এখনও ৫০ পঞ্চাশ জনকে হটাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত সে সে ইচ্ছা দমন করিল। শশীশেখর তাহার গুরু, তাহারই কথায় সে মরে বাঁচে সুতরাং নিজে কোন প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা না করিয়া শশীশেখরের আজ্ঞার অপেক্ষায় রহিল। সুতরাং পঞ্চাশ ঘায়ের পর আরও পঞ্চাশ ঘা খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

এদিকে রাজীবলোচন গোপালকে বলিল—"তুমি রঘুনাথ, আর দুই জন লোককে লইয়া যাও, প্রয়োজন বোধ কর সংবাদ প্রেরণ করিও আমি আরও

পাঁচিশ জন প্রেরণ করিব, যাও বিলম্ব করিও না।" গোপাল তখন পুনরায় বীরদর্পে শশীশেখরের অনুসন্ধানে বাহির হইল এবং তাহার বাটীর সন্নিকটে আসিয়াই দেখিল শশীশেখর স্নান করিয়া ফিরিতেছে। শীকার সম্মুখে দেখিয়াই গোপাল পাইকত্রয়কে শশীশেখরের বাটীর অন্তরালে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া গিয়া শশীশেখরের হস্ত ধারণ করিল। শশীশেখর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাস্যের সহিত অতি বিনম্রস্বরে গোপাল বলিল 'তোমার ভগ্নিপতি রাজীবলোচন রায় তোমাকে ডেকেছেন—'। গোপালের মুখে ঈদৃশ নীচজনোচিত কথা শুনিয়া শশীশেখর কহিল "গোপাল, তুমি কি পাগল হইয়াছ, কি বলছ জ্ঞান নেই—ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের ন্যায় কথা কহিতে হয়, ইতর রাজীবলোচনের কাছে থেকে কি সে কথা ভুলেছ? ছাড়, হাত ছাড়।" এই কথা শুনিয়া গোপাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং নিজের পাদুকা উন্মোচন করিয়া শশীশেখরের পৃষ্ঠদেশে সজোরে বসাইয়া দিল। শশীশেখর এতক্ষণ গোপালকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিল, আর পারিল না, সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া গোপালের গণ্ডদেশে একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল; গোপালের মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। এই ঘটনা দেখিয়া গোপালের অনুচরত্রয় অন্তরাল হইতে সেখানে দ্রুত আসিয়া হঠাৎ শশীশেখরের হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিল। একজন তাহার কর্ণ ধরিয়া চলিল, আর গোপাল স্বয়ং জুতা প্রহার করিতে করিতে তাহাকে কাছারী বাটীতে লইয়া গেল।

গ্রামের মধ্যে এত বড় যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল তাহা একটী মহিলা ব্যতীত আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। নিমেষের মধ্যে কিন্তু এই ঘটনাটী গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কথাটা যুবক সম্প্রদায়েরও কর্ণে পৌঁছিল, তাহারা প্রায় বিংশজন অবিলম্বে এক একটী লাঠি লইয়া কাছারী বাটী অভিমুখে প্রধাবিত হইল।

(৩)

জমিদার বাটীর প্রাঙ্গণের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। চারি জন ভোজপুরী দ্বারবান ভিতরদিকে পায়চারী করিয়া পাহারা দিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজীবলোচন স্বয়ং দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দুক্রে মতে ডোম। ইতিমধ্যে গোপাল শশীশেখরকে লইয়া আসিয়া সদন্তে রাজীবলোচনকে কহিল "দেখুন, বেটার স্পর্দ্ধাটা! আপনার নাম করে আসবার জন্য বলায় আমার মুখে এক মুষ্ট্যাঘাত করেছে আর যা মুখে এসেছে তাই বলে অকথ্য ভাষায় আপনাকে ও আমাকে

গালি দিয়াছে।" রাজীবলোচন ক্রোধ কম্পিতস্বরে আরক্তলোচনে শশীশেখরকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"শশে তোর তেজ বড় বেশী হয়েছে দেখছি! আমি বিলাতী জিনিষ নিতে পাঠিয়েছি তুই সেগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছিস্, গোপালকে মেরেছিস্—আমাকে গালি দিয়েছিস্—তোর মুখে জুতো—"শশীশেখর এই প্রকার ইতরজনোচিত সম্ভাষণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"সাবধান, রাজীবলোচন সাবধান! তুই ভদ্রসন্তান, ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রলোকের মত কথা ক'—নইলে তোর কোন কথার উত্তর পাবি না।" রাজীবলোচন ভাবিতেছিল যে শশীশেখর না জানি তাহার কত তোষামোদ, কত মিনতি করিবে, কিন্তু যখন দেখিল শশীশেখর তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিতান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণার সহিত তাহার সহিত কথা কহিল,তখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না, ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিল—"কে আছিস্‌রে পঞ্চাশ জুতো গুণে লাগাও, বুকে বাঁশ দিয়ে দলো—" হুকুম শেষ হইতে না হইতে একটী লোক জুতা এবং অপর দুইজন একটা বংশখণ্ড লইয়া আসিল। শশীশেখরের হস্ত পদ আবদ্ধ, সে কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল মাত্র একবার ঊর্দ্ধ দেশে দৃষ্টিপাত করিল, ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করিল। ভগবান বোধ হয় তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। মতে ডোম এতক্ষণ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ঘটনা দেখিতেছিল, এক্ষণে তাহার সম্মুখে তাহার গুরুদেবের অবমাননা হইবে এই ভাবিয়া সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাপুরুষ রঘুনাথকে এবং অপর দুইটা লোককে এক এক পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিল। ঠিক সেই সময়ে সেই পতনের শব্দের সহিত মলিত হইয়া কোথা হইতে শব্দ হইল "বন্দে মাতরম্"। মতে দেখিল বহির্দ্দেশে, ফটকের বাহিরে বিংশ জন যুবক লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান।

রাজীবলোচন পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে শশীশেখরকে ধরিতে হইলে তাহার সহিত একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্ন হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রামের চতুর্দ্দিক হইতে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল জোগাড় করিয়াছিল তাহারা হুকুমের অপেক্ষায় প্রাঙ্গণের একধারে লাঠি হস্তে সসজ্জিত ছিল।

যখন রাজীবলোচন দেখিল মতে ডোম তাহার তিন ভৃত্যকে পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিল, যখন দেখিল ফটকের পার্শ্বে প্রায় বিংশতি জন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া ফটকের দ্বার উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন সে তাহার বল ভরসা Reserved force লাঠিয়ালদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল "লাগাও"।

হুকুম পাইবামাত্র লাঠিয়ালদল মহাশব্দ করিতে করিতে লাঠি হস্তে ছুটিয়া

আসিল। শশীশেখরের বুকে 'দলিবার' জন্য যে বংশখণ্ড আনীত হইয়াছিল, মতে ডোম তাহা ছিনাইয়া লইয়া তাহার চিরপ্রিয় কণ্ঠে 'জয় মা কালী" শব্দ করিয়া ভীম দর্পে দাঁড়াইয়া লাঠিয়াল ও দারোয়ানদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"সাবধান কেউ আর একবার পা এগুদ্ নি—নইলে সব বেটার মাথা নেব।" মুসলমান লাঠিয়ালদল মতের পরুষ কণ্ঠ শ্রবণ করিয়া একবার দাঁড়াইল, একবার ইতস্ততঃ করিয়া ভাবিল, একটা লোকের বিপক্ষে আমরা এত গুলো লোক কিছু করতে পারব না! পরে কোন কথা না বলিয়া লাঠি উত্তোলন করিয়া মতেকে প্রহার করিতে ছুটিল।

মতে ইতিমধ্যে যুবক সম্প্রদায়ের নিকট একগাছি লাঠি ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক ভীম মূর্ত্তিতে লাঠিয়ালদলের সম্মুখীন হইল এবং তাহার চির অভ্যস্ত অপূর্ব্ব কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে এক এক জনকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল।

যুবক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে ফটক উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ভীম নাদে হাঁকিল 'বন্দে মাতরম্।' মতে ডোম সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে হাঁকিল 'বন্দে মাতরম্।' কণ্ঠে কণ্ঠে মিশিল, প্রাণে প্রাণে মিশিল! যুবক সম্প্রদায় এইবার লাঠি হস্তে লাঠিয়ালদিগের দিকে ধাবমান হইল, মতে ডোম তখন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিল—"আপনাদের আর এদিকে আসিবার প্রয়োজন নাই, আমি একাই এদিকে থাকি, আপনারা ঐ কুলাঙ্গার দুটাকে ধরুন।"

যুবক সম্প্রদায় কিন্তু মতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া লাঠিয়ালদলকে প্রহার করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন রাজীবলোচন ও গোপালকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। যুদ্ধের ফলাফলে তিনটী যুবক এবং লাঠিয়াল দলের মধ্যে অনেকেই অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৪)

এইখানেই ঘটনাটীর যবনিকা পড়ে নাই। দাঙ্গা শেষ হইবার পূর্ব্বেই থানা হইতে একজন দারোগা জনকয়েক চৌকিদার লইয়া আসিয়া যুবক সম্প্রদায়ের সকলকে গ্রেপ্তার করিল এবং রাজীবলোচনের বন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাকে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি।" রাজীবলোচন তখন তাহাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া কি প্রত্যুত্তর দিল সেই বলিতে পারে, ফলে দারোগাটী যুবক সম্প্রদায়ের সকলকে হাতকড়ি দিয়া থানায় লইয়া গেল।

* * * * * *

তারপর বিচার। আদালত এবং আইনকে ফাঁকি দিবার কাহারও

সাধ্য নাই। বিচার, অবিচার বা অত্যাচারের নামান্তর কিম্বা অন্য যাহাই হউক না কেন, একটা গণ্ডগোল হইলে বিচার করিতেই হইবে, এক্ষেত্রেও সে সনাতন প্রথার প্রত্যবায় ঘটে নাই। বিলাতী দ্রব্যগুলি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া নষ্ট করা এবং রাজীবলোচনের বাটীতে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক দাঙ্গা হাঙ্গামা করার নিমিত্ত শশীশেখরের ছয় মাস কারাদণ্ডাদেশ হইল এবং তাহার অনুচরবর্গের অর্থদণ্ড হইল। নিরপরাধী রাজীবলোচন ও গোপাল সবান্ধবে বেকসুর খালাস পাইল!

শশীশেখর আদালতের ন্যায় বিচারে বিমুগ্ধ হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ যোড় করে প্রার্থনা করিল—'হে ভগবান, দিন দিন যেন এইরূপ বিচারেরই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইব—তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানশচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে।'

*　　*　　*　　*　　*

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অদ্য রাত্রে শশীশেখর গ্রামে আসিতেছে। শ্রীবল্লভপুর আজ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। গ্রামের সমস্ত পথে চাদর বিস্তৃত করা হইয়াছে। পথ পার্শ্বস্থ অট্টালিকাশ্রেণী নানা প্রকার পত্র, ফুল ও অসংখ্য প্রদীপের আলোকে সুশোভিত। প্রায় দেড় শত জন স্বেচ্ছা সেবক এবং গ্রাম গ্রামান্তর হইতে বহু লোক শশীশেখরকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ এবং কুল মহিলার সুমঙ্গল শঙ্খ নিনাদে গ্রামখানি মুখরিত। শশীশেখর গ্রামে প্রবেশ করিয়াই সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহার জন্য অভ্যর্থনার যে আয়োজন হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তিনি অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "আপনারা আমার জন্য যেরূপ অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, আমি এরূপ সম্মানের কণামাত্র পাইবারও যোগ্য নহি। তত্রাচ যখন আপনারা একজন ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তির জন্যও এরূপ বিশাল আয়োজন করিয়াছেন তখন ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আমাদের মাতৃপূজার বোধন বসিয়াছে; ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও আমরা সকলে পরস্পরকে ভ্রাতৃজ্ঞান করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আসুন আমরা সকলে মিলিয়া এক প্রাণে মাতৃপূজা আরম্ভ করি। মার আশীর্ব্বাদে আমাদের মঙ্গল হইবে।" শশীশেখরের কথা শেষ হইতে না হইতে চতুর্দ্দিক হইতে বন্দে

মাতরম্ ধ্বনি উত্থিত হইল। এই শব্দ শূন্যে মিশাইতে না মিশাইতে একটী লোক ত্বরিত গতিতে ভীড় অতিক্রম করিয়া শশীশেখরের নিকট আসিয়া তাহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"শশীশেখর আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"—শশীশেখর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, আমার কাছেই বা আপনার অপরাধ কি ? "আমায় চিন্তে পারছ না শশীশেখর ! তা না পারবারই কথা ; আমি কাক হয়ে ময়ূরদলে মিশতে গিয়েছিলাম, আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে—এখন কিন্তু আমি বিদেশী খোলস ছেড়ে মায়ের কোলে এসে বসেছি—এস রক্ষা কর—বন্দে মাতরম্"—এই কথা বলিয়া লোকটা বসিয়া পড়িল। শশীশেখর তাহাকে তুলিয়া লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। মতে ডোম তখন শশীশেখরকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"গুরুদেব ! আপনি এঁকে চিন্তে পারছেন না, ইনিই আমাদের জমিদার রাজীবলোচন।"

শশীশেখর—"কি বল্‌লে রাজীবলোচন ! তার কিসে এ দশা হল ?"

মতে ডোম।—আপনি জেলে যাবার পর গ্রামস্থ সব লোকে রাজীবলোচন ও গোপালকে 'এক ঘরে' করে। রাজীবলোচন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দেশী সঙ্গ ছেড়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মেশে—দিন কতক খুব আমোদে কাটালে তারপর একটা ফিরিঙ্গী, বাবুর নামে এই বলে একটা মিথ্যা নালিশ করলে যে, তিনি তাদের একটা মেয়ের উপর অত্যাচার কর্‌তে গিয়েছিলেন—সেই মোকর্দ্দমায় বাবু আমাদের হাজার হাজার টাকা খরচা করে ঘর বাড়ী জমিদারী সব বাঁধা দিয়ে, বড় বড় ব্যারিষ্টার আনিয়ে অনেক কষ্টে রক্ষে পান। এই মোটে পাঁচ ছয় দিন হ'ল ছাড়ান পেয়েছেন।—আজ আবার তাঁর একমাত্র ছেলে নরেনের কলেরা হয়েছে, ডাক্তার ডাক্‌তে গেল, ডাক্তার 'এক ঘরের' বাড়ীতে আসিতে চাহে না। এদিকে আবার গোপাল পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী !

"ধন্য জগদীশ্বর ! তোমার রাজত্বে বিচার নাই কে বলিল ?" এই কথা বলিয়া শশীশেখর গ্রামের সমস্ত সমাজপতিদিগের মত লইয়া রাজীবলোচনকে আবার সমাজে গ্রহণ করিল, এবং তাহার পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

রাজীবলোচন তাহার শত্রুর হস্তে এইরূপ ব্যবহার পাইয়া কেবলমাত্র অস্ফুটস্বরে কহিল—বন্দে মাতরম্ !

কবিতা-কুঞ্জ।

হিংসা।

ক্রূর দৃষ্টি বক্র আঁখি পরশ্রীকাতর!
সর্ব্বনাশী মন্ত্র সদা জপিছ বিরলে—
বিষণ্ণ বদন তব ব্যথিত অন্তর
হেরিলে পরের শুভ মর্ম্মস্থল জ্বলে।
বিধাতা সৃজনে যত মহান্ সুন্দর
অশান্তি দানিছে শুধু তব ঘৃণ্য মনে!
ধরাতলে যত পাপ, আশ্রিত কিঙ্কর—
আদেশে ফিরিছে হিংসা! তোমার ছলনে।

ঐ যে ভীষণ ফণী ফণা উত্তোলিয়া
ভাবিতেছে ক্রূরমনে দংশিবে কাহায়!
ওইখানে প্রতিকৃতি দেয় নিরখিয়া।
কিম্বা তুমি ক্রূরতর বিষদন্ত যায়,
উড়ে মাত্র প্রাণপাখী। হিংসায় জ্বলিয়া
ইহকাল পরকাল সকলি যে যায়!

মদ।

গরবে ঘূর্ণিত চক্ষু স্ফীত কলেবর!
ধরাতল অতি ক্ষুদ্র তোমার নয়নে
অবহেলি সর্ব্ব সৃষ্টি বিশ্ব চরাচর
তমোময় বক্ররেখা অঙ্কিত বদনে!
কি ঘৃণ্য তৃপ্তির সহ আত্ম আড়ম্বর
চিন্তিতেছ অহরহঃ! সদা রাজে মনে
ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা স্বীয়—সুমেধা প্রখর
পূর্ণিত হৃদয় তব স্বীয় গুণগানে!

অতিক্ষুদ্র ভেক সম আপন বিবরে
আত্ম পূজা মহাধূমে কর উদ্যাপন।
রে মূঢ় ঘৃণিত বৃত্তি! পড়ি তোর করে
তুচ্ছ নর—বিধাতার অনন্ত সৃজন—
চাহেনা হেরিতে চক্ষে মদ গর্ব্ব ভরে!
পতনের মূল তুমি বিনাশ কারণ!

ক্রোধ।

কপালে ভ্রুকুটি রেখা দংশিত অধর
প্রতিশিরা উপশিরা সবেগ চঞ্চল
প্রকটিছে তব রূপ বৃত্তি ভয়ঙ্কর!
যথা ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত ঝটিকা প্রবল
আলোড়ি প্রকৃতি বক্ষ কাঁপায়ে অম্বর
প্রকাশে ভীষণ দৃশ্য বেষ্টি ধরাতল
তেমতি তুমিও ক্রোধ। অরাতি প্রখর
বিনাশিতে শান্তি প্রেম স্নিগ্ধ সুশীতল!

চিরবৈরী মানবের! তব আগমনে
পুষ্পিত শ্যামল কুঞ্জে উঠে হাহাকার!
আত্মহত্যা নরহত্যা বিনাশে মরণে
উন্মত্ত তাণ্ডব খেলা অশেষ প্রকার!
শান্তি পথে তুমি দ্বারী যুঝ প্রাণপণে
পশুর অধম নর তব শরণে!

মোহ।

সুন্দর তোমার রূপ অতীব মোহন
তোমাতে সৌন্দর্য্য ছাড়া কিছু নাহি আর
মায়াবী শিশুর মুখ কামিনী আনন
রমণীয় কমনীয় আনন তোমার
রাজপূজা নিশিদিন সমস্ত সৃজন
দিতেছে তোমারে মোহ! ক্ষমতা অপার
মানব হৃদয়মূলে মহাবলীয়ান
অবারিত, অকুণ্ঠিত শাসন তোমার!

কিন্তু তবু বৃত্তি তুমি রিপু অবতার!
ফেলিয়া মোহিনী ফাঁদে মোহ ছলনায়—
এমন ভুলাতে নরে কিছু নাহি আর—
বিভোর উন্মাদ হৃদি তব ভাবনায়—
উপেক্ষিত, দূরে কাঁদে কর্ত্তব্যের ভার!
অন্তিমেও তব ডোরে নাহি পরিহার!

শ্রীউমাচরণ ধর।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মুক্তি।

আজি এই মহাদুর্দ্দিনে বাঙ্গালার আবার একটি উজ্জ্বল স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক সহসা দীপ্তি হীন হইল। স্বল্প কাল হইল, বিশারদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে শোক শমিত না হইতেই উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সেই পথের পথিক হইলেন। যাহা গেল, তাহা বহু মূল্যবান; ক্ষতি পূরণের আশা অল্প।

তেজস্বী, কর্ম্মবীর, 'সন্ধ্যার' সর্ব্বস্ব, নব ভাবের পুরোহিত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব রবিবার ১০ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্ন নয় ঘটিকার সময় ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে উপাধ্যায় "রোগ শুষ্ক নয়নযুগল অপূর্ব্ব দীপ্তিময় করিয়া" তাঁহার কোনও বন্ধুকে বলিয়াছিলেন,—"আমি ফিরিঙ্গীর জেলে গিয়া কয়েদীর মত খাটিব না। চিরজীবন একভাবে কাটাইয়াছি। আজ আইনের দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে, আর আমি বেগার খাটিব? আমি ফিরিঙ্গীর জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।" পরদিন প্রভাতে তাহাই হইল! তিনি যেন ভীষ্মের মত স্বেচ্ছায় মৃত্যুদেবতাকে বরণ করিয়া লইলেন! তাই 'সন্ধ্যা'র লেখক লিখিয়াছেন,—"ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ,—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু,—ইহাই কর্ম্মবীরের অবসান।" আজ বঙ্গবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে সেই মহাপ্রাণ সাধকের অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাই হাহাকার! আমরা কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে আজ তাঁহার জন্য শোক করিব না। তাঁহাকে যে ফিরিঙ্গীর কারাগারে দেখিতে হইল না—তাহাই আমাদের সান্ত্বনা। তাঁহাকে হারাইয়াছি বটে কিন্তু তাঁহার মন্ত্র যাহা বাঙ্গালীর কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহা কে ভুলিবে? তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বীয় প্রাণ রশ্মির যে উজ্জ্বল কণা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন—তাহা নির্ব্বাপিত করে কাহার সাধ্য! তবে দুঃখ কেন? ফিরিঙ্গীর কারাগার—তাহাই মৃত্যু। এ ত মৃত্যু নয়, এ যে জীবন। তাই বলিতেছি, এস বঙ্গবাসি! আনন্দাশ্রু ধারায় শোকের চিতা নির্ব্বাপিত করি। আর প্রতি হৃদয়ে সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি। তাহা হইলেই স্বাধীন আত্মার তৃপ্তি সাধন হইবে। আর তাহাই প্রকৃত তর্পণ।

রামায়ণ।

আদিকবি বাল্মীকির সময় নির্ণয়।

এ দেশের জনসাধারণের ধারণা এই যে, পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহা মানিয়া গিয়াছেন ও যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, আপনার বুদ্ধি চালনা না করিয়া ও মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত না করিয়া জড়, মূর্খ ও মূক ব্যক্তির ন্যায় বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহাতেই বিশ্বাস সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য ; সে বিষয়ে কখনই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা উচিত নয়। ইহা যে কতদূর অজ্ঞতা, অহর্ম্মুখিতা ও মূঢ়তার পরিচায়ক, তাহা সামান্য বুদ্ধিরও সুদূরব্যবহিত নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা সহকারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান ও পরীক্ষিত হইবে তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য। সত্য নির্ণয় করিতে হইলে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। অজ্ঞাত সত্য অনুসন্ধানে বুদ্ধি নিয়োজিত করিতে হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তি আত্মসাহায্যে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সত্য বলিয়া তাহা প্রতীয়মান না হইলে আমরা সে বিষয় কখনই অনুমোদন করিতে পারিনা। আর নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়া বিবেচনা না করিলে, কোন বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপিত হয় না, কারণ কুসংস্কার বা পূর্ব্বসংস্কার মনোমধ্যে নিহিত ও জাগরুক থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুরিত হয় না ; সুতরাং বিবেকশক্তিরও হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং কোন বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই সে বিষয়ের যাহা কিছু পূর্ব্বসংস্কার আছে, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত, নচেৎ আবশ্যকীয় ফল লাভ করা কখনই সম্ভবপর নয়। বাল্মীকি রচিত রামায়ণ বিষয়ক তথ্য নিরাকরণ করণার্থ এই মুখবন্ধের অবতারণা।

হিন্দুমাত্রেই রামায়ণোল্লিখিত ঘটনাবলী বিশদরূপে জ্ঞাত আছেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং সিন্ধুদেশ হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষের এমন কোন হিন্দু নাই, যিনি সীতাহরণ বা রামরাবণের যুদ্ধের বিষয় অবগত নহেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের কথা দূরে থাকুক, অশিক্ষিত ব্যক্তিও স্ত্রীলোকগণও অপরের নিকট রামায়ণের ঘটনা শুনিয়া ইহার উপন্যাস ভাগটী আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে অপরের নিকট তাহা গল্পচ্ছলে বলিতে পারে।

রামায়ণ আপামর সাধারণের নিকট এতদূর আদরণীয় কেন হইল এবং কেনই বা জনসাধারণের এতদূর সুপরিজ্ঞাত হইল, ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ আছে। বোধ হয় রামায়ণের তুল্য অপর কোন পঠনীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র হিন্দুদের নাই যাহাতে লোকের এরূপ সহৃদয়তা দৃষ্ট হয়। ইহার উপাখ্যান পড়িয়া হর্ষ, ভক্তি, করুণা, বীভৎস, ক্রোধ ইত্যাদি মনোমধ্যে যুগপৎ আবির্ভাব হয়। সেই জন্যই বা অন্যান্য কারণে ইহা এতদূর আদরের ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রামায়ণ বাল্মীকি নামক কবির একমাত্র গ্রন্থ। তাঁহার রচিত আর কোন গ্রন্থ আছে কিনা প্রকাশ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা হিন্দুশা-স্ত্রবারিধি আলোড়ন করিয়া যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাল্মীকি আর কোন গ্রন্থ প্রকটন করেন নাই। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া কীর্ত্তিবাস নামক জনৈক কবি বাঙ্গালা ভাষায় এক-রামায়ণ পদ্যে রচনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, রামায়ণ প্রণেতা একজন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তিনি তপোবলে যে ৬০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, যে বিষ্ণু অবতার রাম দশরথের ঔরসে ও কৌশল্যার গর্ভে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশ সাধন করিবেন। ইহা কতদূর সত্য,তাহা মূল রামায়ণ পাঠকমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। মূল গ্রন্থের কোন স্থলেই এ কথা দৃষ্ট হয় না বা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ইহা, কীর্ত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত। কীর্ত্তিবাসের এইরূপ রেখায় সর্ব্বসাধারণের স্থির ও অটল বিশ্বাস। কারণ এদেশে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই এবং পূর্ব্বপুরুষানুমোদিত বিষয়ে বিশ্বাসী ও অনুমোদনকারী কুসংস্কার ও পূর্ব্বসংস্কারপূর্ণ মূর্খ লোকেরও অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা যে কীর্ত্তিবাসের সে কথায় বিশ্বাস সংস্থাপন করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নয়। যদি তাঁহাদিগকে কেহ বলে যে ইহা কীর্ত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত, মূল গ্রন্থে এরূপ নাই,তাহাকে তাঁহারা উপহাস করেন ও হয়ত তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। সে যাহা হুউক, আমরা প্রমাণ করিব, যে রাম জন্মগ্রহণের ৬০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন একথা মূল গ্রন্থে নাই।

বাল্মীকি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বা ভূতলে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত দেখিতে পাওয়া

যায়, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বাল্মীকির জন্মলগ্ন বা তাঁহার অভ্যুদয় কাল কেহই এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে সমর্থ হন নাই, এবং স্থির না হইবার বিশেষ প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারত যখন সভ্যতার প্রখর জ্যোতিতে পূর্ণ আলোকিত, যখন ভারতের সাহিত্য জগতে কবি, দার্শনিক, আলঙ্কারিক, জ্যোতির্ব্বিৎ, আয়ুর্ব্বেদবিৎ, স্থপতিবিদ্যাবিৎ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বিরাজিত, যখন বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চায় ভারত পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় এবং তদ্দ্বারা মহোত্তর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন তখন অন্যান্য দেশ সকল অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। তখন তাহাদের সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিহাস নামধেয় কোন শাস্ত্র প্রসূত হয় নাই। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্ম, অভ্যুদয়, কীর্ত্তিকলাপ, মৃত্যু, জীবনের প্রধান বা বিশেষ কোন ঘটনা, বা জীবিতাবস্থায় তাহার অন্যান্য কার্য্য পরম্পরা লিপিবদ্ধ হয় নাই। সেরূপ কোন প্রকার বিবরণ আমাদের গোচরীভূত হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের ঘোরতর বিদ্বেষী বিষম অত্যাচারী পাষণ্ড পশুবৎ বিবেকবিহীন মুসলমান ভূপতিদের শাসনকালে অগণন রাশি রাশি হিন্দুশাস্ত্র ধ্বংস হইয়াছে। তাঁহারাই সেই রত্নাকরোদ্ভূত রত্নবৎ অমূল্য নিধি সকল নষ্ট করিয়াছেন এবং এক্ষণে তাহাদের পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যখন ইতিহাস নাই, তখন বাল্মীকির জীবন বৃত্তান্ত বা তাঁহার জীবন ঘটিত কার্য্যাবলী প্রভৃতি নিরূপিত হইতে পারে না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এবিষয়ে নিরস্ত থাকাই একান্ত উচিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দেখিয়া ইহার সমালোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা যে তাঁহার জন্মলগ্ন বা তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী নিরূপণ করিতে সক্ষম হইব, এরূপ স্পর্দ্ধা করি না। উপরে বলা হইয়াছে যে ভারতীয় সাহিত্য জগতে ইতিহাস নাই, কিন্তু কোন কোন কাব্য মধ্যে ইহার কণামাত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু সেই ঐতিহাসিক কণা কবির মস্তিষ্ক আলোড়িত কাল্পনিক বর্ণনার সহিত এতদূরদৃঢ় সংশ্লিষ্ট, যে তাহা হইতে যথার্থ ঘটনা নির্ব্বাচন করা দুরূহ। কিন্তু লিখিত ভাষায়, রচনার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, জটিলতা ও প্রাঞ্জলতা, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় মানবের মনোবৃত্তি এবং গ্রন্থকর্ত্তার ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অভিমত প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে কোন কাব্য কাহার পূর্ব্বে বা কাহার পরে রচিত হইয়াছে তাহা অনুমিত হইতে পারে। এই উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি কোন সময়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ রামায়ণ রচনা করেন তাহা বলা যাইতে পারে।

এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক বা মন্ত প্রলাপ হইবেনা যে, এদেশীয় বিদুষীগণ প্রত্নতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতেন না সুতরাং পুরাতন ও অতীত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহে তাঁহাদের দ্বারা কোন সাহায্য পাইবার আশা নাই। ইউরোপীয় বিদুষীগণ প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে ও সংগ্রহে তৎপর, যত্নশীল ও বিশেষ উদ্যোগী। তাঁহারা ভারতের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া যে পরিশ্রম অধ্যবসায় ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় উচ্চাসন প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া এদেশীয় বর্ত্তমান কৃতবিদ্য ও বিদুষীগণ, প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে ও সংগ্রহে যত্নশীল হইয়াছেন। এক্ষণে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বাল্মীকি ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সংকলন করিয়া আমরা এই সন্দর্ভে বিনিবেশ করিব এবং তাহা সমালোচনা করিয়া তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে বাল্মীকি কোন্ সময়ে ভূতলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সেই সকল মত ক্রমে ক্রমে বিবৃত করা হইতেছে। টেলবইস হুইলার তাঁহার রচিত ভারতের ইতিহাসে বলেন, যে বাল্মীকি খৃষ্টাব্দের ৮০০ বৎসর পরে রামায়ণ রচনা করেন। ইহাঁর মত আমরা অনুমোদন করিতে পারিনা। তিনি বলেন রামায়ণ মহাভারতের পর প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্ব্বে রামায়ণ পর্ব্ব বলিয়া কোন পর্ব্বের উল্লেখ কখনই হইত না এবং পুস্তকদ্বয় পাঠ করিলে রামায়ণোল্লিখিত বীর বা বংশের পুত্র, পৌত্রাদি অবরোহ প্রণালীক্রমে মহাভারতে কখনই উল্লিখিত হইত না। আরও ইহাও বিশেষরূপ বিবেচ্য যে রামায়ণের ভাষা অতি প্রাঞ্জল অতিরঞ্জিত বা জটীল নহে। উহা নিশ্চয়ই সমাজের আদিম অবস্থায় লিখিত। ভাষার গঠন ও আকার সামান্য, অবিমিশ্র ও সহজ বোধগম্য। মহাভারতের ভাষা তদপেক্ষা উন্নতিশীল জটীল ও উহার মত সহজে বোধগম্য নহে। সুতরাং রামায়ণ যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। উহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কবিতা সৃষ্টির প্রাক্কালেই উহা রচিত হইয়াছে। এবং বাল্মীকিকে সকলেই সমস্বরে আদিকবি বলিয়া থাকে। সুতরাং হুইলার সাহেবের এই অনুমান যে ভ্রমমূলক তাহাতে আর সংশয় কি?

বলিয়া থাকে। সুতরাং হুইলার সাহেবের এই অনুমান যে ভ্রমমূলক তাহাতে আর সংশয় কি ?

বুকনান (Buchnan) সাহেব বলেন যে, খৃষ্টাব্দের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। ইনি যে বাল্মীকির সময় ঠিক নিরূপণ করিয়াছেন তাহার নিশ্চয়তা কি ? তিনি খৃষ্টীয়ান। তাঁহার ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেলে লিখিত আছে যে, খৃষ্টাব্দের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি। সুতরাং তাঁহাকে সেই পক্ষ সমর্থন করিয়া বাল্মীকির সময় নিরূপণ করিতে হইয়াছিল সুতরাং তাহাতে তাঁহার অপরাধ নাই।

সার উইলিয়ম জোন্‌স্ (Sir William Jones) অনুমান করেন রামচন্দ্র খৃষ্টাব্দের ২০২৯ বৎসর পূর্ব্বে ভূতলে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে বাল্মীকি তৎসাময়িক লোক বলিয়া, তিনিও ঐ সময়ে ভূতলে উপস্থিত ছিলেন। জোন্‌স্ সাহেব কি প্রকারে এই অসঙ্গত ও বিসদৃশ অনুমান করেন তাহা নির্দ্দেশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ব নহে।

বেণ্টলী (Bentley) বলেন খৃষ্টাব্দের ৯৫০ বৎসর পূর্ব্বে, এবং কর্ণেল টড (Col. Todd) বলেন খৃষ্টাব্দের ১১০ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মতের প্রমাণাভাব। সুতরাং তাহার পোষকতা করিতে পারা যায় না।

মেজর ফর্ব্বস (Major Forbes) বলেন * শ্রীলঙ্কাপুরের অধীশ্বর রাবণ খৃষ্টাব্দের ২৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে রাম কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। কারণ সিংহলের ইতিহাস রাজাবলীতে লিখিত আছে, বৌদ্ধাব্দের ১৮৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়। কিন্তু খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধাব্দ প্রচলিত হয়। সুতরাং খৃষ্টাব্দের (১৮৪৪+৫৪৩) অর্থাৎ ২৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হইয়াছিল। বাল্মীকি তৎসাময়িক বলিয়া তিনিও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা ফর্ব্বসের মত অনুমোদন করিতে পারি না।

কেহ কেহ খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দকে বাল্মীকির সময় বলিয়া নিরূপণ করেন। তাঁহারা রামচন্দ্র ও সুমিত্রের মধ্যবর্ত্তী ৫০ জন নৃপতির রাজত্বকাল

* See Eleven Years in Ceylon by Major Forbes 78 Highlanders London 1870.

গড়ে ২৪ বৎসর পরিগণিত করিয়া এই সময় নির্ণয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাও আনুমানিক।

এক্ষণে এ সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহার মত কতদূর সঙ্গত, তাহাও নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা বলিয়া সূক্ষ্মরূপে অব্দ, মাস ও তারিখ নির্ণয় করা কোন প্রকারে সম্ভবপর নহে।

ইতিপূর্ব্বে অনেক অনেক মহাত্মারা এই বিষয়ের গবেষণা করিতে গিয়া নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করতঃ আপনাদের অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমত্তার প্রচুর প্রমাণ দিয়াছেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। অনুমান যথার্থও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া অনুমান একেবারে ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। অতি প্রাচীন অনিশ্চিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রকারান্তরে অনুমান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং প্রামাণিক ও যুক্তিযুক্ত অনুমানই পুরাতত্ত্ব নিরূপণের একমাত্র অবলম্বন। আর এখানে এ কথাও বলা উচিত যে, মনুষ্যের সমাজ, ধর্ম্মানুশীলন, ব্যবহার চর্চ্চা এবং প্রাকৃতিক বিষয়ের তারতম্য প্রভৃতিই ইহার প্রধান সহায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

হিমাচল স্মৃতি।

ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে স্নিগ্ধ হিমাদ্রি বিজনে,
লুব্ধ চিত্ত যবে মোর গৃহ তেয়াগিয়া
ছিল মুগ্ধ প্রকৃতির সে ঘোর গহনে;
সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবি পরাণে মজিয়া!
দূর অতীতের কথা তবু পড়ে মনে,
যে চিত্রে মোহিয়াছিল এ দু'টি নয়ন,
বিচিত্র বনের শোভা হিমানী গগনে,
ভাসে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বিবিধ বরণ!
কি শুভ্র তুষার স্তূপ ধবল শিখরে,
সাধনা জড়িত দৃশ্য দেব মহিমার!
উজ্জ্বল কাঞ্চন কান্তি তুঙ্গ মহীধরে!
নিরখি বিমুগ্ধ মনঃ নাহি হয় কার?
ভ্রমি রম্যরাজ্যে তব মোর হিমালয়,
জুড়াইল তাপতপ্ত অশান্ত হৃদয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মীরকাসিম। *

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। (খ)

[ইংরাজের অত্যাচারে যখন প্রজাগণ বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়া পড়িল তখন মীর কাসিম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দেশের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল সুতরাং প্রজাবর্গের দুঃখ বিমোচনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইংরাজের সহিত মীরজাফরের দেনা পাওনার হিসাব মিটাইবার অজুহাতে কলিকাতায় আগমন করেন এবং ইংরাজকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া বাঙ্গালার গদী ক্রয় করেন। পরে ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের মুর্শিদাবাদ আগমন উপলক্ষে জগৎশেঠের বাটীতে যে ক্ষুদ্র সম্মিলনী হয় এই গর্ভাঙ্কে তাহার বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।—সম্পাদক]

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ } শ্রেষ্ঠি ভ্রাতৃদ্বয়।
ঐ স্বরূপচাঁদ }
আলী ইব্রাহিম—মীরকাসিমের বন্ধু।
সামসের উদ্দিন—মীরজাফরের বন্ধু।
খোজা বাজিদ—আর্ম্মাণী বণিক।

জগৎশেঠের বাটী।

মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ, খোজাবাজিদ।

মহাতাবচাঁদ। চুপ কর, সামসের উদ্দিন আস্‌ছে।

(সামসের উদ্দিন ও আলী ইব্রাহিমখাঁর প্রবেশ।)

মহাতাবচাঁদ। আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়।

সামসের। বেশ হয়েছে, খোজা বাজীদ সাহেবও আছেন, আপনি মধ্যস্থ হোন। আমাদের দুজনের একটা তর্ক হয়েছে, মহাশয় প্রাচীন লোক, আলিবর্দ্দীর

---

* সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের—'মীরকাসিম' নাটক অত্যন্ত বৃহৎ কলেবর হওয়ায় এবং নাটকখানিকে অভিনয়োপযোগী করণার্থ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি নাটকের ২।৪টী গর্ভাঙ্ক পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা একটী গর্ভাঙ্ক প্রকাশিত করিলাম। পাঠকবর্গ "মীরকাসিম" নাটকখানির ১ম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্ক (৪১ পৃষ্ঠা অবধি) পাঠ শেষ করিয়া এই গর্ভাঙ্কটী পাঠ করিলে বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।—সম্পাদক।

আমল থেকে আছেন, আপনা দ্বারাই স্বরূপ মীমাংসা হবে। তর্কটা এই, বাঙ্গালায় হিন্দু বড় কি মুসলমান বড়? আমি বলি হিন্দু বড়।

আলী। উনি জুলুম করে তর্ক কর্‌ছেন, আমি কাকেও বড় ছোট করিনে। আমি বলি বাঙ্গালার জল হাওয়া যার গায়ে লেগেছে—সব সমান। এ বাঙ্গালার মাটীতে পা দিলে কেউ আর বড় ছোট থাকে না!

মহাতাব। মহাশয়, বাঙ্গালার গৌরাঙ্গই বড়।

সামসের। সে তো নিশ্চিত, গৌরাঙ্গইতো হিন্দু মুসলমানের বাস্ত দেবতা, এখন গৌরাঙ্গকে তুষ্ট রাখতে হিন্দু পারে কি মুসলমান পারে?

স্বরূপ। মশায়, ক্লাইভ হ'তে মুসলমানের পূজাই তো গৌরাঙ্গ পেয়ে আসছে?

সাম। আজ্ঞে, মুসলমান তো রূপোর চাকি দিয়ে পূজো করে, মন্ত্র তো আপনারা পড়েন!

আলী। হিন্দুর অপরাধ কি, মুসলমান যে মন্ত্র পড়্‌তে চান, সেই মন্ত্র পড়ায়।

সামসের। সে কি এমন কথা বল্‌বেন না। মশাই, মুসলমানকে গৌরাঙ্গ প্রেমে দীক্ষা দিলে কে বলুন? রাজা রাজবল্লভ না হ'লে কি মুসলমান গৌরাঙ্গ চিন্‌তো? আর রায়দুর্ল্লভ, শেঠজীরা, মাণিকচাঁদ এঁরা না ক্লাইভের পূজা করলে কি মীরজাফর সাহেব গৌরাঙ্গের পূজা করে গদী পেতেন?

মহাতাব। মশাই, সে কথা আর কেন তুল্‌ছেন, আমরা হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলেই ঝক্‌মারি করেছি।

আলী। সেই নিমিত্তই আমি বলছি,হিন্দু মুসলমান আমরা উভয়েই তুল্য ভক্ত।

সামসের। শোন শোন, আমার সওয়াল শোনো। একবার ঝক্‌মারি করেই কি হিন্দু মুসলমান নিশ্চিন্ত আছি, আবার যে ষোড়শোপচারে গৌরাঙ্গ পূজা কোল্‌কাতায় হয়েছে শুনৃচি। সে পূজা ধূমধাম করে মুরশিদাবাদেও না কি অচিরে হবে। নবাবের হুকুমে সহর সজ্জিত হচ্চে। এবার গৌরাঙ্গ প্রধান ভ্যান্সিটার্টের পদার্পণ সম্ভব।

আলী। মশায়ের তো অন্তর পাওয়া যাচ্চে না। মশায় চিরদিনই স্পষ্ট বক্তা শুনি, নবাবকেই ক্লাইভের গর্দ্দভ বলেছিলেন, এখানে তো বড় স্পষ্ট কথা বল্‌ছেন না, মনের ভাবটা কি প্রকাশ করুন।

সামসের। ম'শায় মনের ভাব বড় অপ্রকাশ নাই, ম'শায়ও তো শেঠজীর বাড়ীতে একটা মনের ভাব নিয়ে আসছিলেন, বান্দাও অবশ্য একটা ভাব নিয়ে

এসেছে। খোজাবাজিদও শেঠজিদের সঙ্গে একটা ভাব নিয়ে বসেছিলেন।

খোজা। না না. ভাব কি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

সামসের। মশায়ের তো সোরার ব্যবসা, শেঠজীর তো সোরার ব্যবসা নাই, যে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন। ম'শায় কাজের মানুষ, বিনা কাজে কি পা বাড়ান ?

আলী। আজ্ঞে এবার স্বরূপ বল্‌ছেন, বিনা কাজে কেউ পা বাড়ান না। তা দেখুন, কাজ দু রকম আছে, এক মেটান কাজ,আর এক বাধান কাজ।

সামসের। আর এক সংবাদ লওয়া কাজ।

আলী। আজ্ঞে সংবাদটা তো মেটান বাধান উভয় কাজের অন্তর্গত বই তো নয়।

সাম। স্বীকার পেলেম।

আলী। তবে মশায় বোধ হয়, জান্‌তে এসেছেন যে কাশিমআলী খাঁ বাহাদুর কলিকাতায় কি কচ্চেন, ইংরাজদের সঙ্গে হিসাব নিকাশের জন্য নবাব পাঠিয়েছেন, তা হিসাব নিকেশ কচ্চেন না নবাবের নিকেসের পন্থায় আছেন ? আর সে পরামর্শের ভেতর এঁরা আছেন কি না ! তা দেখুন, আমিই আপনাকে ব'লে দিই, একটা বাদাবাদিই সম্ভব। পরামর্শের ভেতর এঁদেরও থাকার সম্ভব। নিজের নিজের স্বার্থ বড় পদার্থ; মশায়ই বুঝুন না, নবাব সাহেবের স্বার্থে আপনার স্বার্থ জড়িত; তাই এসেছেন। এঁদেরও স্বার্থ আর একরূপ, তাই এঁরা একত্র।

মহা। কি বল্‌চেন—কি বল্‌চেন—স্বার্থ কি—স্বার্থ কি !

আলী। ম'শায়, ভয় পাচ্ছেন কেন ? গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যদি না পৌছে থাকেন, পৌছিলেন বলে; আর যদি না পৌছেন, হেষ্টিংস সাহেব রেসিডেণ্ট রয়েছে, নবাব হঠাৎ কিছু জবরদস্তি কর্‌তে পার্‌বে না।

সাম। মশায় তো বক্তৃতাটা দিব্য কর্‌লেন, কিন্তু বক্তব্য তো কিছু বুঝলুম না। স্বীকার পেলেম, সংবাদ নিতে এসেছি, তার পর—

আলী। তারপর শুনুন, উপস্থিত নবাবের কার্য্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ের স্বার্থে আঘাত পড়ে, অট্টালিকা হতে দীনের কুটীরে সে আঘাত, অবস্থার পরিবর্ত্তন না হলে দেশের সর্ব্বনাশ ! প্রকাশ্যে হোক, গোপনে হোক সে চেষ্টার ত্রুটি কখনই হবে না। আমার বক্তব্য এই যে, পরস্পর স্বার্থ নিয়ে পরস্পরে কলহ না ক'রে স্বার্থের প্রধান বিঘ্ন ইংরাজের বিরুদ্ধে একত্র হলে হয় না ?

খোজা। সে কি?

আলী। 'সে কি' ওই সর্ব্বনাশের মূল। এই 'সে কি' বাঙ্গ্লা হতে দূর না হ'লে, বাঙ্গ্লার মঙ্গল নাই। নবাব পরিবর্ত্তন শতবার হ'লেও বাঙ্গ্লার প্রজার শান্তি নাই। অর্থ শোষক প্রজার রুধির শোষক ইংরাজ বর্ত্তমান থাক্‌বে। সামসের উদ্দিন সাহেব, নবাবকে বলুন, নবাবীপদ গ্রহণ করেছেন, নবাবী ভারও গ্রহণ করুন। নচেৎ উপযুক্ত লোককে ভার প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আমোদ করুন। তাঁর শঙ্কা—ইংরাজ অতি ভয়ানক, কিন্তু এর উপায় না হলে দিন দিন আরো ভয়ানক হবে। এখনো উপায় সম্ভাবনা, দু'দিন পরে আর সে উপায় থাক্‌বে না।

সাম। সেই উপায়ের জন্যই কি মীরকাসিম সাহেব কলিকাতায় গিয়েছেন?

আলী। তাঁর যেরূপ ইচ্ছা তিনি করেছেন, তাঁর একার ইচ্ছার উপর কিছুরই নির্ভর নাই। হিন্দু মুসলমান উভয়ের এক স্বার্থ হওয়ার উপর সমস্ত নির্ভর, দেখুন ইংরাজ আমাদের সমস্ত চরিত্র অবগত, কিন্তু আমরা ইংরাজ চরিত্র অবগত নই। আমাদের মত তাদেরও পরস্পর পৃথক পৃথক স্বার্থ, কিন্তু বঙ্গদেশ লুণ্ঠন সকলের জড়িত স্বার্থ! আমাদেরও পরস্পর পৃথক স্বার্থ হওয়ায় হানি নাই, চিরদিনই পরস্পর স্বার্থ পৃথক থাক্‌বে, কিন্তু যারা বঙ্গভূমির শোষক, তাদের বিরুদ্ধে এক স্বার্থ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ ইংরাজ ইঙ্গিতে আজ যে নবাব, কাল তিনি পথের ভিখারী হবেন, আজ যিনি উজির, কাল বধ্যভূমিতে তার রুধির পাত হবে, আজ যিনি ধনাঢ্য আমীর, কাল তিনি আবাসহীন হবেন, আজ যিনি মান্যগণ্য প্রধান, কাল তিনি হীনের হীন হবেন। ইংরাজ-ইঙ্গিত এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ হবে। সতর্ক হবার সময় উপস্থিত, আমাদের আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়।

সাম। আলী, কি নিমিত্ত অরণ্যে রোদন কচ্চ? আমার প্রশ্নের ভাব কি তুমি বোঝো নাই? হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে জড়িত হব, তবে বিদেশী বাণিজ্য বিস্তার কিরূপে হবে? বিদেশী আধিপত্য বিস্তার আর কার দ্বারা হবে, পরস্পর বিবাদ করে বিদেশীর দ্বারস্থ আর কারা হবে? আলী তুমি এই সাধু প্রস্তাব কচ্চ, কিন্তু আমার মনে কি আছে, তা জানো? তুমি হেতায় প্রস্তাব কচ্চ, অন্য দিকে ষড়যন্ত্রের ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত

হচ্চে, নিশ্চয় জেনো আশু কোন বিভ্রাট হবে, বিনা স্বার্থে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কলিকাতা পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে পদার্পণ কচ্ছেন না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নবাব বাহাদুর দরবারে শেঠজীদের আহ্বান করেছেন। ম'শায়ের বাটীতেও মশায়ের সন্ধানে গমন করেছিলেম।

মহাতাব। কিরূপ অনুমতি হয়?

সকলে। আজ্ঞে, আমরা বিদায় হলেম। [সকলের প্রস্থান]

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

স্বার্থ।

স্বার্থ অর্থাৎ স্ব অর্থ লইয়াই সংসার। সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ বুদ্ধিমান মানব হইতে অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলেই স্ব অর্থ ব্যাপারে সর্ব্বক্ষণ লিপ্ত। প্রাণীর সর্ব্ব কর্ম্মেই স্বার্থ বিষয়ক উদ্দেশ্য আছে। স্বার্থ ভিন্ন কেহ এক পদও অগ্রসর হয় না।

সমস্ত সৃজন যে পথ নিঃশব্দে অবলম্বন করে, সমস্ত প্রাণী স্বতঃ প্রণোদিত যে কার্য্য নীরবে করিয়া যায়, তাহা নৈসর্গিক নিয়ম। প্রাণিগণের জন্য প্রকৃতি সে নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতি ক্ষুধা দিয়াছেন, প্রাণিগণকে তন্নিবৃত্তির উপায় করিতে হইবে। স্ব অর্থাৎ আপনাকে করিবার কতকগুলি কার্য্য অর্থাৎ অর্থ দিয়াছেন, সেগুলি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। মানব শিশু ভূপতিত হইয়া প্রথমেই স্বার্থের অন্বেষণে তৎপর হয়, ইহাই তাহার প্রথম নৈসর্গিক শিক্ষা, আপনার অভাব তাহার প্রথম অনুভূতি, এবং তৎপূরণই তাহার প্রথম কার্য্য। আজন্মাবধি এই পথ অনুসরণ প্রাণীর ধর্ম্ম। মনীষিগণ সাধারণে নিরবধি স্ব পোষণার্থ সহস্রবিধ নীতিবাক্য প্রচার করিতেছেন। স্ব স্বত্ব রক্ষার জন্য মানব অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব করিতেছে। লোকের স্বত্ব সংস্থাপনের জন্যই ধর্ম্মাধিকরণ আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে। সারাবিশ্ব স্বার্থে উদ্ভূত হইয়া, অবিশ্রাম স্বার্থ চিন্তা করিয়া, একই ছন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিরাম নাই।

বোধ হয় স্বার্থ জীবে কোন মতেই অবর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যদি মনে

করা যায় একটী প্রাণীর স্ব অর্থ কিছুই নাই, আপনার কথা সে কিছুই ভাবেনা, কেবল পরের ভাবনা লইয়াই ব্যস্ত। আপনার ভাল হউক, মন্দ হউক, তদ্বিষয়ে চিন্তামাত্র নাই, কেবল অপরের চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন, অতএব তাহার স্বার্থ কোথায়? কথাটা বোধ হয় অভ্রান্ত নহে কারণ তাহার মধ্যে অপরের চিন্তারূপ যে স্বপ্রবৃত্তি বা অর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে সে সেই স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া তাহারই সাধনা করিতেছে। কোনও না কোন প্রকারে স্বার্থ জীবে বর্ত্তমান।

স্বার্থ অর্থাৎ উদ্দেশ্য শূন্য জীব হইতে পারেনা। এই বৃত্তি হইতে ছিন্ন হওয়া বোধ হয় অসম্ভব। চেতন পদার্থমাত্রেই যে কোন প্রকারে হউক স্বার্থবৃত্তি বর্ত্তমান।

মনের সকল মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সাধন অনুশীলনোচিত হইয়া থাকে। যে বৃত্তির যেরূপ ভাবে অনুশীলন করা যায় তাহার স্ফূর্ত্তি সেই রূপই হয়। বৃত্তির প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার পন্থাই বর্ত্তমান। ঘটনাচক্রে ও অবস্থা নির্দ্দেশে তাহা যে বর্ত্ম অবলম্বন করে, ফললাভ তদ্রূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্মালোকে আলোকিত, ন্যায়ের ছায়ায় সুস্নিগ্ধ, শান্তি সুরভিত পথে সৌভাগ্যক্রমে বৃত্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে তাহার পর্য্যটন আজীবন শান্তিপ্রদ ও মনোরম হয়। দেহে পুণ্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত হয়, মন নিরবধি ভূমানন্দ উপভোগ করে। তাহার ধর্ম্ম জীবনে সর্ব্বদাই সন্তোষ, সদাই তৃপ্তি। আর্থিক কিংবা কায়িক কষ্ট তাহার উদার ও প্রশান্ত মনে বিষাদের ছায়াও অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে যদি বৃত্তি পাপতিমিরে অন্ধকার, কুটিলতার সহস্র বিঘ্নে বন্ধুর, আবিল বর্ত্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে আজীবন তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। সর্ব্বক্ষণই কেবল অশান্তি, কেবল ক্রন্দন, কেবল হাহাকার। নিরয়ের পাপধূমে তাহার জ্ঞান সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন থাকে। শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালায় সে অহঃরহ অশেষ যাতনা ভোগ করে। কুবেরের ধনভাণ্ডার মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে শান্তি দিতে সমর্থ হয় না। প্রাণীর স্বতঃপ্রণোদিত বৃত্তি এই স্বার্থ নিকৃষ্ট পথে ধাবিত হইলে কি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে! নিকৃষ্ট স্বার্থ প্রণোদিত মানব সমাজের কণ্টকস্বরূপ। নিকৃষ্ট স্বার্থ অর্থে এক অতি সঙ্কীর্ণ ও ঘৃণিত বৃত্তি বুঝায়। ইহার মধ্যে ক্রম আছে। নিকৃষ্টতম স্বার্থ শুদ্ধ আপনাতেই জড়িত। স্ব ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ইহা আর কিছুই জানেনা। ভাবে চিন্তায় ও ভাষায় স্ব ব্যতিরেকে ইহার আর অন্ত

অভিব্যক্তি নাই। ইহার স্বর স্বরূপও কতকগুলি অতি ঘৃণিত ও পাশবিক বৃত্তির সমষ্টি মাত্র—এই বৃত্তির মূলমন্ত্র সর্ব্ব; সদবৃত্তি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া স্বীয় সুখের পরিচর্য্যা; এই বৃত্তিশালী জীবের হৃদয়ে অপরের জন্য অণুমাত্রও স্থান নাই, অপরের পক্ষে তাহার মনদ্বার একেবারে রুদ্ধ। শতবার ক্রন্দন কর, কণামাত্র করুণার প্রত্যাশী হইয়া সহস্রবার সেই রুদ্ধ দ্বারে আঘাত কর, উত্তর পাইবে না। তাহা পাষাণের ন্যায় কঠিন ও কমনীয়তা শূন্য। এই প্রকৃতির জীবের আপনার জন্য করিতে না পারে এমন কার্য্যই নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে কোন বাধাই ইহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে সমর্থ হয় না। ছলে বলে কিংবা কৌশলে আপনার কার্য্যোদ্ধার ও ভোগ লালসাময় বৃত্তির চরিতার্থতা ইহাদের মূলমন্ত্র। বোধ হয় এই প্রকার আত্মোন্মুখী স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় স্বীয় কার্য্য উদ্ধারার্থ রাজপদে আসীন হইয়াও অধীনস্থ আশ্রিত প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বাঙ্গলার উৎপন্ন বস্ত্রকে বিতাড়ণ পূর্ব্বক বিলাতি বস্ত্র প্রচলন কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহারা নিরীহ তন্তুবায়কুলের উপর যে লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। সুসভ্য ইংরেজ যাহাতে দেশীয় তন্তুবায়কুল বস্ত্র বয়ন করিয়া, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারে সে কারণ আশ্রিত প্রজার হস্তের অঙ্গুলি কর্ত্তন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। এই নিকৃষ্টতম স্বার্থপূর্ণ প্রাণীর অশান্তি পদে পদে ঘটিয়া থাকে। স্বীয় হানিকর বিন্দুমাত্র ঘটনা হইলেই ইহাদের প্রাণে শত বৃশ্চিক দংশন করে এবং অশান্তির কণ্টকে ইহাদের সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করে। পৃথিবীতে বোধ হয় অল্প কার্য্যই স্বীয় সুবিধা ও মনের মত হইয়া সম্পন্ন হয়। অসুবিধা ভোগ এই শ্রেণীর জীবের মস্তকে বজ্র পতন তুল্য। সুতরাং ক্রন্দন, হাহাকার ও সর্ব্ব বিষয়ে দোষারোপ ইহাদের জীবনে অনুক্ষণ সাথী হয়।

আর এক প্রকারের স্বার্থবৃত্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা ব্যক্তির স্বীয় পরিবার মধ্যে আবদ্ধ। এই স্বার্থ বৃত্তি পূর্ব্বোক্তের ন্যায় ভয়াবহ ও কুৎসিত নহে। ইহাতে আত্মপূজা তত বর্ত্তমান নাই। আপনার স্ত্রী আপনার পুত্র ও আপনার পরিবারবর্গের জন্য এই বৃত্তি আত্মত্যাগ করে। ইহার অনুশীলনে আত্ম সুখ বিসর্জ্জন যথেষ্ট আছে। আপনি ত্যাগ স্বীকার করিয়া পরিবার-বর্গের অভাব মোচন, আত্ম সুখ চিন্তায় কিছু উদাসীন হইয়া পরিবারবর্গের

সুখ চিন্তা প্রভৃতি আত্ম ত্যাগের কার্য্য করিয়া এই স্বার্থের ভাব ও চিন্তা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বর্ত্ম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মানবের মনে কেবল আত্ম সুখান্বেষণরূপ পঙ্কিল প্রবাহ অবিশ্রাম প্রবাহিত হইয়া সর্ব্ব প্রকার কমনীয় বৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করে না। অপরের জন্য, অপরের সুখ ও সুবিধার জন্য নির্ম্মল চিন্তা স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাতে মন অনেকটা পূর্ণ এবং শান্ত থাকে। বহুবিধ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও মন এই বৃত্তির অনুশীলন করিয়া অপেক্ষাকৃত তৃপ্ত থাকে। অত্যাচার প্রপীড়িত ও কঠিন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অশেষ প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিলেও মন সর্ব্ব প্রকার আশ্রয় শূন্য ও মরুভূমির মত শুষ্ক হয় না। মানসিক ক্রিয়ার গতি রুদ্ধ হইয়া মনের অবস্থা ভয়ানক ও বীভৎস করিতে পারে না। শত যাতনার মধ্যেও শান্তির কিরণ হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে। মানব ভাবিতে পারে আমি যে নির্য্যাতন সহ্য করিতেছি তাহা আমার পুত্র কলত্রের সুখের জন্য। আমার এ কষ্টের মূল্যে ত তাহারা সুখে থাকিতে পাইতেছে। আমি ত সমস্ত দিবস এত অত্যাচার সহ্য করিয়া সন্ধ্যায় তাহাদের বদন মণ্ডলে আনন্দ রেখা দেখিতে পাইব। এই চিন্তায় মানব অনেক শান্তি পায়। অপরের জন্য এক ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিতেছে, এই চিন্তাজনিত যে আত্মপ্রসাদ তাহার উপভোগে অনেক সুখ অনেক শান্তি আছে।

কিন্তু এই স্বার্থ বৃত্তিও সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত। ইহা হইতে মানব উচ্চতর গ্রামে উঠিতে না পারিলে মনের উৎফুল্লতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়। মন একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আপনার কর্ম্ম ক্ষেত্র সীমা বদ্ধ করে। আপনার পরিবার-বর্গের সুখান্বেষণ জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া এবং সেই গণ্ডীর ভিতর অবিশ্রাম কার্য্য করিয়া বিশাল বিশ্বে কূপ মধ্যস্থ ভেকের ন্যায় দিন যাপন করে। আপনার পরিবারের জন্য উপার্জ্জন, তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য অর্থ সঞ্চয়, এবং তাহাদের কড়া ক্রান্তির জন্য মন সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিয়া সামাজিক, লৌকিক প্রভৃতি অনেক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়। ক্রমশঃ স্বীয় পরিবারের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য অশেষবিধ পাপাচরণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। যে স্বার্থ একের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভয়াবহ ও কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই আবার দশের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া প্রায় তদ্রূপই ভয়াবহ ও কুৎসিত হইয়া থাকে। আবার ঘটনা চক্রে পড়িয়া এই বৃত্তি মানবকে যে সুখ ও শান্তি প্রদান করিত তাহাতেও বিরত হয়।

হয়ত এক ব্যক্তি আজীবন পুত্রটীর জন্য প্রাণপাত করিল, তাহার ভবিষ্যতের জন্য লৌকিক ও সামাজিক সমস্ত কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া, সকল বিষয় তুচ্ছ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পুত্রটী মহা অবাধ্য ও উন্মার্গগামী হইল। উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য করিয়া সে বৃদ্ধ পিতাকে, যিনি সারা জীবন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার ভরসা করিয়াই প্রাণপাত করিয়াছেন, পদে পদে অপদস্থ ও নিগৃহীত করিয়া আপনার কুপ্রবৃত্তির পরিচর্য্যা করিতে রত হইল। এবম্প্রকার ঘটনায় মনে কি প্রকার নিদারুণ মর্ম্মপীড়া হইতে পারে ? তাহার এত দিনের বহু আয়াসে নির্ম্মিত প্রাসাদ শূন্যস্থ অট্টালিকার ন্যায় ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সারা জীবনের পরিশ্রম পণ্ড হয়। আপনার বিন্দু বিন্দু শোণিত পাতে উপার্জ্জিত বিভব, আপনার উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে বিষময় কুফল, তাহার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করে। আপনার কর্ম্মের শোচনীয় পরিণাম সে নয়ন সমক্ষে দেখিতে পায় এবং সারা জীবন সুখের অন্বেষণ করিয়াও জীবন্তে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে স্ব অর্থ ভিন্ন প্রাণী এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম, স্ব অর্থই মানবের মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে কোন প্রকারে হউক স্ব অর্থ মানবে বর্ত্তমান। অতএব এই বৃত্তি প্রকৃষ্ট পন্থায় নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। আমার এই কার্য্য এই জ্ঞান না জন্মিলে একটা আত্ম অর্থ বোধ বা আমারত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানবের পক্ষে কোন কার্য্য করা দুরূহ। কেহ একটী সৎকার্য্য করিতে মানস করিলেন সে স্থলে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এইরূপ একটী স্ব সংক্রান্ত জ্ঞান মনোমধ্যে উদিত না হইলে সেই কার্য্যকরণে ঐকান্তিক উদ্যম বোধ হয় সম্ভবে না। ক্ষুদ্র হউক বৃহৎ হউক, সকল কর্ম্মের মূলে স্ব অর্থ জ্ঞান স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল কার্য্য কর্ম্মবর্ম্মে পরিভ্রমণ করে। ফলে স্বার্থ ছাড়িয়া দিলে মানবের কার্য্যকারী ক্ষমতা অক্ষম হইয়া পড়ে। মানবের সকল ক্ষমতার মূলে ইহা জড়িত। অতএব যাহাতে স্বার্থবৃত্তি নিকৃষ্ট ও সঙ্কীর্ণ পথে ধাবিত হইয়া স্বীয় ও পরকীয় অশেষ প্রকার অশান্তি ও জ্বালার নিদান স্বরূপ না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। স্বার্থের কর্ম্ম ক্ষেত্র যত প্রশস্ত করিতে পারা যায় বোধ হয় মানব সেই পরিমাণে জীবনে শান্তি প্রাপ্ত হয়। সুন্দর দেখিতে হইলে, সুন্দর উপভোগ করিতে হইলে, কেবল আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের দিকে

চাহিয়া দেখিলেই সাধ সম্পূর্ণ মিটিবে না, যতদূর নয়ন যায় সকলকেই আপনার করিয়া সকলের সৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া প্রকৃত সুখ ও শান্তির অনুশীলন করিতে হইবে। অপরের ব্যথিত ক্রন্দন শুনিয়া "উহার সহিত আমার কোন স্বার্থ নাই"এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না,"উহাও আমার আপনার ব্যথা"এই স্বার্থ বিজড়িত ভাব যখন হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিবে তখন মানব ব্যথিতের সে জ্বালা নিবারণের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ের পরিসর প্রশস্ত করিয়া পরের স্বার্থ আপনার করিয়া তাহার অনুশীলন স্বার্থবৃত্তির প্রকৃষ্টপন্থা। Weep with those who weep and rejoice with those who rejoice এই নীতিবাক্য সম্বন্ধে দার্শনিক Blakie বলিয়াছেন "If it were grandly carried out would make every man's life as rich in universal sympathy as Shakesperes imagination was in universal imagery. To do this is the true moral philosophy, the best of human riches".

শ্রীউমাচরণ ধর।

শাপে বর।

(১)

শৈশবেই মাতৃহীন হওয়াতে প্রকৃত স্নেহটা কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতাম না। পিতা গম্ভীরভাবে প্রত্যহ এক একবার আমার ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে আসিয়া শয্যাদি দেখিয়া যাইতেন, ভালরূপ বস্ত্রাবৃত না হইয়া থাকিলে জলদনিস্বনে বলিতেন—"ঠাণ্ডা লাগিবে, জামা গায়ে দাও" এবং রন্ধনাদির পারিপাট্য সম্বন্ধে স্বয়ং যে দিন সন্দিহান হইতেন, সেই দিন পিসিমাকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেন যে, এরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য আমার পক্ষে বড়ই অহিতকর। তাঁহার এত অর্থব্যয়, এত কষ্ট ত' কেবল আমারই জন্য। এ সকল গুলার ভিতর কেমন একটা কঠোরতা ছিল, এ যত্নটা চন্দ্রসূর্য্য উদয়াস্তের মত যেন একটা অর্থহীন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত। ঠিক আমার জন্য একটা কার্য্য হইতেছে, বা ঠিক আমায় সুখী করিবার জন্য কেহ একটা কিছু করিতেছে, একথা বুঝিতে পারিলে বোধ হয় সুখী হইতাম। কিন্তু তাহা কখনও কেহ করে নাই,

সুতরাং অপরের যত্নজনিত যে একটা সুখ তাহা বড় একটা ভাগ্যে ঘটেও নাই। এক একবার মনে হইত যে আমার সাধাভিলাষের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না একথা বিশ্বাস করিয়া পিতা বড়ই অন্যায় করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে ঠিক বাল্যকালে জীবনটা যে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতাম এখনও তিনি আমাকে জীবনটা সেই স্রোতে ভাসাইবার জন্য বাসনা করেন কেন?

বাল্যে যেমন একাকী বাটীর বাহির হওয়া একটা গর্হিত কার্য্য ছিল, পিতার আজ্ঞায় কৈশোরেও তেমনি বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইত। যদি কোনও দিন সহপাঠীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিবার জন্য ক্রীড়াস্থলে বা অন্যত্র গমন করিতাম তাহা হইলে পিতার রোষকষায়িত গম্ভীর দৃষ্টি তিন চারি দিন ধরিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করিত। সুতরাং মনে মনে শপথ করিতাম যাহা কিছু সহ্য করিতে হয় নিভৃতে আপনা আপনি সহ্য করিব। পিতার দৃষ্টি কাঠিন্যে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা সহ্য করিবার প্রয়োজন কি?

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে এণ্ট্রেন্স পাশ করিবার পরও আমার বাহ্যিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না বটে, কিন্তু মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। দিন দিন যেমন কাব্য দর্শনাদি শিক্ষা করিয়া, কৈশোরের নবাগত উদ্যমে, নূতন জোয়ারে পৃথিবীটাকে অপর চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলাম, আমার জীবনের নির্জ্জনতাটাও তেমনি প্রতিদিন তীব্র মর্ম্মপীড়ার আকর হইয়া উঠিল। এক একবার নবোৎসাহ প্রণোদিত হৃদয়ের বৃত্তিগুলা বিদ্রোহন্মুখী হইয়া উঠিত, সামান্য কোমলতা ও একটু বিমল স্নেহের জন্য হৃদয়ের ভিতর শত শত ছোট ছোট বাসনারাশি তাণ্ডব নৃত্য করিত। কিন্তু আবার একটা বিজ্ঞ স্বর, একটা অপরিচিত আশঙ্কা, একটা আশার ক্ষীণ দীপ দেখাইয়া সেগুলাকে থামাইত। আমিও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাব্যাদিতে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়া বহির্জগতের উন্মাদক স্বরগুলার বিরুদ্ধে রুদ্ধ-কর্ণ হইবার প্রয়াস করিতাম।

আমাদের বাটীর এক অংশে, আমরা বাস করিতাম,' অপর অংশ ভাড়া দেওয়া হইত। পুরাতন ভাড়াটিয়া উঠিয়া যাইবার পর জলধর ভট্টাচার্য্য প্রায় আট মাস হইল আমাদের বাটীতে ভাড়া আসিয়াছিলেন। তিনি সামান্য যাজক ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেন এবং কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন

বলিয়া আমার বিশ্বাস। জলধরের এক সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী স্ত্রী ব্যতীত পরিবারে অপর কেহ ছিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের বাটীতে আসিবার পর হইতে আমার জীবনে একটা ছোট খাট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারা বাটীর যে অংশে বাস করিতেন, আমার গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া সে অংশটি দেখা যাইত। সুতরাং বিশ্রাম পাইলেই আমার শূন্য গৃহের বাতায়ন পথে বসিয়া এই ব্রাহ্মণ দম্পতীকে অবলোকন করিতাম এবং পুস্তকস্থ বিদ্যা ছাড়িয়া এরূপ যৎসামান্য প্রত্যক্ষ সাংসারিক জীবনের জ্ঞান পাইবার আশা করিতাম।

(২)

একদিন প্রাতঃকালে আপনার নির্জ্জন গৃহটিতে বসিয়া রোমান ইতিহাস পাঠ করিতেছিলাম। নিম্নে ভট্টাচার্য্য গৃহিণী জলধর বাবুর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন তাহা অস্পষ্ট ভাবে আমার কাণে প্রবেশ করিয়া জুলিয়স সিজারের হত্যাকাহিনী হইতে আমার মনটাকে সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। জলধর বলিল—'তুমি পাগল! পূজারি বামুন পিরাণ গায়ে দিলে লোকে বলবে কি?'

স্ত্রী বলিল—কি বলিবে? এমন ক'রে ঘুরে বেড়ালে কি ভদ্রতা থাকে?

আমি পুস্তক ফেলিয়া উঠিলাম। মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া তাহাদিগকে দেখিলাম। বাস্তবিক স্ত্রীর কথা সত্য। তাহার সেই কাঁচা সোণার মত বর্ণ, তাহার সুকোমল বাহুযুগল, সে সুন্দর সরস আঁখি দু'টি জলধর ভট্টাচার্য্যের শ্যামবর্ণ কৃশ দেহ ও খর্ব্বাকৃতিকে ধিক্কার দিতেছিল। বোধ হয় অঙ্গে পিরাণ দিয়া পদদ্বয় পাদুকাবৃত করিলে সে কতকটা গৃহিণীর উপযুক্ত হইতে পারিত। আর তাহার সেই বর্ব্বর, অসভ্য শ্মশ্রুরাশির তখনই মুণ্ডপাত করিবার জন্য একটা সামরিক প্রবৃত্তি আমার মনোমধ্যে উদিত হইল।

জলধর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। আমিও সুবিধা পাইলে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা করিয়া কাটাইতাম। এ দম্পতীকে দেখিয়া আমার মনে একটা প্রশ্ন হইয়াছিল, জলধরের গৃহিণীর নাম কি? ওরূপ রমণীরত্নের স্বামীর নাম যে জলধর হওয়া একেবারেই উচিত হয় নাই তাহা প্রথম সপ্তাহেই স্থির করিয়াছিলাম। আজ বালার্কের রশ্মিতে ইহাদের বিসদৃশতা

লক্ষ্য করিবার সময় জলধর নামটা আমার একটা অন্যতম বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল।

যখন পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দিয়া স্বভাবের পুস্তক হইতে উক্তরূপে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, হঠাৎ দ্বারে আসিয়া কে আঘাত করিল। আমি ত্রস্তভাবে দরজা খুলিয়া দিলাম, দেখিলাম সম্মুখে পিতা।

তাঁহার সেই স্বাভাবিক কঠোরস্বরে পিতা জিজ্ঞাসিলেন—"হীরু কি করিতেছিলে ?" হরি ! হরি ! কি বলিব ? কেন, পাঠ করিতেছিলাম। সম্মুখে রোমান ইতিহাস খানা পড়িয়াছিল। তবে এক মিনিট যদি বাতায়ন বাহিরে চাহিয়া থাকি তাহা যে পিতাকে বলিতে হইবে এমন কি কথা। ইহা কি মিথ্যা ? না মিথ্যা কেন ?

আমাকে চিন্তিত দেখিয়া পিতা বলিলেন —পড়িতেছিলে ?

আমি সে সময় প্রশ্নটা সম্যক্ না বুঝিয়া আন্দাজে বলিলাম—হুঁ।

পিতা বলিলেন—পড়া শুনা কেমন হ'ল ?

আমি কোন পুস্তক কতবার পড়িয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, সুতরাং সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন—আচ্ছা বেশ।

তার পর তিনি যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহার অবতারণা করিলেন। হঠাৎ কার্য্যান্তরে তাঁহাকে বিদেশ যাইতে হইবে, তাঁহার সুবিধার জন্য পিসিমাও তাঁহার সহিত যাইবেন। আমার পরীক্ষার জন্য তিনি আমায় লইয়া যাইতে পারিবেন না।

সত্য কথা বলিতে কি আমার বিশ্বাস ছিল পিতার উপর আমার তাদৃশ মমতা নাই। কিন্তু অকস্মাৎ আমার নির্জ্জন জীবনটা আরও নির্জ্জন হইবে ভাবিয়া হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। চক্ষের সম্মুখে একবার আমার স্বাধীনতার দৃশ্যগুলা ভাসিয়া উঠিল। দুইটা জীবনে কিন্তু মিলাইয়া দেখিয়া, ভাবিলাম এ কঠোর নির্জ্জন জীবনই শ্রেয়ঃ। পিতাকে বলিলাম—আমায় নিয়ে চলুন, আমি একলা থাকিতে পার্‌বো না।

পিতা বলিলেন—আর ত ১৫ দিন পরে পরীক্ষা। পরীক্ষার শেষে ইচ্ছা কর ত' আমার নিকট আস্‌তে পার্‌বে।

আমি বলিলাম—কা'র কাছে থাক্‌বো ? পিসিমা গেলে কা'র কাছে খাবো ?

পিতা সেই পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—কেন আমি কি তার ব্যবস্থা করিনি? জলধর তোমার আহারের ভার নিতে রাজি হ'য়েছেন। আমি তাঁকে টাকা কড়ি দিয়ে যাবো।

এ এক নূতন বিস্ময়ের মধ্যে পড়িলাম। আকাশ পাতাল নানা কথা ভাবিলাম। নৈরাশ্যটা একটু কাটিল। চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম সন্ধ্যার অস্তোন্মুখ রবির মত পিতা অদৃশ্য হইয়াছেন।

(৩)

দুই বৎসর কেবল পাঠ ভিন্ন ত অপর কিছুই করি নাই সুতরাং পরীক্ষা ভালরূপ দিলাম, পরীক্ষার শেষ দিনই কাশী হইতে পিতার পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—"যদি মনের সুখে কলিকাতায় থাকিতে পার তাহা হইলে কষ্ট করিয়া একেলা এতদূর আসিবার প্রয়োজন নাই।"

ঐরূপ একখানা পত্র জলধরের নিকটও আসিয়াছিল। আমার পরীক্ষা শেষ হইবার পরদিন প্রাতে প্রায় ৭টা অবধি নিজের গৃহে শুইয়াছিলাম। সম্মুখে টেবিলের উপর পুস্তকগুলা বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। একখানা চেয়ারের উপর কতক গুলা কাপড় স্তুপাকারে পড়িয়াছিল। গৃহের মধ্যে সকলই বিশৃঙ্খল। শয্যায় শুইয়া কিরূপে অবসরটা কাটাইব তাহার মতলব করিতেছিলাম।

তখন বসন্তের প্রারম্ভ। পিতা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু বাসন্তী প্রভাতের সুন্দর মন্দানিলের লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।

অলস ভাবে শয্যায় শুইয়া নানা কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম গৃহটিকে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে, ভাবিতেছিলাম যদিও শীত গিয়াছে তথাপি সর্ব্বক্ষণ গাত্রে পিরাণ পরিধান করিতে হইবে, ভাবিতেছিলাম পিতার কাছে গিয়া কি হইবে, এমন যত্ন ত পাইব না, ভাবিতেছিলাম হিন্দু সমাজের মাথা মুণ্ড নাই, হিন্দু সমাজের স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যবহার বর্ব্বর ও কাপুরুষোচিত।

হঠাৎ একটা কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

"বোস্‌জা মশায় হীরুকে কাশী যাবার জন্যে লিখেছেন।"

রমণী কণ্ঠে বাজিল—"কেন ওঁর কি এখানে যত্ন হয় নাই ?"

জলধর বলিল—যত্নের ত কথা হচ্ছে না। বাপের কাছে যেমন ছেলের যত্ন হয় এমন কি কোথাও হয় ?

আবার স্ত্রী বলিলেন—কি জানি ? এত মেহনত ক'রে ছুটি পেলেন কিছু দিন কল্‌কাতায় থাকা কি উচিত না ?

যুক্তিটা আমার বড় ভাল লাগিল। এত পরিশ্রম করিয়া, সারাদিন পাঠ করিয়া, ইংরাজি, সংস্কৃত, কাব্য, ইতিহাস, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে সময়াতিবাহিত করিয়া একবার বাস্তব জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিব না। স্কটের পার্ব্বত্য চিত্র, রোমাণ্টিক প্রণয়ের বর্ণনা, মিলটনের অপার্থিব চরিত্র বিশ্লেষণ, কালীদাসের বর্ণনা মাধুরী উপভোগের সহিত বাস্তব জগতের একটা পরাধীনতার কঠোরতা, ও স্নেহের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। তাহার পর যদি সামান্য একটু স্বাধীনতা, আর একটু বোধ হয় স্নেহও পাইলাম, তাহা কি ত্যাগ করিয়া আবার পিতার স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ ? এই কয়দিনের মধ্যে জানিতে পারিয়াছিলাম জলধরের স্ত্রীর নাম মৃণালিনী। তিনি যে আমায় স্নেহ করিতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমরা উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক। অবস্থাও উভয়েরই সমান। বোধ হয় তাঁহারও জীবনে নির্জ্জনতা বিরাজ করিত, সমাজের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া তিনিও বোধ হয় স্বাধীনতা পাইতে চেষ্টা করিতেন।

আপনারা এখন ভাবিতে পারেন এ সকল ভীষণ চিন্তা, এ সকল কল্পনার মধ্যে মূর্ত্তিময় পাপের জ্বলন্ত চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। একজন হিন্দু রমণী সামাজিক নিয়ম গুলাকে মনে মনে কঠোর বিবেচনা করে, এরূপ ভাবিয়া আমি সমাজ-দ্রোহিতা করিতেছিলাম। বাস্তবিক আমি তখন পাপ কাহাকে বলে জানিতাম না। আমি লজিক্ পড়িতাম, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞায় লজিকের নিয়ম ব্যবহার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতাম। সুতরাং ন্যায়ের সামান্য নিয়ম দ্বারা আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যাহার সহিত একত্রে এতদিন থাকিতে হয়, যাহার জন্য প্রত্যহ এত পরিশ্রম করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হয়, যাহার আহার না হইলে স্বয়ং খাইতে পারি না, তাহার সহিত সমাজের নিয়মের অন্তরায় জন্য কথা কহিতে না পাওয়া, তাহার সম্মুখে বাহির হইতে হইলে অবগুণ্ঠনে শ্রীমুখের লাবণ্য লুক্কায়িত করা অপেক্ষা কাঠিন্য ও বাতুলতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যখন এই প্রাচ্য বর্ব্বরতার সহিত উন্নতিশীল সুসভ্য ইংরাজ-

দিগের রীতিনীতি আচার ব্যবহার তুলনা করিতাম তখন বুঝিতাম ইংরাজ জাতি আমাদিগের অপেক্ষা কত উচ্চ, কত সভ্য।

(৪)

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহে আসিয়া দেখিলাম জলধরবাবু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম—কি জলধর বাবু, খবর কি ?

জলধরবাবু বলিলেন—আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম। আপনারা বিদ্বান লোক। আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—বাঃ বেশ। আপনারা পৃথিবীর কত দেখিয়াছেন, আমাদের মতের কি আর দাম আছে ?

জলধরবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ। আমার স্ত্রীর সহিত আমার মতদ্বৈধ হইলেই সে আপনাকে মধ্যস্থ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

গৃহের যে দিকটা অন্ধকার আমি সেই দিকে ফিরিলাম। ভয় হইল পাছে জলধর আমার দৌর্ব্বল্যটা বুঝিতে পারে। হৃদয়টা সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল—হস্তটা ঈষৎ কাঁপিতেছিল। মনে মনে আত্মপ্রসাদের সহিত একটা অজানা ভয় অনুভব করিতেছিলাম।

জলধর বলিলেন—জানেন তো আজ কাল যজমানি করে বড় একটা কিছু হয় না। একটা ছাপাখানায় একটি কাজ জোগাড় করেছি। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা সেই কাজটি করি।

বলা বাহুল্য, ছাপাখানার চাকুরিতেও যে তাহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে আমার এরূপ বোধ হইল না। কিন্তু মনে করিলাম যে স্বামীর ব্যবসায় নির্দ্ধারিত করিবার স্ত্রীর একটা স্বত্ব আছে। বুদ্ধিমান ইংরাজ জাতির সমাজে এ নীতির প্রচলন আছে। সুতরাং জলধরকে বলিলাম যে তাহার পক্ষে ছাপাখানার কার্য্য করাই শ্রেয়।

তাহার পর জলধরের জীবনের একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হইল। সে অঙ্গে পিরাণ দিয়া, পদদ্বয় পাদুকাবৃত করিয়া প্রত্যহ ১০টার সময় অফিস যাইতে আরম্ভ করিল। তখন বুঝিলাম কেন মৃণালিনী জলধরকে ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিল। তাহার স্বামীকে অপরাপর ভদ্র শ্রেণীস্থ বাঙ্গালীর মত সাজগোজ করিয়া, অফিসে যাইতে দেখিবার আশা পূর্ণ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে এ বাসনা উদিত হইয়াছিল।

(৫)

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—হীরু শুনেছ বোস্‌জা মহাশয় আরও তিন মাস পরে আসিবেন।

কথাটায় আমার হৃদয়টা গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পিতাকে তিন মাস দেখিতে পাইবনা, বলিয়া যে কোনও রূপ পীড়া উপস্থিত হইল তাহা নহে। আবার তিন মাস এই পরের বাড়ী পানাহার করিতে হইবে, এখনও তিন তিন মাস সলজ্জ ভাবে অপরিচিতের পরিবার মধ্যে বাস করিতে হইবে আরও তিন মাস এই পরোপকারিণী ব্রাহ্মণতনয়াকে আমার জন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া একটু সঙ্কুচিত হইলাম।

বোধ হয় জলধর ভট্টাচার্য্য আমার মনোভাব বুঝিলেন। তিনি বলিলেন "কেন হীরালাল এখানে কি তোমার অযত্ন হয়?"

আমি অপ্রতিভ ভাবে চক্ষু তুলিলাম। ঠিক জলধরের পশ্চাতেই তাঁহার স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিলাম অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তিনি তাঁহার কাতর চক্ষু দুটি দিয়া আমাকে দেখিতেছিলেন। আমার মত সপ্তদশ বর্ষীয় বালকের পক্ষে সে দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইলেও বুঝিলাম সে অনির্ব্বচনীয় কাতর ভাবাপন্ন দৃষ্টিটার একটা আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। সুতরাং জলধর বাবুকে বলিলাম—"আজ্ঞে না, আপনারা দুজনে আমাকে যেরূপ যত্ন করেন সেরূপ যত্ন আমি ঘরেও পাইনা।" আর একবার তাঁহার স্ত্রীর প্রতি চাহিলাম। দেখিলাম লজ্জিতা হইয়া তিনি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য দম্পতী যতই আমার উপর স্নেহের মাত্রাটা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল, আমার মানসিক অবস্থাটা ততই ভীষণ হইতে লাগিল। পিতা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে কেবল তাহাদের নিকটে আমি দুই বেলা আহার করিব। সুতরাং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমাকে আহার করাইয়াই তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিত। বলা বাহুল্য ভট্টাচার্য্যগৃহিণী প্রথম প্রথম আমার সম্মুখে বাহির হইতেন না। তাহার পর জলধরের অনুরোধে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া সমুদায় দ্রব্যাদি দিয়া যাইতেন। কিন্তু যেরূপ পারিপাট্য সহকারে, যে প্রকার যত্নের সহিত তিনি আমাকে ভোজন করাইতেন, তাহাতে আমার নিকট তিনি এক স্বর্গীয়া রমণী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। বোধ হয় স্ত্রী-প্রকৃতিই ঐরূপ; তাহাদের অন্তঃকরণ বোধ হয় সাধারণতঃই স্নেহে পূর্ণ। কিন্তু যখন মৃণালিনী আপনার কর্ত্তব্যের গণ্ডী ছাড়িয়া আমার অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিল তখন আমি স্থির করিলাম আর এস্থলে বাস করিব না।

পিতা যদি না আইসেন তাহা হইলে আমি স্বয়ং কাশী যাইব। ভট্টাচার্য্য পরিবারের সংসর্গ ত্যাগ করিবার আমার অপর একটি কারণ ছিল। বলিতে লজ্জা করে, আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম আমার জীবনের প্রত্যেক সুখ চিন্তার সহিত কেমন সেই ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর সুললিত দেহলতা, তাহার সেই উজ্জ্বল অথচ কাতর দৃষ্টি, তাহার সেই বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠ স্বরটী মিশ্রিত হইয়া যাইতেছিল। এত দিন পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। তাই জলধরের নিকট পিতার আগমন সংবাদ পাইয়া হৃদয় গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মনের মধ্যে যে সকল চিন্তা উদিত হইত সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, অধ্যয়ন করিয়া, ন্যায়ের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে আমার আপনার উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যায়।

(৬)

সে দিন প্রভাতে ভ্রমণ করিতে যাই নাই। পিতাকে পত্র লিখিতেছিলাম। লিখিয়াছিলাম অনেক কথা—লিখিয়াছিলাম "আপনার স্নেহের সন্তান অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার মানসিক নির্ম্মলতা বিনষ্ট হইয়াছে, সে পাষণ্ড, তাহাকে কাশী লইয়া যান আর না হয় ত আপনি কলিকাতায় আসুন'। যদি তাহাও না করিতে পারেন বাটিতে অপর ভাড়াটিয়া আনুন।"

চিঠিখানি মুড়িয়া বন্ধ করিতে গিয়াছি এমন সময় মৃণালিনীর কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"আমি বল্‌ছি ৯টা বেজেছে বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।"

এরূপ জজীয়তি করা ইদানীং আমার পক্ষে একটা কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমার সত্যবাদিতা একেবারে বিলুপ্ত হইতেছিল। আমি যদি সেই নিয়মানুসারে রায় দিতাম তাহা হইলে এই ৮ ঘটিকাকে আমায় ৯ ঘটিকা বলিতে হইত। কিন্তু আজ আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং যখন জলধর জিজ্ঞাসা করিল "বেলা কত?" আমি বলিলাম ৮ ঘটিকা।

কথাটা ভাল হইল না। একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলাম অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে দুইখানি কাতর আঁখি আমার জানালার দিক হইতে সরিয়া গেল। আমি ভাবিলাম এ দৃষ্টির একটা অর্থ জানিতে হইবে। সুতরাং অত কষ্টে লেখা পত্রখানা পিতাকে না পাঠাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। তাহার পরিবর্ত্তে লিখিলাম "বাবা, কলিকাতায় বেশ আছি, শাস্ত্র পরীক্ষার ফল বাহির হইবে বলিয়া কাশী যাইতে ইচ্ছা নাই। ফল বাহির হইলে যাইব। আপনি ও পিসিমা প্রণাম জানিবেন।"

(৭)

সে তারিখটা আমার অদ্যাপি স্মরণ আছে। জীবনে বোধ হয় ১৭ই যে তারিখটা কখনও ভুলিব না। দ্বিপ্রহরের সময় বেশ গরম ছিল সুতরাং সারা দুপুর ঘুমাইয়া বৈকালে একটু ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। হেদুয়ার ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, দেখিলাম সকলেরই হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ, সকলেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে কবে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। আমার হৃদয়ে একটা ভীষণ যাতনা হইল। সেই বিমলস্বভাব উন্নতিশীল যুবকবৃন্দ হইতে আমি কত নিম্নে পতিত হইয়াছি তাহা ভাবিয়া হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ বেদনা সমুত্থিত হইল। আপনাকে স্বর্গভ্রষ্ট মন্দমতি শয়তানের সহিত তুলনা করিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম আজই রাত্রে কাশী চলিয়া যাইব। তাহা হইলেই প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব। সুতরাং আর ভ্রমণ করা হইল না, বন্দোবস্ত করিবার জন্য গৃহে ফিরিলাম।

ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। অলিন্দে আসিয়া দেখিলাম আমার গৃহের দ্বার মুক্ত। ভাবিলাম দাসী গৃহ পরিষ্কার করিতেছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম অন্যমনে মৃণালিনী টেবিলের উপর আমার পুস্তকগুলি সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেছে। আমাকে দেখিয়া সেও স্তম্ভিত হইল। চকিতের মধ্যে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া অবনতমুখী হইল।

একবার মনে করিলাম দ্বার ছাড়িয়া দিই। আবার ভাবিলাম না, তাহা হইতে পারে না। একবার জিজ্ঞাসা করিব তাহার স্নেহের অর্থ কি, তাহার সে কাতর চাহনির উদ্দেশ্য কি ? শুনিয়াছি মানুষের খুন চাপে। আমার স্কন্ধে তখন শয়তান চাপিয়াছিল। তাহার প্ররোচনায় আমি অগ্রসর হইলাম।

কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু সকলই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কথা কহিতে পারিলাম না। আর একটু অগ্রসর হইলাম। মৃণালিনীও সরিয়া গেল।

এবার ভাষা আসিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন বরষার স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে ধাবিত হয়, সেই রূপ কত রুদ্ধ আবেগ, কত মধুর ভাষা, কত তিরস্কার মুখে আসিতে লাগিল। কম্পিত হস্তটা টেবিলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম—এখানে কি হ'চ্ছিল বউ ?

মৃণালিনী সলজ্জভাবে অবগুণ্ঠনটা আরও টানিয়া দিল।

তখন কণ্ঠে সরস্বতী স্বয়ং বীণারঞ্জিত হস্তে সমাসীন হইয়াছিলেন। আমি বলিলাম—একি বৃথা লজ্জা। একত্র এতদিন বাস করিতেছি, এতদিন তুমি আমার পরিচিত, বোধ হয় মনে মনে আমার সহিত কথা কহিবারও তোমার ইচ্ছা আছে, তবে তুচ্ছ দেশাচারের জন্য একটা কহিতে কি আপত্তি ?

মৃণালিনী এবারও উত্তর দিল না। আমার আর ধৈর্য্য রহিল না। তাহার স্কন্ধে একটা কম্পিত হস্ত দিয়া বলিলাম—বৌ—

ঠিক সেই সময় গৃহদ্বারে কে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম—পিতা ! ভয়ে বিস্ময়ে লজ্জায় চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া পড়িলাম।

পিতার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি খানি দেখিলাম। তাঁহার চক্ষে রোষের লেশ মাত্র দেখিলাম না ! কেবল দেখিলাম—বিস্ময়।

আর মৃণালিনী—ভূমে বসিয়া কাতরা যুবতী ক্রন্দন করিতেছিল।

(৮)

সারাদিন নিদাঘের উত্তাপে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কার্য্যশেষে একটি বন্ধুর সহিত ময়দানে বায়ু সেবন করিতেছিলাম। দুই জনে শ্যামল তৃণরাজির উপর মৃদুমন্দ পদচারণা করিতেছিলাম, শীতল শান্তিপ্রদ দক্ষিণ বায়ু আসিয়া আমাদিগের শ্রান্তি দূর করিতেছিল। সম্মুখে দলে দলে ইংরাজ নর নারীও আমাদিগের মত বেড়াইতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—ইংরাজদের স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া বেড়াইবার প্রথাটী বেশ। আমাদের সমাজে এ প্রথা চলিলে বেশ হয়।

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম—ও কথা স্বপ্নেও ভাবিও না। যদি আর্য্য সভ্যতার পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি অদ্যাবধি এ প্রথা চলিয়া আসিত তাহা হইলে কি হইত বলিতে পারি না। কিন্তু এখন আমরা গৃহের ব্যতীত অপর রমণীর সহিত একত্র বাস করিবার আদৌ উপযুক্ত নই।

এ বিষয়ে অবশ্য বন্ধুর সহিত একটা মহা তর্ক হইল। উত্তেজনায় আমি বলিলাম—এই দেখনা আমিই আজ দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যৌবনে ঐরূপ স্বাধীনতা কল্পনা ক'রে ভুল বুঝে একটা জঘন্য ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। শেষে ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য এইবার বন্ধু ধরিয়া বসিলেন। আমি সেই নিদাঘ সন্ধ্যায় সেই ১৭ই মের ঘটনার কথা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিয়া ফেলিলাম।

বন্ধু বলিলেন—তাহার পর কি হইল? আমি বলিলাম, সে টুকু কল্পনা করা বড়ই সহজ। বিজ্ঞ পিতা কোনও ওজর করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাস পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

বন্ধু বলিলেন—তার পর তাহাদের দেখিয়াছিলে?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ। তাহার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাদের শান্তিময় গৃহে একবার গিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য্যের দুইটি নবনীত দেহ শিশু দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম মৃণালিনীর পতিভক্তি, তাহার স্নেহ এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে।

বন্ধু স্থির হইয়া শুনিতেছিল। আমার কথার শেষেও সে কোন উত্তর করিল না। বোধ হয় আমাদের গল্পটার বিষয় সে ভাবিতেছিল।

আমি বলিলাম—গল্পের এক অংশ এখনও বলি নাই। পিতা বাল্য বিবাহের অপক্ষপাতী হইলেও উক্ত ঘটনার ছয় মাসের মধ্যে আমার বিবাহ দিলেন।

বন্ধু অন্যমনে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—তাহা হইলে শাপে বর হইল বল?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

আগ্রায় যমুনা দেখিয়া।

কোথা সে লহরীলীলা শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যায়,
যমুনে লো আগরা পুলিনে,
অস্ফুট রজত-রেখা ক্ষীণ সূত্র প্রায়,
ও বরাঙ্গ এ ঘোর দুর্দ্দিনে!
কোথা ওই সৌধছায়া সুরম্য ধবল,
নীরবক্ষে অঙ্কিত তোমার;
কোথা সে হৃদয়হারী সমীর চঞ্চল?
উড়াইছে অঞ্চল শোভার!
ফুল্ল শিল্পপারিজাত এ কীর্ত্তিনন্দনে,
স্মৃতির সৌরভে বিকশিত;
কনক কুসুমকান্তি মুকুতা-যৌবনে,
রহিয়াছে চির প্রস্ফুটিত!
তুমি কি বিরাগে বালা সেজেছ যোগিনী,
কোথা রূপ? তরঙ্গের ধার;

বিজন বিপিন মাঝে যেন্ উদাসিনী,
বক্ষে লয়ে বিষাদের ভার!
যমুনে! আর কি ভাল লাগেনা নয়নে
সৌন্দর্য্যের ছবি সমুজ্জ্বল,
মাধুর্য্যে মন কি আর মজেনা ললনে,
হৃদয়ে কি ভরা হলাহল!
জগতে নিরখি শুধু কাল বলবান!
রাজরাণি হ'লে ভিখারিণী,
ভুলিয়া সে অতীতের স্মৃতি সুমহান্;
ভালবাস এ চিরযামিনী!
নিভেছে আলোক-! বুঝি ভাল এ আঁধার,
রাজ্য চেয়ে ভাল এ শ্মশান!
ভাল সে মুক্তির চেয়ে অন্ধ কারাগার,
শশী চেয়ে রাহুর বয়ান!
রমণী হৃদয়খানি প্রেমে আত্মহারা,
মিলে যদি প্রণয় আধার,
বরষা বরিষে, হেরি, হরিষে সুধারা,
ধরা বক্ষ মরুভূ তৃষার!
স্তিমিত প্রদীপ শোভে শ্মশানে সন্ধ্যায়,
জীর্ণমঠে ধুতুরার ফুল,
ভাল সে বৈধব্য বাস শুভ্র সুষমায়,
হর অঙ্গে অজিন অতুল!
বিশুষ্ক লাবণ্যে কত কারুণ্য তোমার,
বুঝিবে যে দেখিবে নয়নে,
জীবনে মরণে কভু নহে ভুলিবার,
মগ্নচিত্ত উচ্ছ্বাস প্লাবনে!
সৈকতে শোভিত তাজ সৌধ মহিমায়,
দুর্গচূড়া পরশে গগন!
যদি না চুম্বিত তব তরঙ্গের ধার
স্বর্গ কোথা হেরিত ভুবন!
স্মৃতি অবশেষে ক্ষীণ স্মৃতিটুকু তব
জ্বলে ওই ত্রিদিবমন্দিরে,
জ্বলে রত্নদীপাবলী নিত্য অভিনব,
একাকিনী কালের তিমিরে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা।

মোগল সম্রাট বাবর।

সুলতান বাবর দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত মধুর, তাঁহার বদনখানি অতিশয় সুন্দর এবং তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত অমায়িক ছিল।—ফিরিস্তা।

সুলতানের যথেষ্ট কবিত্বশক্তি ছিল। বাবর আপনার মাতৃভাষা তুরকীতে এবং পারস্য ভাষায় সুপাঠ্য কবিতাবলী রচনা করিতেন। তাঁহার স্বলিখিত ইতিহাস "তুজুকী বাবরী" ইতিহাস জগতে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ইহাকে বহুমূল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অল্প বয়সেই বাবর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে ইন্দিজান রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন।

বাবরের পিতা সুলতান উমর সেখ্ মির্জ্জা পারাবত গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া কালকবলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র সুলতান হুমায়ুনও দিল্লি-প্রাসাদের সোপান হইতে পড়িয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

অন্যতম আফগান সেনাপতি দৌলত খাঁ হিন্দুস্থানে বাবরের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য লাহোর সন্নিকটে রবিতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে ভীত হইয়া তিনি মালবাত (Malwat) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দৌলত খাঁ বাবরের যুদ্ধনৈপুণ্যে মালবাত দুর্গ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পরে বাবর তাঁহাকে আপন দলভুক্ত করিয়া

লইয়াছিলেন। বিজয় গর্ব্বিত মোগল সৈন্ত কিন্তু উন্মুক্ত দুর্গদ্বার দ্বারা নগরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। শোণিতপিপাসু নরশার্দ্দুল-গুলাকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া বিজয়ী সুলতান স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া উন্মত্ত সৈন্যবৃন্দকে দমন করিতে ছুটিলেন। কঠোর না হইলে দৌলতের পরিবারের সম্মান রক্ষা করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া একস্থলে তিনি তীর নিক্ষেপ করিয়া আপন সন্তান হুমায়ুনের অধীনস্থ একজন সুদক্ষ সেনানায়ককে হত্যা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বাবর দৌলত খাঁর পুত্র গাজি খাঁ সংগৃহীত একটি বহুমুল্য পুস্তকাগার রক্ষা করিয়াছিলেন।—ফিরিস্তা।

দিল্লী জয় করিবার পর বাবর স্বভাবতঃ হিন্দুস্থানের রাজকোষ অধিকার করিলেন। রাজকোষ হইতে প্রিয় কুমার হুমায়ূনকে সুলতান সার্দ্ধ তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় মোহাম্মদ সুলতান মির্জ্জাকে ভারত কোষাগার হইতে বাবর চারিটি ঢাল উপহার দিয়াছিলেন। এই চারিটীর মূল্য দুই লক্ষ টাকা। ইহা ব্যতীত তাঁহার প্রত্যেক যোদ্ধা এবং ওমরাহ পাঠান সঞ্চিত রাজকোষের কতক অংশ পাইয়াছিলেন। ফিরিস্তা বলেন ঐ ধনের কিয়দংশ কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাঁহার কাবুলি প্রজা প্রত্যেকে এক একটী রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল। সমরকন্দ, খোরাসান, কাশগর, ইরাক, মক্কা, মেদিনা, করবলা নজফ, মস্হদ প্রভৃতি তীর্থ স্থানেও বিজেতা বাবর হিন্দুস্থানের রাজকোষ হইতে বিতরণের জন্য অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। এই অমিতব্যয়িতার জন্য বাবর 'কুলন্দর' উপাধি পাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কল্যকার জন্য কিছু রাখে না তাহাকে 'কুলন্দর' কহে।—ফিরিস্তা।

দিল্লি বিজয়ের পর ভারতবর্ষের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক মোগল সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। একজন পাঠান ওমরাহ মোগলের পক্ষ ছাড়িয়া মোগলকে কিছু বিব্রত করিয়াছিল। সুতরাং খাজা কল্লান প্রভৃতি কতকগুলি ওমরাহ কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য সুলতানকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া ছিলেন। তাহাতে বাবর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ অভিসন্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব স্মরণ করিলে সে কথাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়া-

ছিলেন—"যে রাজত্ব অধিকার করিতে এত অধিক কষ্ট হইয়াছে তাহা মৃত্যু ব্যতিরেকে আমার হস্তচ্যুত হইবে না।"—ফিরিস্তা।

হিন্দুস্থানের প্রথম মোগল বাদসাহ বাবর তাইমুর লঙ্গের বংশাবতংশ হইলেও নির্দ্দয় ছিলেন না। আগ্রা সহর পাঠানদিগের নিকট হইতে জয় করিয়া তথায় তিনি পাঠান ভূপতি ইব্রাহিম লোদীর জননীকে বন্দী করিলেন। বাবর যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আগ্রার নিকটবর্ত্তী একটি প্রাসাদে সসম্মানে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহার ধনরত্ন সমস্ত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি তাঁহাকে সপ্তলক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটি পরগণা দান করিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম জননী কিন্তু মোগল প্রাসাদের পার্থিব সুখে সন্তুষ্টা ছিলেন না। যাহার জন্য তাঁহার পুত্রকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছিল, যাহার বিক্রমে তাঁহাকে রাজমাতার উচ্চ আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া সামান্যা বন্দিনীর জীবন যাপন করিতে হইতেছিল তাঁহার দয়ায় পাঠান রাজমাতার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয় নাই। সুতরাং সর্ব্বদাই তিনি বাবরের বিনাশ সাধন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেন।

ইং ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে যুদ্ধ বিগ্রহ কিয়দপরিমাণে প্রশমিত হওয়ায় সম্রাট কথঞ্চিৎ শান্তি পাইয়াছিলেন। তখন অবসর পাইয়া তাঁহার বীর হৃদয়ে সুকোমল বৃত্তিরাশি প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার এক দূত পারস্য সম্রাটের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে তাঁহার নিকট একটি তুরস্ক যোদ্ধা আনিয়াছিলেন। এবং ঐ তুরস্ক যোদ্ধা উপঢৌকন স্বরূপ সুলতান বাবরকে দুইটি কারকেসিয়ান যুবতী প্রদান করিয়াছিল। এই অসামান্যা রূপবতী যুবতীদিগের মাধুর্য্যে বীর সম্রাট মুগ্ধ হইয়াগিয়াছিলেন।

বাবরের অদৃষ্টে কিন্তু শান্তি উপভোগ ছিল না। এই সময় সুবিধা বুঝিয়া ইব্রাহিম জননী যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সফল হইলে বাবরকে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইত। প্রায় সকল দেশেই ভূপতিদিগের খাদ্যদ্রব্য আস্বাদন করিবারজন্য এক এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে। বলা বাহুল্য

মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবরেরও আহার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। ইব্রাহিম লোদীর জননী অর্থদ্বারা ঐ কর্ম্মচারীকে এবং প্রধান পাচককে হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাহাদের সাহায্যে সম্রাটের খাদ্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সম্রাট বিষাক্ত খরগাসের ঝোল সামান্য পান করিয়াই অসুস্থ হইলেন এবং স্তকার করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলের সন্দেহ হইল। পাচক ও খাদ্য-পরীক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোনও কথা স্বীকার করিল না। তখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। দুইটা কুকুরকে ঐ খাদ্য দেওয়ায় তাহারা কালকবলিত হইল। দুইটি মনুষ্যও উহা দ্বারা পীড়িত হইল। তখন আর ভূপতির ক্রোধের সীমা রহিল না। অপরাধী খাদ্য পরীক্ষককে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবার এবং জীবিত অবস্থায় পাচকের গাত্র হইতে ছাল ছাড়াইয়া ফেলিবার জন্য তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন। পাচকের নিম্নতন কর্ম্মচারী দুই চারিজনকে হস্তীপদতলে দলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল। বলা বাহুল্য ইব্রাহিম লোদীর মাতার প্ররোচনায় তাঁহাকে বিষপান করান হইতেছিল, সুলতান এ কথা জানিতে পারিলেন। তখন আর তিনি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া বাবর তাঁহাকে কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং তাঁহার এক বালক পুত্রকে কাবুলে প্রেরণ করিয়া আপনার সিংহাসনের কণ্টক দূর করিলেন। (ফিরিস্তার ইতিহাস ও বাবরের স্বলিখিত তুজুকী বাবরী)

এক এক সময় কিন্তু বাবর অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচয় দিতেন। তাঁহার স্বলিখিত তুজুকী বাবরীতে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন যে রাণা সঙ্গকে জয় করিবার পর তিনি আনন্দ করিবার জন্য যে দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে নিহত শত্রুদিগের খণ্ডিত শির দিয়া একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তারিখি সলাতিনী আফগান নামক ইতিহাসে বাবর সম্বন্ধে একটি নৃশংসতার কাহিনী বিবৃত আছে। একজন কাজী তাঁহার নিকট নালিস করে যে মোহন মন্দাহর তাহার সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। বাবরের আজ্ঞামত তথায় একদল সৈন্য পাঠান হইল। মন্দাহরের অনুচরবর্গ অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেও সম্রাটের সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইল। বিজয়ী মোগল

সৈন্য তখন সমস্ত গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করিল এবং সহস্রাধিক লোককে হত্যা করিয়া প্রায় এক সহস্র বন্দী লইয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বন্দী-দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকগুলিকে সম্রাট মোগলদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া মন্দাহরকে কটিদেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া বাণাঘাতে মারিবার আদেশ প্রদান করেন।

এ গল্পটি কিন্তু সমসাময়িক অপরাপর বৃহত্তর ইতিবৃত্তে নাই। সুতরাং ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা সুকঠিন।

বাবরের স্বদেশ-প্রেম একটা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা। এই প্রসঙ্গে একটি খরবুজা দেখিয়া তাঁহার স্বদেশের জন্য ক্রন্দনের কথাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সে বিষয় কাবুলের শাসনকর্ত্তা খাজা কিলানকে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছিলেন। "সম্প্রতি উহারা আমাকে একটা খরবুজা আনিয়া দিয়াছিল। উহা কাটিবার সময় আমার নির্জ্জনতা স্মরণ করিয়া এবং আমি স্বদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই কথা ভাবিয়া সুতীব্র মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলাম। এবং উহা ভক্ষণ করিবার সময় অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই।" তুজুকী বাবরী। *

সুলতান অতিশয় সুরাপায়ী ছিলেন। তিনি স্বলিখিত ইতিহাসে অনেক সুরাপানের কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। খাজা কিলানকে উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—"পুরাণ সঙ্গী ও সহচরদিগের সহিত একত্র পান করা বড় হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার"।

অপর এক স্থলে সুরাপানের আমোদ বর্ণনা কল্পে তিনি লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যাস্ত অবধি আমরা এই স্থলে বসিয়া পান করিতেছিলাম। তাহার পর আমরা যাত্রা করিলাম। আমাদের দলের সকলেই নেশায় বিভোর। সৈয়দ কাশিম এত নেশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দুই জন ভৃত্য ধরিয়া অশ্বোপরি বসাইয়া বহু কষ্টে শিবিরে আনয়ন করিল। দোস্ত মুহম্মদ বাকেরের

---

* বাবরের স্বলিখিত তুজুকী বাবরী নামক ইতিহাস সম্বন্ধে অর্চ্চনা ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ও নবনূর ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ঐ দুই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুলতান বাবরের অনেক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। লেখক।

এতাদৃশ অবস্থা হইয়াছিল যে মোহাম্মদ তরখান, মস্তি বেহায়া প্রভৃতি যাহারা তাহার সহিত ছিল, বহু চেষ্টাতেও কোনরূপে তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইতে পারিল না। তাহারা তাহার মস্তকে অনেক জল সিঞ্চন করিল কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এইসময় একদল আফগান দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িল। তরখান স্বয়ং নেশায় বিভোর থাকিলেও গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল যে তাহাকে এই অবস্থায় সে স্থলে ফেলিয়া রাখিয়া শত্রুদিগের হস্তে পড়িতে দেওয়া অপেক্ষা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া সেই খণ্ডিত শির লইয়া পলায়ন করা ভাল। আর একবার চেষ্টা করিয়া বহুকষ্টে তাহারা বাকেরকে একটি অশ্বোপরি বসাইয়া অশ্বের মুখ ধরিয়া তাহাকে শিবিরে লইয়া আসিয়াছিল।"

কাবুলের প্রমোদোদ্যানে তিনি মদ্য রাখিবার জন্য একটি হৌজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রাচীরে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত ছিল—

"আমায় কেবল সুরা ও সুন্দরী যুবতী দাও
"অন্যান্য অপর সমস্ত আমোদে আমি পদাঘাত করি।
"যত দিন পার, বাবর, উহা উপভোগ কর
"কারণ যৌবন একবার পলাইলে আর আসিবে না।"

—ফিরিস্তা।

সুলতান বাবরের ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যে সময় সময় পানদোষ জন্য আত্মগ্লানিতে মর্ম্মাহত হইবেন এ কথা সহজেই অনুমেয়। সুলতানের ইতিহাস পাঠেও আমরা সে কথা বুঝিতে পারি। বহুবার বাবর আপনার পানদোষ জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে এই কু-অভ্যাসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরার মোহিনীশক্তি অমিতপরাক্রম বাবরকেও পরাস্ত করিয়াছিল। হিন্দুস্থান জয়ের পর যখন পাঠান এবং রাজ-পুতের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিতেছিলেন তখন এক দিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয় তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইল। তিনি তখনই আপনার স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পানপাত্রাদি সম্মুখে আনাইয়া সেগুলিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দরবেশ-দিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

বাবর চিরকাল ন্যায়নিষ্ঠ ও পরার্থপর ছিলেন। যৌবনে যখন তিনি ফারগণাধিপতি ছিলেন, তাহার রাজ্য মধ্যে খট্টাদেশবাসী একটি বণিক পথিমধ্যে কালকবলিত হয়। বণিকের সহিত বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য ছিল। বাবর সংবাদ পাইয়া ঐ সমস্ত সামগ্রী নিজ হস্তে লইয়া খট্টায় দূত পাঠাইলেন। ইহার দুই বৎসর কাল পরে খট্টা হইতে তাহার উত্তরাধিকারিগণ আসিলে তিনি তাহাদিগকে সমস্ত দ্রব্য বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা সুলতানের জন্য যে নজর আনিয়াছিল তিনি তাহা অবধি গ্রহণ করিলেন না।

বাবর অত্যন্ত ফুল ভাল বাসিতেন, তাঁহার স্বলিখিত ইতিহাসে তিনি অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ইং ১৫২৮ খৃঃ অব্দে বাবর উত্তর পশ্চিম ভারতের কতক অংশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে গয়ালিয়র যাত্রা করেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তী, রাজা মানসিংহের প্রাসাদ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শেষে রহীম দামের উপবনে গমন করেন। তথায় এক প্রকার রক্তবর্ণ ফুল দেখিয়া, সুলতান তখনই তাহার কতকগুলা গাছ আগ্রায় নিজ উদ্যানের জন্য পাঠাইয়া দেন। আগ্রায় বাবর হেস্ত বেহস্ত নামক যে নয়ন মনোহর উদ্যান সৃজন করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনায় তিনি আপনার ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

স্বদেশ উত্তর আসিয়ায় বাবর যেমন তুষারের দৃশ্য দেখিতেন হিন্দুস্থানে আসিয়া তিনি সেরূপ দেখিতে পাইতেন না। কেবল দ্বিতীয়বার হিন্দুস্থানে অভিযানের সময় তিনি শিয়ালকটের নিকট কতক বরফ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাও সামান্য মাত্র। ইহা ব্যতীত তিনি আর বরফ ও তুষার হিন্দুস্থানের কোথাও দেখেন নাই।—তুজুকী বাবরী।

আজকালকার ঘৃণিত বাঙ্গালিগণ তখন আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনায় বেশ বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালীরা নৌকা চালাইতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিল বলিয়া সম্রাট স্বয়ং তাহাদিগের ক্ষুদ্র তরীতে চড়িয়া বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং বলিয়াছিলেন—"বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র নৈপুণ্যের জন্য বাঙ্গালীরা বিখ্যাত। এই অবসরে তাহাদিগকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার অবসর আমরা পাইয়া

ছিলাম। তাহারা এক বিশেষ স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ না করিয়া যথা ইচ্ছা গুলি বর্ষণ করে।

সকল পুত্র অপেক্ষা বাবর হুমায়ূনকে অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যার সময় সম্রাট হুমায়ূনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই সময় বসিয়া তিনি পান করিতেছিলেন। সুতরাং সাহজাদা হুমায়ুন আসিবার পূর্ব্বেই তিনি অচৈতন্য হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্য রাত্রে সুলতানের নেশা ছাড়িলে তিনি দেখিলেন শয্যার পার্শ্বে কুমার দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বাবর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কখন আসিলে?" হুমায়ূন উত্তর করিলেন—"কেন যখনি আপনি আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন আমি তখনই আসিয়াছি।" তখন বাবরের সন্ধ্যার ঘটনা স্মরণ হইল এবং তিনি পুত্রের কর্ত্তব্যজ্ঞানে চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"যদি ভগবান তোমাকে রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট প্রদান করেন তাহা হইলে তোমার ভ্রাতৃগণকে বিনাশ না করিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও।"

বাবরের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মৃতদেহ কাবুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তথায় তাঁহার সমাধি হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ট্রাভারনিয়ো ও নবাব সায়েস্তা খাঁ।

বিখ্যাত পর্য্যটক ট্রাভারনিয়ো যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তদীয় মাতুল(১) নবাব সায়েস্তা খাঁর হস্তে বঙ্গদেশের শাসন ক্ষমতা বিন্যস্ত ছিল।

---

(১) সায়েস্তা খাঁ নুরজাহানের জ্যেষ্ঠ সহোদর আসিকজার পুত্র; সম্রাট সাজাহানের সহিত তদীয় সহোদরার বিবাহ হওয়ায় ঔরঙ্গজেব ও তদ্ ভ্রাতা দারা, সুজা ও মুরাদ প্রভৃতির মাতুল হইতেন। অধিকন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শানাভাজ খাঁর দুই কন্যার সহিত যথাক্রমে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও যুবরাজ মুরাদের বিবাহ হওয়ায় সায়েস্তা খাঁ তাঁহাদের শ্বশুরের পদও অধিকার করেন। এই তাতার পরিবার মোগল রাজ বংশের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তদ্রূপ কোন আগন্তুকই হইতে পারেন নাই।—লেখক।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর তারিখে ট্রাভারনিয়ো আগ্রানগরী হইতে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। তৎকালে ঢাকা বঙ্গের রাজধানী ছিল। সুলতান সুজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ঔরঙ্গজেব স্বীয় নামানুসারে ঔরঙ্গাবাদ নামে যে নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই নগর অতিক্রম করিয়া আসিয়া, ট্রাভারনিয়ো সম্রাটের চিকিৎসক ও অন্যতম বৈদেশিক পর্য্যটক বোনিয়ো ও তদীয় সহচর রাচিপটের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তৎপর সকলে এলাহাবাদ, পাটনা, বেনারস প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করতঃ রাজমহলে উপনীত হন। রাজমহল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত; গঙ্গার ঘাট হইতে সহরে প্রবেশের প্রস্তরময় এক রাজবর্ত্ম ছিল। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তাগণ এই স্থানেই অবস্থান করিতেন ট্রাভারনিয়ো বলেন যে, রাজমহল মৃগয়ার উপযুক্ত একটী সুন্দর স্থান এবং একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গা বিভিন্ন গতি অনুসরণ করায়, সহর হইতে এক লিগেরও অধিক দূরান্তরিত হইয়াছে। তজ্জন্য এবং আরাকান-রাজকে বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত, বঙ্গে শাসনকর্ত্তা এবং বণিকবৃন্দ ঢাকা নগরীতে বাসস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। আরকানরাজও বহুতর ফিরিঙ্গি জলদস্যু গঙ্গারমোচেনা হইতে সুদূর ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত দস্যুতা করিয়া বেড়াইত।

গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া পর্য্যটকগণ গঙ্গাবারি মিশ্রিত করতঃ এক পেয়ালা করিয়া সুরা পান করেন; কিন্তু তাহাতে নাকি তাঁহাদের উদরের যন্ত্রনা উপস্থিত হয়। গঙ্গাজল পান করিয়া তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের অবস্থা নাকি আরো শোচনীয় হয়। গঙ্গা-তীরে একঘর হলান্দর বাস করিত, তাহারা আগুণে না ফুটাইয়া গঙ্গা-জল পান করিত না। কিন্তু এতদ্দেশবাসিগণ বাল্যকাল হইতে এই জল পানে অভ্যস্থ থাকায় তাহাদের কোনই কষ্ট হইত না; এবং সম্রাট হইতে কুটীর বাসী পর্য্যন্ত সকলেই এই জল ভিন্ন অন্য পানীয় ব্যবহার করিত না। অসংখ্য উষ্ট্র সম্রাটের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রত্যহ গঙ্গা-জল বহন করিয়া লইয়া যাইত। (১)

(১) When we came to Ganges, we drank every one of us a glass of wine, mixing some of the river-water with it; which caused a gripping in our bellies: * * * But for the natural inhabitants of the country, they are so accustomed to it from their youth, that the King and the court drink no other." ট্রাভারনিয়ো-গঙ্গা-বারির নিন্দা করিলেও বহুতর ঐতিহাসিক গ্রন্থে

রাজমহল হইতে পর্য্যটকগণ পৃথক হইয়া পড়েন; বর্ণিয়ো কাশিমবাজার হইয়া স্থলপথে হুগলী উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং ট্রাভারনিয়ো তক্তিপুরে রজনী যাপন করেন। রজনী প্রভাত হইলে নদী সৈকতে তিনি প্রভূত কুম্ভীর দেখিতে পান। এই স্থান হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত নানাস্থানে অসংখ্য কুম্ভীর ট্রাভারর্ণিয়ের দৃষ্টিগোচর হয় এবং কোন কোন স্থানে বন্দুকের সাহায্যে উহাদের দুই একটীর প্রাণ-নাশের প্রবৃত্তিও তিনি দমন করিতে পারেন নাই।

রাজমহল হইতে যাত্রা করিয়া ছয় দিনে ট্রাভারনিয়ো ঢাকার নিকটবর্ত্তী হন। অপরাহ্নে ঢাকা হইতে দুই লিগ দূরবর্ত্তী উত্তর পূর্ব্ব প্রবাহিত 'লাকুইয়া' নামক এক নদীতে আসিয়া পড়েন। অপর একটী নদীর সহিত ইহার সঙ্গম-স্থলের উভয়পার্শ্বেই একটী করিয়া দুর্গ, কতিপয় গোলা মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। অর্দ্ধলিগ নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইয়া 'পাগালু' নামক আর একটী নদী দৃষ্টিগোচর হয়; তদুপরি মীরজা মোল্লার সাহায্যে একটী ইষ্টক-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধলিগ পরে 'কদমতলি' নামক আর একটী নদী উত্তর-পূর্ব্ব প্রবাহিত। এই সমুদয় জল-ধারার উভয় পার্শ্বেই বহুতর স্তম্ভ-শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে এবং শেষোক্ত নদীটির উপরও একটী ইষ্টক-সেতু বিদ্যমান ছিল।

ঠিক সন্ধ্যা-সময়ে ট্রাভারনিয়ো ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা দৈর্ঘ্যে দুই লিগেরও অধিক কিন্তু উহার প্রশস্ততা একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বোক্ত ইষ্টক-সেতু হইতে ও সুদীর্ঘ এক পংক্তিতে অধিবাসিগণের বসত বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাদের অধিকাংশই সূত্রধর—ছোট বড় নানা জাতীয় নৌযান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহাদের গৃহগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ব্যতীত আর কিছুই নহে;—বংশদণ্ডের উপর খড়ের ছাউনী চাল সংরক্ষিত ও মৃত্তিকার দেয়ালে পরিবেষ্টিত। ঢাকাস্থ মোগলশাসন-কর্ত্তার আবাস স্থল উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত; উহার মধ্যস্থলে আবাস-ভবন অবস্থিত, তাহাও কাষ্ঠ নির্ম্মিত—এক রকম শোচনীয় বলিলেই হয়। শাসন-কর্ত্তা সাধারণতঃ উক্ত পরিবেষ্টিত স্থলের প্রাঙ্গণে সংস্থাপিত তাম্বুর মধ্যেই বাস

উহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। "রিয়াজ-উস-থাল্যাতিনে" লিখিত আছে,—"প্রকৃত কথা এই যে, গঙ্গার জলের মত আর কোন নদীর জলই সুস্বাদুঃ তৃপ্তিজনক ও তরল নহে। গঙ্গার জল উত্তোলন করিয়া বহুদিন রাখিয়া দিলেও উহা নষ্ট হয় না অথবা উহা হইতে কোন দুর্গন্ধ নির্গত হয় না।"—রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ ১৭ পৃষ্ঠা—লেখক।

করেন। ওলান্দাজ ঢাকার সাধারণ গৃহে পণ্য দ্রব্যসমূহ রক্ষা করা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহাদের দেখা-দেখি ইংরেজ-বণিকগণ কর্ত্তৃকও তদনুরূপ একটী গৃহ এবং একটী গির্জ্জাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে।

ট্রাভারনিয়ো শেষবার যখন ঢাকায় উপনীত হন, তখন নবাব সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তাপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সায়েস্তা খাঁকে শাসন ভার গ্রহণ করিয়াই আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হয়। ট্রাভারনিয়ো বলেন যে, তাঁহার দুই শত বড় নৌ-জাহাজ এবং বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ছিল। সায়েস্তা খাঁ আরাকান-রাজের কতিপয় সেনাপতিকে স্বপক্ষভূত করিয়া লন; তাহাদের অনেকে মোগল সৈন্যদলে প্রবেশ করতঃ নৌবহর পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে মোগলদিগের চল্লিশখানি নৌ-বহর পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কর্ত্তৃক চালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল পর্ত্তুগীজগণ যাহাতে মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শান্ত ও বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করে, তাহার নিমিত্ত সায়েস্তা খাঁ দেশীয় সৈন্য ও সেনানীগণের অপেক্ষা তাহাদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। এই নৌ-যানগুলি যেরূপ দ্রুতবেগে সলিলরাশি ভেদ করিয়া যাতায়াত করিত, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোন কোনও তরণীতে পঞ্চাশখানি দাঁড় থাকিত, এক এক দাঁড়ের দুই দুই জন দাঁড়ি ছিল। নৌ-যানগুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত এবং স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি দ্বারা খচিত। পর্ত্তুগীজদিগের মাল বহনের জন্য এইরূপ কতিপয় নৌযান ছিল এবং কার্য্য বাহুল্য উপস্থিত হইলে তাহারা কখন কখনও নৌকা ভাড়া করিয়াও সংগ্রহ করিত।

ঢাকায় উপনীত হইবার পর দিন ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ট্রাভারনিয়ো নবাব-দর্শনে গমন করেন এবং স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ, তরবারী এবং একটী মূল্যবান ও সুদৃশ্য এমারেল্ড প্রস্তর উপঢৌকন প্রদান করেন। সন্ধ্যার সময় ট্রাভারনিয়ো নিজ বাসস্থান—ওলান্দাজদিগের কুঠিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নবাবের নিকট হইতে গ্রানেট্, চীনা-কমলালেবু, ২টী পারস্যদেশীয় তরমুজ এবং তিন প্রকারের পেয়ারা উপহার স্বরূপ তাঁহার নিকট সমাগত হয়। পর দিন ট্রাভারনিয়ো নিজের পণ্য সামগ্রী লইয়া পুনরায় নবাব-সকাশে সমুপস্থিত হইয়া তৎসমুদয় নবাব ও তৎপুত্র নবাবজাদাকে প্রদর্শন করেন। তিনি নবাবজাদা—দশমবর্ষীয় সুন্দর বালককে স্বর্ণ বিমণ্ডিত আধারসহ একটি ঘড়ি, রৌপ্য-খচিত

এক জোড়া পিস্তল এবং একখানি সুন্দর আয়না-গ্লাস উপহার দেন। তিনি পিতা পুত্রকে এই ভাবে যে সকল দ্রব্য প্রদান করেন তাহার মূল্য পাঁচ হাজার লাইভ্‌রেস (Livres) মুদ্রার কিছু বেশী।

পর দিন ট্রাভারনিয়ো নবাবের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করেন। তিনি ওলান্দাজগণের নিকট অবগত হন যে, ঢাকা হইতে কাশিমবাজারে জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই টাকা লইয়া যাতায়াত করা বিপজ্জনক। স্থলপথে দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাব এবং জলপথের নৌকার মাঝিমাল্লারাও পূর্ব্বোক্তিয়দিগের এক অভিনব সংস্করণ। যে প্রকার নৌকা তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহা বায়ু তাড়নেই উল্‌টাইয়া যাইত এবং কোন ব্যক্তি টাকা কড়ি লইয়া নৌকায় উঠিলে এবং তদ্বিষয় মাঝিরা অবগত হইলে, তাহারা নিজেরাই কৌশল করিয়া নৌকাখানিকে নদী বক্ষে উল্‌টাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিত এবং পরে জল মধ্য হইতে নিক্ষিপ্ত ধনরাশি উত্তোলন করতঃ বণ্টন করিয়া লইত। এইরূপ অসুবিধাও বিপদের জন্য ট্রাভারনিয়ো ঢাকাতে ঐ সকল জিনিষের মূল্য গ্রহণ না করিয়া কাশিমবাজার হইতে পাওয়ার জন্য একখানি পরওয়ানার প্রার্থনা করেন ও অবশেষে তাহা প্রাপ্ত হন। নবাব তৎপ্রতি বিশেষ সৌজন্যতা প্রদর্শন করেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় দেন। ওলান্দাজ পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকরা তাঁহাকে এক বিদায়-ভোজ প্রদান করেন। তৎপর কতিপয় দিবস ঢাকায় অবস্থান করতঃ প্রায় এগার হাজার টাকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ট্রাভারনিয়ো ২৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঢাকা পরিত্যাগ করেন; ওলান্দাজগণ তাঁহার সহিত সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া দুই লিগ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন। ত্রয়োদশ দিবস ক্রমাগত জলপথে অগ্রসর হইয়া পরবর্ত্তী মাসের ১১ই তারিখে তিনি আসেরড্‌ (Acerat) নামক স্থানে অবতরণ করেন। পরে তথা হইতে অপর এক নৌকায় মিরজাপুর নামক এক বৃহৎ গ্রামে উপনীত হন। ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি নিজের জন্য একটী যৌটক ভাড়া করেন এবং মাল পত্র বহন করার নিমিত্ত দুইটী বলিষ্ঠ রমণী নিয়োগ করেন। এই দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি কাশিমবাজারে উপনীত হইলে ওলান্দাজ কুঠিসমূহের বঙ্গদেশীয় ডিরেক্টর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বভবনে লইয়া যান।

১৫ই তারিখে ওলান্দাজগণের নিকট হইতে একখানি পাল্কী লইয়া তাহাতে আরোহণ করতঃ তিনি কাশিমবাজার হইতে তিন লিগ দূরবর্ত্তী মাদেসো-বাশরকি

(Madesou-Basarki) নামক স্থানে গমন করেন; তথায় নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রতিনিধি অবস্থান করিতেন। তিনি প্রতিনিধির সকাশে উপস্থিত হইয়া নবাব প্রদত্ত অর্থ প্রদানের পরওয়ানাখানা তাহার হস্তে অর্পণ করিলে, প্রতিনিধি বলেন যে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে এই টাকা প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু গত পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি নবাবের নিকট হইতে এই টাকা প্রদানের নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার পুনরাদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে টাকা দিতে পারেন না। নবাব কেন যে টাকা দিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। ট্রাভারনিয়ো নবাবের এই ব্যবহারে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিমর্ষ চিত্তে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন ট্রাভারনিয়ো ঢাকার নবাবকে পত্র লিখেন যে, কেন তিনি তাঁহার প্রতিনিধিকে তাহার প্রাপ্য টাকা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি তৎ-সহ ওলন্দাজদিগের ডিরেক্টরের নিকটেও একখানি পত্র প্রেরণ করেন। ডিরেক্টর নবাবকে লিখেন যে, তিনি এই বণিককে বিশেষরূপে জানেন; তিনি তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে আকাদাবাদে (Acadabat)—ডেকানের সৈন্যদলে এবং অপরাপর স্থানে বহুদিন একত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করা একান্তই অসঙ্গত। নবাবের বিবেচনা করা উচিত যে, কেবল ট্রাভারনিয়োই ইয়ুরোপের মূল্যবান ও বিরল প্রাপ্ত দ্রব্যনিচয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভারতীয়-গণের নিকট স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় বেশী দিন ধরিয়া তাঁহার জিনিসের মূল্য আটক করিয়া রাখা অনুচিত; বিশেষতঃ নবাব স্বয়ং ট্রাভারনিয়োকে আহ্বান করিয়াছিলেন এখন তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করা কি নবাবের কর্ত্তব্য? অপিঃ তাঁহার ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্যের অন্তরায় সংবাদ ইয়ুরোপে প্রচারিত হইলে, অপর বণিকবৃন্দ ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিতে আসিতে ইতস্ততঃ করিবে। কারণ ট্রাভারনিয়োর সহিত নবাব যেরূপ ব্যবহার করি-লেন, তাহাদের সহিত ও তদ্রূপ করিতে পারেন। এই দুইখানি পত্র যথা-কালে নবাবের নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় না।

নবাবের নিকট পত্র লিখার পর দিনই ট্রাভারনিয়ো ওলান্দাজদিগের চৌদ্দ দাঁড়ের একখানি বজরা লইয়া হুগলী অভিমুখে যাত্রা করেন। তিন দিন পরে তিনি হুগলীতে উপনীত হন। ওলন্দাজের তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত এদেশে যত প্রকার সুখ সাচ্ছন্দতা ও বিলাসিতার উপকরণ পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত উপস্থিত করে। এইরূপ আমোদ

প্রমোদ ও বিলাসিতায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিবার পর ট্র্যাভারনিয়ো ২রা মার্চ্চ তারিখে হুগলী পরিত্যাগ করেন এবং ৫ই মার্চ্চ তারিখে কাশিমবাজারে পুনরাগত হন।

তৎপর দিবস তিনি মাদেসৌ বাশরকিতে নবাব প্রতিনিধির নিকট টাকার সম্বন্ধে নবাবের নূতন কোনও আদেশ আসিয়াছে কিনা, জানিবার জন্য উপনীত হন। প্রতিনিধি তাঁহাকে জানান যে, পরওয়ানার লিখিত টাকার মধ্য হইতে বিংশ সহস্র মুদ্রা কাটিয়া রাখিতে নবাব আদেশ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট টাকা আপনি লইতে ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন। আর যদি ইহাতে সম্মত না হন, তবে ঢাকায় ফিরিয়া গিয়া নবাবের নিকট হইতে আপনার জিনিষ পত্র ফিরাইয়া লইবেন, নবাব তাহা প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

একজন আগন্তুক বণিকের সহিত নবাব কেন এই কুব্যবহার করিলেন? ইহার মধ্যে একটী বিষম রহস্য নিহিত আছে এবং মোগল দরবারের তিনজন চতুর ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই রহস্য-সূত্র নিরন্তর চালিত হইতেছে। মূল রহস্য ব্যাপার বারান্তরে বর্ণিত হইবে। [ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

ফ্রাঙ্কলিনের সফলতার মূল।

একটী পরাক্রান্ত জাতির নির্ম্মাণে প্রধান সাহায্যকারী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম জীবনে মুদ্রাকরের নিকট অক্ষর আনয়ন করা, ধৌত করা প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহু পরিবার পোষণে ব্রতী হইয়া তাঁহার পিতা ফ্রাঙ্কলিনকে বাল্যকালে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। দশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রমকালে তিনি তাহাকে আপনার বাতি ও সাবান নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রথম নিয়োজিত করেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের সে কার্য্য আদৌ মনোনীত হয় নাই। অবশেষে পিতা তাহার অধ্যয়নে অনুরাগ দর্শনে মুদ্রাকরের কার্য্য শিক্ষার্থ তাহাকে ব্রতী করেন। কি উপায়ে জীবনের এই নিম্নতম স্তর হইতে তিনি আপনাকে একটী প্রবল জাতির

নির্ম্মাণ কর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পুরুষকারের এই মহান্ সফলতার মূল কোথায় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। তৎকৃত আত্মজীবনী পাঠে, যে সমস্ত সদ্‌গুণরাজি ও প্রকৃষ্ট পন্থা তাঁহাকে এই বিজয়মালায় সুশোভিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইগুলি কতক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অপেক্ষাকৃত সুচারু উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে বিবেচনা করিয়া কতকগুলি ইউরোপীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া New England প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফ্রাঙ্কলিনের পিতা তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। আদিম-নিবাসিগণের বাসভূমির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অরণ্যবহুল সেই বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ডকে প্রকৃত দেশে পরিণত করিবার গুরুভার এই কতিপয় ঔপনিবেশিকের উপর নির্ভর করিতেছিল। এ কার্য্য বড় সাধারণ নহে। তাহাদের সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। ক্যাথলিক, প্রোটেসটেণ্ট, কোয়েকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপন্থী ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া একটী জাতির সংগঠন অতিশয় দুরূহ কার্য্য। আবার পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নগর নির্ম্মাণ দেশকে বাসোপযোগীকরণ প্রভৃতি নানা কার্য্যকরণের প্রয়োজন। সমধর্ম্মাবলম্বী সুশিক্ষিত মানবগণও মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে যথেষ্ট আয়াস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদিগকেও এক সূত্রে গ্রন্থিত করিতে বিশেষ ধীসম্পন্ন ও বিচক্ষণ লোকের প্রয়োজন হয়। অনুষ্ঠিত কার্য্যের উন্নতি বা অবনতি, সফলতা বা বিফলতা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত নায়কের হস্তেই দেশের অদৃষ্ট সম্পূর্ণ ন্যস্ত। তাঁহারা যে প্রকৃষ্ট পন্থায় প্রকৃতিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়েন দেশও তদনুসারে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ফ্রাঙ্কলিনের ন্যায় প্রকৃত কর্ম্মবীরগণের হস্তে New England প্রভৃতি উপ-নিবেশের গঠন ভার বিন্যস্ত না হইলে এই সকল প্রদেশসমূহ এত উন্নতিমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হইত না।

তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে, কত সতর্কতার সহিত তিনি কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আরব্ধ কার্য্যে কি প্রকারে সফলতা লাভ করিবেন তাহাই তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া অনুধাবন করিতেন। অনন্যমনা হইয়া আরব্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহা কখনই বিফল হয় না ইহাই ফ্রাঙ্কলিনের ধ্রুব ধারণা ছিল। পরন্তু সৎউদ্দেশে কায়মনপ্রাণে পরিশ্রম করিলে একটী সামান্য মানব ও বহু মহৎ কার্য্য করিতে পারেন। এই

মঙ্গলময় ধারণাই তাঁহাকে জীবনে নানারূপ মহৎকার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। একখানি পত্রে ফ্র্যাঙ্কলিন তাহার পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—

"I was not discouraged by the seeming magnitude of the undertaking as I have always thought that one man of tolerable abilities may accomplish great affairs among mankind if he forms a good plan."

এই মূলমন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম আত্মোন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। অগ্রে আপনাকে নির্ম্মাণ না করিয়া অপরকে নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিলে, আপনার প্রকৃত কার্য্যের জ্বলন্ত উদাহরণ না দর্শাইতে পারিলে অপরকে প্রকৃত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হওয়া একরূপ অসম্ভব ইহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আপনাকে নীতি, উদ্যম, সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে, স্বীয় কার্য্যকলাপে এই সমস্ত সদ্‌গুণরাজিকে নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় করিতে তিনি ঐকান্তিক সাধনা করিয়াছিলেন। ফ্র্যাঙ্কলিন সবিশেষ অনুধাবন করিয়া নিম্নলিখিত সদ্‌গুণরাজিতে অভ্যস্ত হইতে পারিলে উন্নতি-সোপানে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন বিবেচনা করিয়া ছিলেন।

(১) মিতব্যয়িতা—যথা অত্যধিক পান ও আহারে লিপ্ত না হওয়া।

(২) মৌন—যদ্বারা স্বীয় কিম্বা অপরের কোন উপকার না হয় এরূপ বিফল কথোপকথন।

(৩) পারিপাট্য—যথা সমস্তবস্তুর নিরূপিত স্থান নির্দ্ধারণ এবং সমস্ত কার্য্যের নির্দ্ধারিত সময় নিরূপণ।

(৪) প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধনে প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিক প্রয়াস।

(৫) মিতব্যয়িতা—পরিমিতব্যয়, এবং অনর্থক কোন বিষয়ে ব্যয় না করা।

(৬) পরিশ্রম—সময়ের অপব্যয় না করা। সর্ব্বদা কোন না কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকা।

(৭) সরলতা—কপটাচার না করা। যাহা সত্য তাহাই বলা ও কদাপি আপনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা না করা।

(৮) ন্যায়পরায়ণতা—কখনও অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করা।

(৯) সহনশীলতা—কেহ ক্রোধের উপযুক্ত কার্য্য করিলেও অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ না হওয়া।

(১০) স্থিরতা—সাধারণ কিংবা অলঙ্ঘনীয় ঘটনায় অস্থির না হওয়া।

(১১) নম্রতা ইত্যাদি—

এই সমস্ত সদ্‌গুণ আয়ত্ব করিতে তাঁহাকে বহু উদ্যম, বহু নিরাশা ও বহু বিঘ্ন পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে সমস্তগুলি একেবারে আয়ত্ব করা একরূপ দুঃসাধ্য দেখিয়া তিনি একটী একটী করিয়া অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত একটী গুণে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্থ না হন ততদিন সেইটীর সাধনায় একাগ্র মন প্রদান করিতেন। এইরূপে বহু পরিশ্রমের পর এই সমস্ত গুণরাশি তাঁহার আয়ত্বাধীন হইল।

অতঃপর দেশের কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়া ফ্রাঙ্কলিন সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিলেন যে প্রকৃতিপুঞ্জকে কোন কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে অগ্রে তাহাদের মনকে সেই পথে প্রবর্ত্তিত করাইতে হয়। কোন বক্ষ্যমাণ কার্য্য যে কর্ত্তব্য তাহা সেই কার্য্য আরম্ভের অগ্রে সকলকে বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করান আবশ্যক নতুবা সে কার্য্যে তাহাদের সহানুভূতি হয় না এবং আরব্ধ কার্য্যও তদভাবে বিনষ্ট হয়। এ বিষয়ে সফলতালাভের উদ্দেশ্যে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে উক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তদবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া জন সমাজে প্রচার করিতেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতিত্ব বিবর্জ্জিত হইত এবং ইহাতে তিনি কখনও নিজের মত স্থির সিদ্ধান্তরূপে প্রকটিত করিতেন না। নিরপেক্ষ ভাবে এবং প্রাঞ্জল যুক্তিপূর্ণ ভাষায় কার্য্যটী হইতে উপকার বা অপকার বিচার করিতেন। সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান উচিত বা অনুচিত তাহা পাঠকবর্গ ইহার পর আপনারাই মীমাংসা করিতে সমর্থ হইতেন। এই উপায়ে ফ্রাঙ্কলিন সর্ব্বকর্ম্মে আশাতিরিক্ত সহানুভূতি লাভ করিতেন।

তাঁহার কার্য্যে জনসাধারণের সহানুভূতির মাত্রা কত অধিক বৃদ্ধি পাইত তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে স্পেন এবং গ্রেট ব্রিটনের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর ফ্রান্স স্পেনের সহিত যোগদান করেন। তখন ঔপনিবেশিকগণ আত্মরক্ষার জন্য চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। Pennsylvaniaর তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা টমাস যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মরক্ষার্থ কামান বারুদ প্রভৃতি সামরিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কোয়েকার ধর্ম্মভুক্ত

অধিবাসিগণ ধর্ম্মমতে যুদ্ধনীতির প্রবল বিরোধী হওয়ায় উপর্য্যুপরি বহুচেষ্টা করিয়াও তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তখন ফ্রাঙ্কলিন এই কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে Plain Truth নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণে প্রচার করিলেন। তাহাতে প্রাঞ্জল এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষায় আপনাদিগের অক্ষম অবস্থা ও তজ্জন্য একতা এবং আত্মরক্ষার্থ শিক্ষিত হওয়ার আবশ্যকতা প্রকটিত করিলেন। ইহার ফলে এই বিষয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের মন এতদূর আকৃষ্ট হইল যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইবে আশা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরাও আপনাদিগের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নানাপ্রকার নীতিপদ্যে সুশোভিত পতাকাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

রণনীতির বিরোধী কোয়েকার মতাবলম্বীগণ এই সময় মহাসমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। তাহাদের ধর্ম্মমতে যুদ্ধের জন্য কোনপ্রকার সাহায্য করা একেবারে নিষিদ্ধ। অথচ সাধারণ বুদ্ধিতে ফ্রাঙ্কলিনের অকাট্য যুক্তি গ্রহণ না করিয়া উদাসীন থাকাও অসম্ভব। সূক্ষ্মদর্শী ফ্রাঙ্কলিন কোয়েকার প্রকৃতিপুঞ্জের মানসিকগতি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি বড়ই হাস্যোদ্দীপক পন্থা অবলম্বন করিলেন। যুদ্ধের জন্য যখন অর্থের আবশ্যক হইত তখন "রাজকীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে" এই বলিয়া তিনি উহাদের মত গ্রহণ করিতেন। কদাপি "যুদ্ধ" কথার উল্লেখ করিতেন না। কোয়েকারগণও এই বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিত না। একবার লুইসবর্গে কেল্লার জন্য বারুদ এবং রসদ ক্রয়ার্থ অর্থের প্রয়োজন হয় সে সময় উহারা ঐ কার্য্যে অর্থ প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু যখন বলা হইল রসদ এবং অন্যান্য শস্য সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তখন তাহারা সকলে উহাতে মত প্রদান করেন। এইরূপ একবার একটী কামান ক্রয়ের জন্য অর্থের আবশ্যক হইলে ফ্রাঙ্কলিন একটী Fire Engine ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন।

সকল কার্য্যে অগ্রণী হইলেও তিনি কদাপি আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতেন না। কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যখন সহানুভূতির জন্য অপরের দ্বারস্থ হইতে হইত তখন নানারূপ মঙ্গলের জন্য আমি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি—এই কথা কদাপি উচ্চারণ করিতেন না। আত্মপ্রতিষ্ঠার

চেষ্টা আরব্ধ কার্য্যের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিতেন। কতকগুলি স্বদেশবৎসল ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইহাই জনসাধারণে প্রচারিত হইত। বাল্যাবধি ফ্রাঙ্কলিন এইরূপ আত্মত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার New England courant নামক একখানি সংবাদপত্র ছিল। ভ্রাতা ও তাঁহার কএকজন বন্ধু মিলিয়া ইহার পরিচালনা করিতেন। যখন তাহাদের সংবাদ পত্র বিষয়ক কথোপকথন হইত বালক ফ্রাঙ্কলিন একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিতেন। এই সময় হইতেই সাধারণের ব্যাপারে চর্চ্চা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিশোর হৃদয়ে বলবতী হয়। বালক কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রণেতার নাম গোপন পূর্ব্বক ভ্রাতার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রেরণ করে। তাহার লিখন ভঙ্গি ও যুক্তির সারবত্বা দর্শনে সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে সেগুলি কোন প্রতিভাবান লেখকের লেখনী প্রসূত। সেইগুলি সমাদরের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বীয় নামের প্রত্যাশা বিন্দুমাত্রও না রাখিয়া শুদ্ধ সফলতার প্রতি লক্ষ্য করিবার শিক্ষার সূত্রপাত ও মহৎ কার্য্যের পদমূলে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান করিবার ক্ষমতার এই প্রথম সূত্রপাত হয়। সমস্ত জীবন তিনি এই সূত্র আশ্রয় করিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ঐকান্তিক উদ্যম ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে বিজয় মালায় সুশোভিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীউমাচরণ ধর।

হক্ কথা।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনি সময়ে সময়ে যেরূপ মৌলিক প্রবন্ধের তাগাদা করিয়া পাঠান তাহাতে ত অধীনকে ধারাবাহিকরূপে কেবল ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সামাজিক বিষয়ে প্রকৃত কাজের কথা লিখিয়া যদি প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করি তাহা হইলে প্রথমে আপনি, তাহার পর ছাপাখানার মহাপ্রভুরা, পত্রিকা প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ এবং কাগজের অন্তিমে অর্থাৎ মসলা বাঁধিবার সময় মুদিপ্রবর এবং ক্রেতা মহাশয় সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। অবশ্য মিথ্যাটা গুছাইয়া লিখিতে পারিলে সমালোচক মহলে বাহবা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের ন্যায় সাহিত্যিক চুণো-পুঁটির পক্ষে সেরূপ কৃতিত্ব অসম্ভব।

মোটের উপর আজ কালিকার বাজারে কলম পরিচালনা করা বড় দুরূহ ব্যাপার। সেরূপ অর্থ ও অনুবাদশক্তি থাকিলে পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে উই ভুক্ত দুই একখানা জীর্ণ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুবাদেই দুই চারিটা জলদ্‌গম্ভীর প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলা যায়—কিন্তু আধুনিক ফ্যাসান সাময়িক প্রবন্ধ।

সাময়িক প্রবন্ধ রচনা করা অপেক্ষা কষ্টকর ব্যাপার ত আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। শুনিতে পাই কতকগুলা গণ্ডীর মধ্যে ইংরাজ এদেশে মতামতের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের আপনাদের ভিতর মতামতের স্বাধীনতাটা একেবারে নিষিদ্ধ। যে দেশের নীতি বলে—'সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—সে দেশে কোন কর্ম্মের উপর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা যে কি দোষ, তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই। প্রথমতঃ রাজনীতি সম্বন্ধে কোনও কথা কহা বড় বিপজ্জনক। যদি একবার মনের আবেগে গাত্র দাহ নিবারণ করিতে গিয়া আইনের পিচ্ছিল পন্থায় পা হড়কাইয়া যায় তাহা হইলে গুপ্ত লাহিড়ী কোম্পানী নাবিকের কৃপায় কিংসফোর্ড বা রাজার পারঘাটায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে। শুধু নিজে কেন বোধ হয় মহাশয়কেও সে হাবুডুবু ভোজনে অংশীদার হইতে হইবে। কারণ আপনি ভদ্রলোক আপনি কিছু উন্নতমনা চরমপন্থীর মত একটা এডিটোরিয়াল ষ্টাফের অন্তরালে লুকাইতে পারিবেন না।

এই হইল স্বাধীন অভিমতের গণ্ডী সংখ্যা এক। তাহার পর যদি বলি ইংরাজ এদেশে আসিয়া শান্তিরক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের আগমনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদেশে প্রবেশ করিয়া আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে এবং নানারূপে মানবের সচ্ছন্দতার পন্থা উন্মুক্ত করিয়াছে তাহা হইলে এই স্বদেশী বিপ্লবের দিনে সম্ভবতঃ আপনার কার্য্যালয় লুণ্ঠিত হইবে, অন্ততঃ সমালোচকদিগের বাক্য তাড়নায় আপনাকে জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে। তাহার পর যদি সাহসে ভর করিয়া—যে কথাটা চিরকাল ভাবি এবং আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই উপলব্ধি করি—বলিয়া ফেলি যে অনেক বিষয়ে ইংরাজ চরিত্র (অবশ্য রাজসিক গুণে) আমাদের অপেক্ষা ভাল, তাহা হইলে যে আমার ও আপনার কি দুর্গতি হইবে, কবি হইলে আমি ক্রমেই তাহার কল্পনা করিয়া লইতাম। সুতরাং এখনকার নিয়ম হইয়াছে যে ইংরাজকে সকল বিষয়েই আমাদের পরম বৈরী ভাবিতেই হইবে এমন কি তাহার গুণগুলা অবধি উল্লেখ

করিতে পারিব না। বলুন দেখি এই মর্ম্মের রাশি রাশি আবর্জ্জনাপূর্ণ প্রবন্ধ ও গালাগালিতে আমাদের দেশটা ভরিয়া যাইতেছে কিনা? ইহা কি সনাতন আর্য্য নীতি, ইহা কি হিন্দুর কর্ত্তব্য না ইহা দুঃখিনী ভারতমাতার দুঃখ মোচনের আশু উপায়। ভাবিবেন না আমি থয়ের খাহি করিতে চাহিতেছি তবে যেটাকে Fairplay বলে তার কি আদর দেখিতে সকলেরই ইচ্ছা করে না। অনুকরণেই জীবের জ্ঞানের বিকাশ, জগতের উন্নতি—একথা বিজ্ঞান পাঠে জানিতে পারি। সন্তান যদি পিতামাতার অনুকরণ না করে তাহা হইলে কি তাহার মনের, জ্ঞানের বা ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়? যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহা জাতির পক্ষেও সত্য। সুতরাং একেবারে ইংরাজের কিছু লইব না, ইংরাজ যদি দক্ষিণে যায় আমরা বামে যাইব, এরূপ মতটা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উপায়, একতার সাহায্যে যৌথ ব্যবসায়, যৌথ স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতি শিক্ষা করা, তাহাদের মত অধ্যবসায়, তাহাদের মত ব্যবসায় সততা আয়ত্ত করা এক্ষণে আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। একথা আমরা সবাই মনে মনে বুঝি কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে কেহ একথা প্রকাশ্যভাবে বলে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।

তাহার পর সাহিত্যিক জগতের কথাটা বিচার করুন। যদি বলি আজ কাল মেরি করেলি গায় বুথ্‌বি, কনান ডয়েল প্রভৃতি বিলাতী গল্প লেখকেরা বেশ বড় বড় গল্প লিখিয়া যশস্বী হইতেছেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনাকে ও আমায় শ্মশ্রুধারণ করিতে হইবে। সমালোচক মহাশয় বলিবেন "কেন আমাদের হা" বাবুর মত ঐতিহাসিক বা আমাদের পাঁ" বাবুর মত মনোরম গার্হস্থ্য উপন্যাস কি ইংরাজ লিখিতে পারে?" হরিবোল! হরিবোল! তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে যদি সত্যের খাতিরে বলেন আমাদের উপন্যাসে চিত্রবাহুল্য নাই নানা ভাবের সমাবেশ নানা দৃশ্যের অঙ্কন, বহুবিধ চরিত্রের বিকাশ অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থের বারো আনায় নাই তাহা হইলে শুনিবেন গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া রাবিস লিখিতে আমরা নারাজ। কিন্তু এ কথাটা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন যে এক খানা বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হইলে তাহাতে অধিক মানসিক ক্ষমতার আবশ্যক, অধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন এবং এই দুইটা শক্তির আমাদের সাধারণ লেখকগণের মধ্যে অভাব। তাহার পর সাহিত্যে অনুকরণ-প্রিয়তা, পরের দ্রব্য বিনা অনুমতিতে নিজস্ব বলিয়া বাজারে প্রকাশ করা, পরের ভাব চুরি করিয়া নিজের ভাষায় সেটাকে পাঠক বেচারার সম্মুখে ধরিয়া নিজে প্রশংসা পাইবার প্রয়াস করা আমাদের সাহিত্য জগতে যতটা দেখিতে

পাওয়া যায় এরূপ অপর জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা জানি না। যখন মাসিক সাহিত্যের হাট হইতে সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের নাম সংগ্রহ করি তখন প্রাণে একটা আশার সঞ্চার হয়, মনে হয় বুঝি নির্ব্বাণোন্মুখ সাহিত্য গৌরব বাঙ্গালাদেশে আবার জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু যদি স্থির হইয়া একবার বিচার করেন ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে সাহিত্যের জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে কতটুকু সহায়তা করিয়াছেন, মাতৃ-ভাষার অর্চ্চনার জন্য মা'র পায়ে কে ক'টা ফুল দুর্ব্বা অর্পণ করিয়াছেন তাহা হইলেই আবার নিরাশার মেঘ আসিয়া আপনার হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিবে। দেখিবেন অধিকাংশ পুজারির হস্তে বুনো ফুল আর বরষার ঘাস। বিল্বদল রক্তিমজবা মাতৃ-পদে অর্পণ করেন শতকরা দুই চারি জন। ইংরাজলিখিত একখানা পুরাতন ভারতেতিহাসের একটা অপ্রসিদ্ধ কথা লইয়া কেহ কলিকাতার গোপবালার একপো দুধে একসের জলমিশ্রণের মত চারি আনা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত বারো আনা কল্পনা মিশ্রিত করিয়া একটা গবেষণা করিয়াছেন; জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, হইতে আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু, রবিবাবু অবধি যে প্রেমের ভাবে বাঙ্গালীর সাহিত্য পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন কেহবা সেই ভাবের একটুকরা চুরি করিয়া, "জ্যোৎস্না" "জোছনা" "হৃদয়" "হিয়া" "ললিত" "মধুর" "বিকাশ" "বিমল" প্রভৃতি গোটা কতক শ্রুতিমধুর শব্দ বিন্যাস করিয়া দুই একটা কবিতা লিখিয়া মাতৃভাষাকে ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়াছেন; এবং জ্যেষ্ঠতাতমীর জলদগম্ভীর ভাষায় দুই এক ঝুড়ি সমালোচনা করিয়া কোনও কোনও সম্পাদক আপনার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ করিয়াছেন। একখানা রীতিমত বৈজ্ঞানিক পুস্তক, একটা রীতিমত ঐতিহাসিক গবেষণা, এক খানা প্রকৃত মৌলিক গ্রন্থ বাঙ্‌লা সাহিত্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু দেশের এই শোচনীয় হক্ কথাটা যদি জোর করিয়া বলিয়া বেড়ান দেখিবেন আপনাকে সকলে বলিবে দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী এবং ফিরিঙ্গির ফেনচাটা বা চাটুকার।

আপনাদের মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ লেখক বাহুল্য যে মঙ্গলময় চিহ্ন তাহা অস্বীকার করি না। তাঁহারা সকলে যদি নিষ্ঠাবান হৃদয়ে মাতৃসেবা করিতে আরম্ভ করেন এবং ত্রৈমাসিক এক একটা প্রবন্ধ না লিখিয়া প্রত্যেকে আপনার যোগ্যতা অনুসারে এক একটা বিষয় লইয়া পরিশ্রম করেন তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত উপকার হয়। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদকদিগের অপর একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহারা

সকলেই যদি প্রত্যেকের পত্রিকার এক এক দল লেখক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন তাহা হইলে পত্রিকারও একটা মতামতের বিশেষত্ব বজায় থাকে এবং নবীন লেখকদিগেরও রচনা নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ প্রথা আপনার "অর্চ্চনা" প্রমুখাৎ দুই একখানি পত্রিকাতে ভিন্ন দেখিতে পাই না। অধিকাংশ ছোট ছোট পত্রিকার লেখকের লিষ্টের মধ্যে জনকতক নামজাদা লেখকের নাম দেখিতে পাই কিন্তু দুঃখের মধ্যে কখনও তাঁহাদের লেখা সে সকল পত্রিকায় দেখি না। অনেক তোষামোদের উপদ্রবে এক আধটা অযোগ্য ভাবহীন ভাষাহীন প্রবন্ধ দানে ভিক্ষুক সম্পাদককে তুষ্ট করিবার জন্য লেখক প্রবরেরা কখন কখন তাঁহাদিগকে প্রবন্ধ প্রদান করেন বটে কিন্তু ঐরূপ মহারথীর আবর্জ্জনা প্রকাশ করা অপেক্ষা একজন উদ্যমশীল নবোৎসাহ সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশ করা কি শতগুণে শ্রেয়ঃ নহে? কিন্তু আপনাদের সমালোচনার এমনি বাহাদুরী যে সাধারণতঃ উক্ত অপরিচিত নবীন লেখকের রচনাকে আপনারা "ইংরাজীর ছাঁচে গড়া" প্রভৃতি বলিয়া লেখক বেচারাকে নিরুৎসাহ করিবার বিধিমত চেষ্টা করেন। ফলে লেখকও বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া অপর ক্ষেত্রে আপনার মেধা পরিচালনা করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে অপর একটি হক্ কথা বলিব। আমাদের দেশে যখন এক একটা হুজুকের বন্যা আসে আমরা তখন তাহাতে একেবারে গা ভাসাইয়া দিই, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিনা স্রোতে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া কখনও কখনও কেমন হাস্যাস্পদ ঘাটে আনিয়া তুলে। বঙ্কিমবাবু প্রমুখাৎ লেখকবৃন্দের অনুকরণ করিয়া একবার ফ্যাসান উঠিয়াছিল যে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে লেখনী পরিচালনা করিতে হইলেই তাহাদিগকে যবন নৃশংস অত্যাচারী, অসুর স্বভাব প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিতে হইবে। এবং এই ফ্যাসানের স্রোতে পড়িয়া আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্মানিত পরাক্রমশালী অনেক মুসলমান ভূপতিকেও ছেলে ছোকরায় কলমের মুখে পড়িয়া কিঞ্চিৎ রূঢ় কথা শুনিতে হইয়াছে। এখন কিন্তু স্রোতটা আবার এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে মুসলমান ভূপত্তির কথা উঠিলেই তাঁহাকে দেবগুণে ভূষিত করিবার চেষ্টা বাঙ্গালী লেখকের মধ্যে অতি সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। অত্যাচারী ভূপতির নৃশংসতার গল্পগুলা সযত্নে পরিত্যাগ করিয়া অসুরকে দেবতা আঁকিয়া নবাব চরিত্রে আজকাল আমরা তুলিকা লাগাইতেছি। ইহাতে কি আমরা জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছি না? ইহাতে কি আমাদের

সত্যনিষ্ঠা কমাইয়া বিবেককে বিকৃত করিতে হইতেছে না? যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য এবং যাহা সত্য নয় তাহা ইতিহাস নহে। সুতরাং আমরা যদি প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে যত্নবান হই তাহা হইলে আমাদের সত্যের প্রতি আস্থা থাকা কর্ত্তব্য। হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাব জন্মাইতে হইবে বলিয়া আমরা মুসলমান সম্বন্ধে লেখনী পরিচালনা করিতে হইলেই অসত্য চাটুবাক্য লিখিয়া সত্যের অপলাপ করিব এ কথাটা যুক্তিহীন।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই যদি হক্ কথা লিখিতে হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই বড় অপ্রিয় হইতে হয়। আমার কিন্তু বিশ্বাস যতদিন না আমরা আপনাদের দোষগুলা ভাল করিয়া সমালোচনা করিয়া দেখিব, যতদিন না প্রত্যেক বিষয়েই আমরা মনকে আঁখি ঠারিয়া আত্ম বঞ্চনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি আমাদের যে প্রধান সহায় ধর্ম্ম, সে বিষয়ে আমরা কতদূর অবনতি করিয়াছি। কথায় কথায় বলিয়া থাকি ইংরাজ রজঃপ্রধান, উহাদের সভ্যতা কেবল তমোমূলক আমাদের হিন্দু জীবনটা সাত্ত্বিক। একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি আপনার আমার জীবনটা কতদূর সাত্ত্বিক। রাজসিক গুণ আমাদের নাই একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আমাদের জীবনে এখন এক তমঃ ভিন্ন অপর কোনও গুণ আছে বলিয়া কেহ কি বাস্তবিক দম্ভ করিয়া বলিতে পারেন। মুখে যতই কেন বলিয়া বেড়াই না, আমাদের গৃহ হইতে যে দিন দিন ধর্ম্মনিষ্ঠা বিদায় লাভ করিতেছে তাহা কি কেহ অস্বীকার করিবে? আমাদের ধর্ম্মের কথা যত তর্ক করিবার সময়। দ্বাদশ বৎসরের বালক সপ্রমাণ করিয়া দিবে যে হিন্দু ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, এরূপ বিশ্বজননীন ধর্ম্ম জগতে নাই, হিন্দু ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির অনুরূপ, হিন্দুর উপাসনা প্রণালী অদ্বিতীয়। কিন্তু এই উপাসনা নিষ্ঠার সহিত শতকরা কয়জন করে তাহার কেহ খোঁজ করিয়াছেন কি? কয়জন দ্বিজ দিনের মধ্যে একবার পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন তাহা বিচার করা শ্রেয়ঃ নহে কি? মনের অগোচর পাপ নাই, কিন্তু আমরা ধর্ম্ম হারাইয়াছি 'থিওরিতে' ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিলেও 'প্র্যাকটিসে' নাস্তিক একথা বলিবার কিন্তু আমাদের সাধ্য নাই।

তাই বলিতেছিলাম, সম্পাদক মহাশয়, আর মৌলিক প্রবন্ধের তাগাদা করিবেন না। কারণ অপ্রিয় সত্যের উপর আপনাদের জাতির আস্থা নাই। *

বশম্বদ—শ্রীহকানন্দ—

---

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত সাদরে গৃহীত হইবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে প্রকাশিত হইবে।—সম্পাদক।

রামায়ণ।

হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের কালনিরূপণ সম্বন্ধে ভট্ট মোক্ষমূলার বলেন যে, খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৬০০ বৎসর হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক সময়ের প্রশস্তি, সুতরাং অন্যূন ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্তজাতির ধর্ম্মপুস্তক অপেক্ষা হিন্দুদের বেদ পুরাতন এবং পৃথিবীতে বেদের পূর্ব্বে কোন জাতিরই ধর্ম্মগ্রন্থ স্ফূর্ত্তি পায় নাই।

কিন্তু হোগ সাহেবের মতে খৃঃ পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর হইতে ২০০০ বৎসর মধ্যে বেদ রচিত হইয়াছিল, এবং খৃঃ পূর্ব্বে ১২০০ বৎসর মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগ প্রচার হইয়াছিল। আবার অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই বেদকে অন্যূন ৫০০০ বৎসরের অধিক কালের গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বেদের পূর্ব্বে রচিত যে আর কোন প্রকার গ্রন্থ পাওয়া যায় না,সে বিষয়ে অনেকেরই ঐকমত্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

৫০০০ বৎসরকে যাঁহারা বেদের উৎপত্তিকাল বলিয়া অনুমান করেন, প্রকারান্তরে তাঁহাদের ইহাও বলা হইল যে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন জাতিই সভ্য হয় নাই এবং কোন দেশেই কোন প্রকার গ্রন্থাদির প্রচার হয় নাই। তাই বলি কাল নিরূপণ সম্বন্ধে যতক্ষণ তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে,ততক্ষণ কেন আমরা অন্যের কুহকে ভুলিয়া অতি প্রাচীন কালের আর্য্য গ্রন্থ সকলের ব্যাপ্যত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাদের দুই চারি দিনত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান হইব? কাল নিরূপণ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যগণ মনুষ্যের অবস্থা চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন—সত্য,ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এবং তাহাদের এক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণও করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি, ভূসৃষ্টি ১৯৯৫৮৮৫০০৮ বৎসর। তন্মধ্যে ভূসৃষ্টি হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ১৯৯৫৮৮০০০০ বৎসর, তাহার সহিত কল্যব্দ, ৫০০৮ বৎসর যোগ করিলে ১৯৯৫৮৮৫০০৮ বৎসর। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের মতের সহিত আমাদের গণনার অনৈক্য লক্ষিত হয় না। তাহা হইলে বেদ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত, ইহা স্থূল রূপে নির্ণীত হইল।

আর মহাভারতের সময় নির্ণয় করিতে পারিলেই রামায়ণ রচয়িতার

সময় নিরূপিত হইবে। "শতেষু ষটস্থ সার্দ্ধেষু ত্রধিকেষুচ ভূতলে কলের্গতেষু বর্ষানামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।" এই বচনটী প্রামাণিক। এই বচনটী দ্বারা আমরা জানিলাম যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ ভূতলে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময়েই কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। আর ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় কলির ১০০০ বৎসর গত হইলে জনমেজয়ের রাজত্বকালে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হইয়াছিল। তাহা হইলে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত প্রকটিত হইয়াছিল ইহা সপ্রমাণ হইল।

সুতরাং বেদ চতুষ্টয় প্রকাশিত হইবার প্রায় ১০০০ বৎসর পরে মহাভারত প্রচার হইয়াছিল। আর মহাভারত বর্ত্তমান সময় হইতে ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছিল ইহাও সপ্রমাণ হইল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। তবে বেদের কত বৎসর পরে ও মহাভারতের কত বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক।

হরিবংশে লিখিত আছে, রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করিয়া মথুরা নগরী স্থাপন করেন এবং অন্ধককে সেই রাজ্য প্রদান করেন। পাণ্ডবগণ অবরোহপ্রণালী ক্রমে সেই বংশের সপ্তম পুরুষ। তাহা হইলে রাম ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সাতটী রাজার রাজত্ব কাল ব্যবধান।

এক্ষণে এই অন্ধকাদি সাতটী রাজার শাসনকালের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিলেই, মহাভারতের কত পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতে পারে। এ তথ্য নিরাকরণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে বর্ত্তমান কালের মনুষ্য অপেক্ষা পূর্ব্ব কালের মনুষ্য দীর্ঘ জীবন ভোগ করিত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এস্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সকলের পক্ষে দীর্ঘ জীবন উপভোগ করা সম্ভবপর নহে। সে যাহাই হউক এক্ষণে সকল দিক বিবেচনা করিয়া এবং তর্ক ও আপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ঐ সাতটী রাজার শাসনকাল গড়ে প্রত্যেকের ১০০ বৎসর হিসাবে গণনা করিয়া ৭০০ বৎসর ধরিয়া লইলাম। অবশ্য ইহাও আনুমানিক। কিন্তু ইহাতে কতক অংশ সত্য থাকাও অসম্ভব নহে। তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইল যে মহাভারতের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। উপরে বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান সময় হইতে ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। ইহা প্রমাণ করিতে আমাদের অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, মগধরাজ নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করিবার ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হয় এবং নন্দের রাজত্বের১০০বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা হন। সুতরাং খৃষ্টাব্দের ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। তাহা হইলে বর্ত্তমান সময় হইতে পরীক্ষিত প্রায় ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ গণনার হিসাবে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিরা যে ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত প্রচার করিয়াছিল তাহার বৈষম্য ঘটে। ইহার সিদ্ধান্ত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ব নহে। যাহা হউক এই ৩৪০০ বৎসরের সহিত ৭০০ যোগ করিলে ৪১০০ বৎসর হইল। তাহা হইলে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৪১০০ বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। তাহা হইলে বেদ প্রচারের পরবর্ত্তী ৯০০ বৎসরের মধ্যে রামায়ণ রচিত হয়।

এখানে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না,যে মহাভারতে উল্লিখিত রাজন্য-বৃন্দের ও বীরগণের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি কলাপ, বীরত্ব, কার্য্য প্রভৃতি রামায়ণে দৃষ্ট হয় এবং রামায়ণে বর্ণিত বীরগণের পুত্র পৌত্রাদি অবরোহপ্রণালী ক্রমে মহাভারতে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থাংশের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রাজা বৃহদ্বলকে বিনাশ করেন। এই বৃহদ্বল রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবংশের ১৫ অধ্যায়েও বৃহদ্বল কুশের বংশজাত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

এক্ষণে এক প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, যখন ভূসৃষ্টি অবধি দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ১৯৯৫৮৮০০০০ বৎসর ধরা হইয়াছে, আর যখন রাম রাবণের যুদ্ধ ত্রেতাযুগের ব্যাপার, তখন ৪১০০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ লিখিত হইয়াছে, যাহা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয়। ইহার উত্তরে আমরা বলি সত্য ত্রেতাদি যুগের সৃজন কল্পনা মাত্র এবং রাম বিষয়ক ঘটনা ত্রেতাযুগে হইয়াছিল ইহা কিম্বদন্তী মাত্র। ফলতঃ ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে ভূসৃষ্টি এখন হইতে ন্যূনাধিক ৫৯০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। ইহা স্বীকার করিলে বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ হয় সকল কলহ মিটিয়া যায়। আর ইহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্য ঋষিগণ মস্তিষ্ক চালনা করিয়া, কল্পনা বলে অমানুষী অশ্রুতপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনার জন্ম দিতেন। সত্যের অনুরোধে সে গুলি পরিত্যাগ না করিলে যথার্থ তত্ত্ব স্থির হয় না। ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

সাহিত্য-সংবাদ।

শ্মশান-সন্ধ্যা।—(গাথা)।

"বঙ্গের ভিষক্ শ্রেষ্ঠ,—
চিকিৎসা সাম্রাজ্য মাঝে মহাশক্তিধর"

স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয়ের স্মৃতিতে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকোচ্ছ্বাস। এরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিতা আমরা অল্পই পড়িয়াছি। পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহের স্মৃতিতে কবি কাঁদিয়াছেন—

"শূন্যবক্ষে অবসাদ রোধিতে পারিনে,
আঁখিকোণে প্রবাহিত রুদ্ধ অশ্রুজল।"

আবার যখন কাঁদিতে কাঁদিতে এ নর জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া জীবনের অবসাদ আসিয়াছে

"এ বিশ্বে সকলি শব—পৃথ্বী শবময়!
এ মহা ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড শ্মশান!
তুমি শব! আমি শব! শব কেবা নয়!
কি বিশাল শবস্তূপে সৃষ্টির নির্ম্মাণ!
হেরি সব শবাকার—শবের সংসার!
শবদেহে সৃষ্ট এই মৃত্তিকা ধরার!"

যাহার শোকোদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এরূপ মর্ম্মস্পর্শী, সে কবির আসন সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইস্‌লাম-চিত্র।—মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সম্পাদিত। পুস্তকখানিতে দুইটী কবিতা ও কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ কয়েকটীতে কতকগুলি কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মতে শুধু মুসলমান কেন, সকলেরই এই পথগুলিতে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অঙ্কুর।—কার্ত্তিক ১৩১৪। বর্ত্তমান সংখ্যায় "পরলোক" শীর্ষক কবিতাটী মন্দ হয় নাই। "প্রজাপতি—"উচ্চপ্রাইমারী পাঠার্থীদিগের উপকারে লাগিতে পারে, অঙ্কুরে কেন? "প্রাচীন ভারতে কৃষি" শীর্ষক প্রবন্ধে বৈদিক কাল হইতে প্রাচীন ভারতে কৃষিকার্য্যের কিরূপ সমাদর ছিল, সংক্ষেপে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বিষয়ের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। "স্বপ্নকুমারীর প্রতি" (কবিতা) ভাব ও ভাষার 'কটামটতা'য় স্বপ্নকুমারী দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন; সুতরাং কবির আবেদন—'স্বপ্ন-দেবি, দিও মেখে, শান্তি ও নিশীথ যামে।'—অরণ্যে রোদন। "লোক চরিত্র"—সংস্কৃত শ্লোক সম্বলিত ক্ষুদ্র গল্প সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে বিদ্যার পরিচয় আছে ভাল, কিন্তু পাঠকের পরিতৃপ্তি কোথায়? "গান"—স্বদেশহিতৈষী কবি বেশ গাহিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি 'ক্রমশঃ' চলিতেছে।

অর্চ্চনা, ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

পাটলিপুত্র।

আমাদের আলোচ্য নগরের নামোৎপত্তি ও তাহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ সম্প্রতি "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণটী কিছু অভিনব এবং আলোচনার যোগ্য বিবেচনায় আমরা তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

দক্ষিণ প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ তনয় পত্নীসহ হরিদ্বারের নিকট কন্‌খল নামক স্থানে তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহাদের পরলোক গমনের পর তাঁহাদের পুত্রত্রয় বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত রাজগৃহে গমন করে। অবস্থা অসচ্ছল হেতু তাহাদিগকে পদব্রজেই পথ অতিবাহিত করিতে হইত এবং এইরূপ পরিভ্রমণ কালে তাহারা একদা দক্ষিণের সমুদ্র তীরের চিন্‌চিনি নামক স্থানে উপনীত হইয়া ভোজিক নামধেয় এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভোজিকের তিনটী কন্যা ছিল, তিনি এই ব্রাহ্মণত্রয়কে শাস্ত্রে পারদর্শী দেখিয়া তাহাদের সহিত স্বীয় দুহিতাত্রয়ের পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন করতঃ জীবনের অবশিষ্ট কাল ঈশ্বরারাধনায় অতিবাহিত করিবার মানসে গৃহত্যাগ করিয়া বন প্রস্থান করেন। কিয়দ্দিবস পর চিন্‌চিনিতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; ব্রাহ্মণ কুমারত্রয় স্বস্থানে জীবিকা সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া পত্নীদের ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। ভগিনীত্রয় অবশেষে নিরুপায় হইয়া পিতৃ বন্ধু জ্ঞানদত্তের আলয়ে আশ্রয় লয়। তথায় তাহাদের মধ্যম ভগিনী অত্যল্প সময়ের মধ্যে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করে। সন্তানের নাম পুত্রক রাখা হয়; এবং সে ভগিনীত্রয়ের স্নেহ বাৎসল্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। এই বালক ক্রমে ক্রমে প্রভূত ধনশালী এবং পরিশেষে একজন নরপতি বলিয়া পরিচিত হন। রাজা হইয়া বালক জ্ঞানদত্তের মন্ত্রণানুসারে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার জনক ও খুল্লতাতগণ, যাহারা ভিক্ষুকের ন্যায় গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা এইরূপ দান ধ্যানের বিষয় অবগত হইয়া কালে প্রাপ্তির আশায় তথায় আসিয়া জুটিতে পারে। অচিরেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু পুত্রকের অতুল ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতা অবলোকন করিয়া তদীয় পিতার ও তৎভ্রাতাগণের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; তাহারা পুত্রককে

হত্যা করিয়া তাঁহার এই অবর্ণিত ধনের একমাত্র অধিকারী হইবার পরামর্শ করিল। এই পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাহারা পুত্রককে বিন্ধ্যাচলে গিয়া ভগবতী দেবীর অর্চ্চনা করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। পুত্রকও জনক প্রভৃতির অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিন্ধ্যাচলে গমন করেন। তথায় ব্রাহ্মণত্রয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত ঘাতক নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু দেবী ভগবতীর কৃপায় তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া অভিসন্ধি ব্যক্ত হইয়া পড়ে। পুত্রক যেরূপ অগাধ ধনের অধিকারী ছিলেন, তদ্রূপ অত্যুন্নত জ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের সঙ্গের সমস্ত ধনরত্ন ঐ ঘাতকদিগের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া জঙ্গলে পলায়ন করেন। তাঁহার জনক ও তৎভ্রাতাগণ দ্রুতগতিতে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয় কিন্তু তাহাদের অদৃষ্টলিপি অপরিবর্ত্তনীয়ই রহিয়া যায়। কাযেই অচিরকাল মধ্যেই মন্ত্রিগণের শাণিত কৃপাণাঘাতে এই অকৃতজ্ঞত্রয়ের জীবনলীলার অবসান হয়। পরে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পুত্রক বন জঙ্গলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদা তিনি বনে আশ্চর্য্য ক্ষমতা সমন্বিত চন্দন কাষ্ঠের এক জোড়া খড়ম প্রাপ্ত হন। উহার এতাদৃশ ক্ষমতা ছিল যে, যে ব্যক্তি উহা পায়ে দিয়া যে কোনও স্থানে যাইতে অভিলাষ করিবে, তদ্দণ্ডেই সে তৎস্থানে যাইতে পারিবে। পুত্রক এই কাষ্ঠ পাদুকার সাহায্যে আকাশ-পথে বহুস্থান অতিক্রম করতঃ অবশেষে আকর্ষিকা নামক স্থানে অবতরণ করেন। তথাকার নরপতির পাটলি নাম্নী এক কন্যারত্ন ছিল। পুত্রক তাহার রূপ সৌন্দর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া একদা এই খড়মের সাহায্যে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। তাহার ফলে তাঁহারা গোপনে বিবাহ-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হন এবং রাজার ক্রোধের অগ্নি-শিখা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এই খড়মের প্রভাবেই এই দম্পতিযুগল আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইয়া বহু দূরদেশে গমন করেন। অবশেষে পুত্রক গঙ্গাতীরের এক স্থানে অবতরণ করেন। এই স্থানটী তাঁহার নিকট অতি রমণীয় বলিয়া প্রতিভাত হইলে তিনি তথায় একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহা সুসিদ্ধ হয় এবং পরে নিজের ও পত্নীর নামানুযায়ী স্থানের নাম পাটলিপুত্র নামকরণ করেন।

এতৎসম্বন্ধে আর একটী জনপ্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। সুদর্শন নামে

রাজগৃহের এক নৃপতি ছিলেন। পাটলী তদীয় দুহিতা, কিন্তু নিঃসন্তানবতী; তজ্জন্য সাতিশয় মনোদুঃখে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার পিতা, কন্যার এই বিপদভার অপনোদনের আশায় গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থানে একটী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুহিতার নামানুসারে তাহার নাম পাটলিপুত্র রাখেন। হেরাক্লিস্ (Herakles) অপরাপর কতিপয় স্থানের ন্যায় এই নগরও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া ডিওডোরাস্ (Diodorus) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হেরাক্লিসের আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত স্থান সমূহের মধ্যে পালিবাথ্রাই (Palibothra) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। হেরাক্লিসের ভূষণ—স্থূল যষ্ঠি ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম; তদ্ধেতু অনেকেই তাহাকে শিবের সহিত একাত্মক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তন্নিমিত্তই মহাদেবকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া থাকেন। হেরাক্লিস ও শিব অভিন্ন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; কারণ হেরাক্লিসের বহুতর পত্নী ও পুত্র থাকায় কথা লিখিত হয়; পক্ষান্তরে হিন্দু পৌরাণিক ইতিবৃত্তে শিব সম্বন্ধে তদ্রূপ লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ তদ্রূপ হইলে শিবপুরাণে তাহার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। শিবপুরাণ এতৎবিষয়ে একেবারে নীরব। অপর অনেকে হেরাক্লিস্‌কে শ্রীকৃষ্ণ সহোদর বলরাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিকট ইহাও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বলরামের বহু পত্নী ও বহু পুত্র থাকার বিষয় জানা যায় না। বরং শ্রীকৃষ্ণের বহু পত্নী ও বহু পুত্র ছিল; তাঁহার সহিত হেরাক্লিসের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলে কতকটা সম্ভবপর হইত। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও ইতিবৃত্তাদি এই উভয় মতের কোনটীরই পোষকতা করে না। পূর্ব্বোক্তদিগের সহিত হেরাক্লিসের কোনরূপ সাদৃশ্য থাকিলে মহাভারত ও ভাগবত পুরাণাদিতে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত; কিন্তু তাহা নাই। তজ্জন্য এই জনশ্রুতির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

বায়ুপুরাণ একখানি প্রাচীন এবং অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। কেবল ইহাতেই ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শৃঙ্খলামতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বায়ুপুরাণে, গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয় বা উদয়াশ্ব কর্ত্তৃক পাটলিপুত্র আবিষ্কৃত হওয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে। হিন্দুপুরাণ অনুসারে সহদেব মহাভারতের যুদ্ধের সময় মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর হইতে অজাতশত্রু পঞ্চত্রিংশ

পুরুষ। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৯১ শতাব্দীতে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ল্যামেন বলেন যে, এই নরপতি বৈশালী নগর অধিকার করিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া চেষ্টিত থাকেন। স্থনিথ ও বৈশ্যাস্কর নামক তদীয় দুই মন্ত্রী পাটলীতে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব নলঙ্গা হইতে বৈশালীতে গমনকালে এই দুর্গে উপনীত হইয়া প্রচার করেন যে, কালে এই স্থান একটী বৃহৎ নগরীতে পরিণত হইবে। প্রসিদ্ধ স্থান ও বিপনীর মধ্যে পাটলিপুত্রই বড় হইবে। মহাপরি নির্ব্বাণ সূত্র প্রভৃতি তিব্বতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছিলেন যে, অগ্নি, সলিল এবং অন্তর্ব্বিবাদে এই স্থান বিনষ্ট হইবে। বুদ্ধদেবের এই ভবিষ্যৎ বাণী কত দূর ফলবতী হয়, ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিতে হইবে না। প্রাচীন কালে জলপথই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হইত; এবং পাটলিপুত্র গঙ্গা, শন, গণ্ডক এবং পুনপুন্ নদী চতুষ্টয়ের সঙ্গম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা যে এক সময় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকন্তু নদীচতুষ্টয়ের করালগ্রাস হইতে সর্ব্বথা আত্মরক্ষার্থে সমর্থ না হইয়া এক সময়ে যে সলিল সমাধি লাভ করিতে পারে, তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। আর অন্তর্ব্বিবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না লিখাই ভাল, কারণ ইহারই প্রভাবে ভারতের বহু জনপদ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহারই ফলে ভারতের আজ এই দুরবস্থা। সর্ব্ব-বিবরণের সারস্বরূপ আমরা জানিতে পারিতেছি যে, অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়াশ্ব পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপিত করেন এবং তদ্ধেতু হইতে পারে যে, পাটনানগরীর নির্ম্মাণ কার্য্য অজাতশত্রুর সময় হইতে আরব্ধ হইয়া উদয়াশ্বের সময় পরিসমাপ্ত হয়। জেনারেল কানিংহাম মহোদয়েরও এই মত। উক্ত দুই নরপতির মধ্যে ৬০ বৎসরের ব্যবধান; একটী নগরের ক্রমোন্নতির পক্ষে তাহা দীর্ঘ সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রাজা উদয়াশ্বের রাজ্যারম্ভ খৃঃ পূঃ ৪৩৪ শতাব্দী হইতে সূচিত হয় বলা যাইতে পারে এবং তিনি পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণ করেন ইহা ব্যতীত তৎবিষয়ে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তাঁহার দুই উত্তরাধিকারী নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দী উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্য করিয়া যান নাই; কারণ বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুরাণে কেবল তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে মাত্র। শেষ নরপতি মহানন্দীর এক শূদ্রারমণীর গর্ভে মহাপদ্ম নন্দ নামে এক পুত্র সঞ্জাত হয়, তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৬১ শতাব্দীতে সিংহাসন অধিকার

করেন এবং নন্দ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। মহাপদ্ম ও তদীয় আট পুত্র—'নবনন্দ' সম্ভবতঃ নিজেদের নীচবংশ হইতে উৎপত্তি ভাবিয়া মহাত্মা বুদ্ধদেব প্রচারিত নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। *

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

কর্ত্তব্য পথ।

আজন্ম-পরিচালিত দারুণ জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যখন মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম পাই, যখন সমর প্রাঙ্গণের নির্জ্জন শান্তিপ্রদ প্রান্তর ভূমে বসিয়া নির্ব্বিকার নিষ্কামভাবে অস্ত্রের ঝনঝনা, আর্ত্তের কাতর নিনাদ, পাশবিক বিজেতার বিকট হর্ষধ্বনি শুনি, তখন ভাবি এত পরিশ্রম, এত উদ্যম, এত কর্ম্ম কিসের জন্য? সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য অহঃরহ আমরা কত বাধা কত বিঘ্ন, কত গিরি কত নদী অতিক্রম করি, কত আয়ুধাঘাতে শরীরকে জর্জ্জরিত করি। আবার এত কষ্টের স্বার্থ হাতে লইয়া দেখি মিছামিছি ছায়ার জন্য এত পণ্ডশ্রম করিয়া মরিলাম, উদ্দেশ্য সফল হইলে কিছুই লাভ করিলাম না। সারাদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আত্মহারা হইয়া এক মনে কষ্টের বোঝা মাথায় লইয়া যখন তাহা নদীর জলে ফেলিতে গেলাম, তখন দেখিলাম মাথা হইতে বোঝা নামে না, কেবল এতক্ষণ বৃথা উদ্যম নষ্ট করিলাম। ইহাতেই ত' মানুষ ক্ষান্ত হইতে পারে না। তখন ত' স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখে না—কেন ওপথে গিয়াছিলাম,

* বিলাতের টাইমস্ পত্রিকার কার্য্যালয় হইতে নব প্রকাশিত "The Historians' History of the World" গ্রন্থে, প্রথম নন্দকে দস্যুদলপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দস্যু সর্দ্দার নন্দ এক দল সৈনা সংগ্রহ করিয়া পাটলিপুত্র নগর আক্রমণ ও অধিকার করে এবং তৎকালীন নরপতি পিঙ্গামক্ষকে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ রাজ্যরক্ষা করিয়া খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৪০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপর রাজা দশসিদ্ধিকা স্বীয় পত্নীর উপপতি ইন্দ্রদত্ত কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ইন্দ্রদত্ত পুত্র ধ্যানানন্দ সিংহাসনে আরোহণ করে। এই ধাম্মানন্দই গ্রীক্ লেখকদিগের Xandrames বা Agrames এবং তদীয় রাজ্য Prasians (প্রাচ্য) নামে অভিহিত হইয়াছে। কথিত আছে, ধ্যানানন্দ প্রভূত ধনশালী ছিলেন এবং বিপুল সৈন্য-সম্ভার রক্ষা করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালেই মগধ সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে।—শ্রীব্রজ।

কেন অন্য পথে যাই নাই, কেন শরবিদ্ধ বন্য কুরঙ্গের মত যাতনায় কাতর হইয়া এদিক ওদিক মিছা ছুটিয়া মরিলাম, কেন চিত্ত স্থির করিয়া মনের মধ্যে আপন গন্তব্য পথ নির্দ্ধারিত করিয়া সেই দিকে ছুটিলাম না, তাহা হইলে সিদ্ধির পথে যাইতে পারিতাম, কঠোর জীবনপথে শান্তির ছায়া বিরাজ করিত।

আবার যখন মনে মনে সংকল্প করিয়া জীবন আহবের মধ্যে পড়িয়া মত্ত মহিষের মত সংগ্রামরত হই তখন ভাবি জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য, হস্তপদ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় কেবল এই কর্ম্মের জন্যই স্পষ্ট হইয়াছিল, এ রণে জয়ী হইলেই জীবনে সাফল্য পাইব, নিবিড় তমসাবৃত জীবনের পথ সমুজ্জ্বল হইবে, সে আলোকে শোক তাপ সকলই উড়িয়া যাইবে, থাকিবে কেবল শান্তি, রহিবে কেবল সুখ। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে যাহা পাই তাহাতে ত' প্রাণে তৃপ্তি পাই না। তখন আবার নূতন সংগ্রামের জন্য সজ্জা করি, নূতন পথের পাথেয় আহরণ করি। তখন আবার নূতন আশার কুহক আসিয়া চক্ষু ঝলসিয়া দেয়, হৃদয়কে লোভে ভরিয়া দেয়,হস্ত পদ,শিরা উপশিরায় নূতন বলের সঞ্জীবনী ঢালিয়া দেয়। আবার কোমর বাঁধিয়া নূতন পথে নূতন অরাতির উদ্দেশে যাত্রা করি।

একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে মনুষ্য কার্য্য করে না। ঐ যে দুগ্ধপোষ্য সুকুমার শিশু তাহার নবনীকোমল সুন্দরশ্রী হস্ত দু'টি শূন্যে প্রসারণ করিতেছে, তাহার সুগোল পদদ্বয় তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, ভাবিও না তাহার এ উদ্যম বৃথা নষ্ট করিবার জন্য। শিশু ঠিক বুঝিতে পারে না সে কি করিতেছে কিন্তু একটা উৎসাহ একটা শারীরিক অভাব তাহার দেহের মধ্যে শিরায় উপশিরায় কর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। আমরা যাহা কিছু করি সকলেরই মূলে একটা উদ্দেশ্য আছে, আমরা যে পথেই ভ্রমণ করি সেই পথের সীমায় একটা গন্তব্য স্থান আছে। তাহা না থাকিলে আমরা সে পথে যাইতাম না, তাহা না থাকিলে উদ্দেশ্যহীন হইয়া মিছামিছি ঘুরিয়া মরিতাম না।

জীবনে জটিল পথে আমরা অহঃরহ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া বেড়াইলেও সব সময় ঠিক মুখ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই কাজ করিনা। ছোট ছোট অনেক গুলি গৌণ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া, ছোট ছোট অশেষ প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে আমরা প্রধান সিদ্ধিকে লাভ করিতে সক্ষম হই। মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত; আমরা যে একটা কর্ত্তব্য সাধন করিতে

গিয়া কতগুলি নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া যাই তাহার ইয়ত্তা করা বড়ই দুরূহ। সুন্দর সুনীল নিদাঘ গগনে অস্তাচল চূড়াবলম্বী দিবাকরের সিন্দূর প্রভা দেখিয়া সহাস্য বদনে একটা কর্ত্তব্য সাধিত করিতে বাহির হইবার সময় কে নিশ্চিত বলিতে পারে পথিমধ্যে প্রবল বারিধারার উপদ্রব হইবে, ভীতিপ্রদ কর্কশনিনাদী ক্ষণপ্রভার প্রবাহ হইতে আপনাকে রক্ষা করা একটা বৃহৎ কর্ত্তব্য হইয়া উঠিবে। তখন পুরাণ উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নূতন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরীর ও মনের যতটুকু তেজ আছে সবটুকু কেন্দ্রীভূত করিয়া পাগল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। জীবনে এমন নূতন নূতন উদ্দেশ্য ত' প্রত্যহই দৃষ্ট হইতেছে, প্রত্যহই ত' দেখিতে পাই উপস্থিত কর্ত্তব্যের অনুরোধে পড়িয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত একটা মহৎ উদ্দেশ্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাই। তখন গৌণ মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। উপস্থিতই ভবিষ্যতের মহৎ উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়া উঠে।

ঠাকুরমার উপকথার রাজপুত্র যখন আপনার প্রণয়িনী রাজকুমারীর প্রস্তর মূর্ত্তিকে সজীব করিতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় সযত্নে বন্ধ করিয়া রাখিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কর্ণরন্ধ্রে তুলা বাঁধিয়া প্রান্তর মধ্যে প্রণয়িনীর প্রস্তর মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইবার সময় নানা প্রকার অপার্থিব ধ্বনি আসিয়া রাজপুত্রকে কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট করিয়া দিল। আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া তিনি আপনাকে উপস্থিত বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া পশ্চাৎ দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। যেমন পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিলেন অমনি দৈব সম্পাতে রাজপুত্রও প্রস্তরময় হইয়া গেলেন। সে প্রান্তর কেবল প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। একেবারে আপনার গন্তব্য স্থান রাজকুমারীর প্রস্তরমূর্ত্তিতে পৌছিতে না পারিয়া যে মুহূর্ত্তমাত্র পশ্চাতে চাহিয়াছে সেই প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে। শেষে যখন অপর এক রাজপুত্র আসিয়া পশ্চাতের হৃদয়স্তম্ভকারী ভীতিপ্রদ পৈশাচিক নিনাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অমিত সাহসে এক উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে রাজকুমারীর মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া তাহার সেই প্রস্তর দেহকে স্নেহের আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন তখন সেই প্রস্তরদেহ নারীদেহে পরিণত হইল, প্রস্তর আঁখিও স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরিয়া গেল। প্রস্তরময় অধর দুখানি নবনীত সদৃশ নরম হইয়া রাজপুত্রের অধরের মধ্য দিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীরে অনির্ব্বচনীয় সুখের প্রবাহ ছুটাইয়া দিল। এক উদ্দেশে হৃদয়ের সমস্ত বল

নিয়োজিত করিয়া কুমার অমরার অপ্সরাবিনিন্দিত রাজকুমারী লাভ করিলেন।

শিকারীরা বলে, অরণ্যের মধ্যে ভালুকে তাড়া করিলে, কিয়দ্দূর দৌড়াইতে হয় আর এক এক টুকরা বস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। নর শোণিত লোলুপ হিংস্রক নির্ব্বোধ সেই কাপড়ের টুকরার উপরই ক্রোধের বশে আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কাটিয়া ছিঁড়িয়া যখন বুঝিতে পারে সেটা কিছু নয় তাহার উদ্দেশ্য মনুষ্য বধ করা তখন সে আবার মানুষের দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে আবার আর এক টুকরা বস্ত্র পাইয়া পশুবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয় এবং পরিশেষে দেখে মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়িয়া সে তাহার আয়ত্তাধীন শিকারের উপর আয়ত্ত হারাইয়াছে।

আমাদের জীবিতকাল মধ্যে ভীষণ সংগ্রামের বিরোধের ভিতর পড়িয়া আমরাও কি প্রত্যহ এইরূপ উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া নিরাশ হইনা? আর প্রত্যেকের এই নিরাশজনিত দুঃখের সমষ্টি করিলে উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইবার অমঙ্গলের মাত্রাটার একটা পরিমাণ পাওয়া যায়।

যেমন আপনাপন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া আমরা নিত্যই বিপদগ্রস্ত হই, তেমনি অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মোহে পড়িয়া আমরা কত সময় একটা অশুভ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, কত উদ্যম বৃথা নষ্ট করি। যখন সেই উদ্দেশ্যটার দিকে ধাবিত হই তখন বুঝিনা কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পাইব, সুখের সরসীতটে না আসিয়া দুঃখের পঙ্কিল তড়াগে পড়িয়া গিয়া শ্বাসরোধ হইয়া মরিব। মোহের বশে জ্ঞানের অভাবে সামান্য একটা সুখের ক্ষীণ রশ্মি দেখিয়া সেই দিকে তরী ভিড়াই, ঘাটে পৌছিয়া দেখি রশ্মিটা খদ্যোতের, তাহা হইতে দীর্ঘস্থায়ী আলোকের আশা বৃথা; বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধে নিম্নে কেবলি অন্ধকার, কেবলি তামস। যে নাবিকের উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, সে এই অন্ধকারের মাঝে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, আর যাহার উৎসাহ আছে, অধ্যবসায় আছে, সে আপনার ভ্রান্তিটা উপলব্ধি করিয়া আবার অপর আলোকের দিকে নৌকা বাহিয়া লইয়া চলে। যে নির্ব্বোধ হয় তাহার অধ্যবসায় থাকিলেও প্রকৃত আলোকের সন্ধান পায়না, সে কেবলই খদ্যোতের রশ্মিতে আকৃষ্ট হইয়া এঘাট ওঘাট করিয়া ঘুরিয়া মরে, শেষে নিস্তেজ হইয়া তরী বাহিতে অক্ষম হয়, কদাপি গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে না। কিন্তু যাহার জ্ঞান আছে, যাহার অধ্যবসায়

আছে, যাহার চক্ষের তেজ আছে, সে ঠিক বুঝিতে পারে কোন্ ঘাটে যাইলে সুখী হইতে পারিবে, কোন্ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া চলিলে শান্তিময় স্থলে পৌঁছিতে পারিবে।

যখন প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়া এক মনে এক প্রাণে সেই উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান হওয়ার উপর মানুষের সুখ দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, তখন কি প্রত্যেকের পক্ষে জীবনের এক একটা উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লওয়া বিধেয় নয়? কেবল এক একটা উদ্দেশ্য স্থির করিয়া রাখিলে চলিবে না, আমাদের প্রত্যেককে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এক একটা গন্তব্য পথও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই গন্তব্য পথই কর্ত্তব্য পথের নাম ভেদ মাত্র। জীবনে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করায় সেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই সকল কার্য্যই কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে নর জীবনযাত্রার প্রথম হইতেই জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য স্থির করিয়া কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে এবং এই জীবনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও সেই পথ হইতে বিচ্যুত হয় না, সেই ভাগ্যবান পুরুষ-শ্রেষ্ঠই ধন্য। আর সব পথভ্রষ্ট ইতস্ততঃ ধাবমান গড্ডলিকা শ্রেণীভুক্ত মানব ব্রজ কর্ণধার বিহীন তরণীর মত বিশ্বতোয়ধিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, অবশেষে ঝটিকাঘাতে জলমগ্ন হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

বাদসাহী মুদ্রা।

আকবর সাহ।

ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, সাম্রাজ্যের অপরাপর বিভাগের সংস্কারের সহিত মহামতি আকবর সাহ্ টঙ্কশাল সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যকালে নিম্নলিখিত মুদ্রা গুলি প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণ মুদ্রা।

১। সাহান সাহ—ইহার মূল্য ১০০ লাল জিলালি মোহর। এক পৃষ্ঠের মধ্য স্থলে সম্রাটের নাম খোদিত থাকিত এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে নিম্নলিখিত

কথা গুলি লিখিত হইত "অল্‌সুলতানু আলাজামু অলথাকানু অলমাজ্জামু ক্কাল্লাদা তালা মুলকাহ্‌ বা সুলতানাহ জরবু দারউল খলিফাতি আগ্রা।"

অর্থাৎ "মহান্ ভূপতি—যশস্বী সম্রাট—জগদীশ্বর তাঁহার রাজ্য এবং রাজত্ব-কাল সুদীর্ঘকাল ব্যাপী করুন। রাজধানী আগ্রায় খোদিত।"

তাহার বিপরীত দিকে একটি কোরাণের শ্লোক লিখিত হইত। তাহার অর্থ—"ঈশ্বর যাঁহার উপর সন্তুষ্ট হয়েন তাঁহার উপর অজস্রধারে কৃপা বর্ষণ করেন।" ক্রমে এই সব লেখার পরিবর্ত্তে সাহান সাহের এক পৃষ্ঠে কবি ফৈজি বিরচি নিম্নলিখিত কবিতাটি খোদিত হইত—

ভাস্করের জ্যোতি হইতেই সপ্ত সমুদ্র তাহাদের মুক্তারাশি প্রাপ্ত হয়—
তাহারই প্রভায় কৃষ্ণবর্ণ শৈল গুলি রত্ন প্রাপ্ত হয়।
তাহারই করুণ দৃষ্টিতে খনি মধ্যে স্বর্ণের সৃষ্টি হয়—
আবার সেই সুবর্ণ আকবর সাহের নামে মুদ্রিত হইয়া উচ্চতা প্রাপ্ত হয়।*

এই মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে লিখিত ছিল "বিভু সর্ব্বপ্রধান, তাঁহার মহিমা প্রবল।" এবং ইহার চতুর্দ্দিকে লিখিত ছিল—

আশার অলঙ্কার এই মুদ্রা চিরকালব্যাপী মোহর এবং অমর নাম বহন করে
ইহার ইহাই সৌভাগ্যের যথেষ্ট নিদর্শন যে সূর্য্য (ভূপতি) ইহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত ইহাতে তারিখ থাকিত।

২। বহস—এ স্বর্ণ মুদ্রাটির মূল্য সাহান সাহের অর্দ্ধেক। ইহা চক্রাকার এবং চতুষ্কোণ উভয় আকারেরই নির্ম্মিত হইত। ইহার একদিকে সাহানসাহের শ্লোকটি থাকিত, অপর পৃষ্ঠে ফৈজির নিম্নলিখিত শ্লোকটি অঙ্কিত হইত।

রাজকোষের প্রচলিত মুদ্রা
সৌভাগ্যের তারকাকে সঙ্গে লইয়া ফেরে
হে দিবাকর ইহাকে বর্দ্ধিত কর
কারণ চিরকাল ইহা আকবরের নামাঙ্কন দ্বারা উন্নত।

৩। আত্মা—সাহানসাহের এক চতুর্থাংশ, গোল এবং চৌকা দুই

---

* ক্ষোরশেদ কি হফ্‌ত বহার আজু গৌহর য়াফ্‌ৎ।
সঙ্গই সিয়াহ আজ পরতুই আন্ যৌহর য়াফ্‌ৎ।
কান্ আজ নজরি তরবিয়াৎ আউ জর্ য়াফ্‌ৎ।
ওয়ান্ জর্ শরফ্‌ আজ সিকাহই সাহ আকবর্ য়াফ্‌ৎ।

প্রকারেরই হইত। কতকগুলিতে সাহানসাহের শ্লোক থাকিত, কতকগুলির এক পৃষ্ঠে ফৈজী লিখিত নিম্নরূপ শ্লোকটি সন্নিবেশিত হইত।

এই মুদ্রাটি ভাগ্যবানের হস্ত ভূষিত করুক নব আকাশ এবং সপ্ততারকার ইহা ভূষণ হউক ইহা স্বর্ণমুদ্রা ইহা সুফল প্রসূ হউক, সাহ আকবরের নামে ইহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রচলিত হউক।

(৪) বিনসৎ—আত্মার আকারের মুদ্রা। ইহা সাহান সাহের এক পঞ্চমাংশ মূল্যের। ইহা ব্যতীত সাহানসাহের অষ্টম, দশম, বিংশ ও পঞ্চবিংশ ভাগের বিনসৎ মুদ্রিত হইত।

(৫) জগুল বা চগুল—চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মুদ্রা সাহানসাহের ৫১/২ অংশ।

(৬) গীর্দ—২ মোহর মূল্যের। ইহার এক পার্শ্বে "আল্লাহো আকবর" এবং অপর পৃষ্ঠে "হে রক্ষা কর্ত্তা" (য়া মা'য়িনু) লিখিত হইত।

(৭) আফ্তাবী—চক্রাকার। মূল্য ১২৲ টাকা, এক দিকে তারিখ ও টাঁকশালের ঠিকানা এবং অপর পৃষ্ঠে লেখা হইত—"আল্লাহো আকবর জল্লা জল্লালুহু" "বিভু সর্ব্বপ্রধান তাঁহার মহিমা প্রবল।"

(৮) ইলাহী—আকার ও মূল্যে ঠিক আফ্তাবীর মত।

(৯) লাল জিলালী—ইলাহীর মূল্যের চতুষ্কোণ মুদ্রা।

(১০) আদল্ গুৎকা—৯৲ টাকা মূল্য।

(১১) মোহর—৯৲ টাকা মূল্যের গোল মুদ্রা।

(১২) মেহেরাবী—ঠিক মোহরের মত আকার ও মূল্য।

(১৩) মোইনী—লাল জিলালীর সমান মূল্যের চক্রাকার এবং চৌকা মুদ্রা।

(১৪) চাহারগোলা—আফ্তাবীর সমাকৃতি।

(১৫) গিরূদ—ইলাহির অর্দ্ধমূল্য।

(১৬) দেহন—লাল জিলালির অর্দ্ধ মূল্য।

(১৭) শলিমী—আদল্ গুট্কার অর্দ্ধ মূল্য।

(১৮) রবি—আফ্তাবীর এক চতুর্থাংশ।

(১৯) মন—জিলালির চতুর্থাংশ।

(২০) নস্ফি সলিমী—আদল্ গুট্ফার এক পঞ্চমাংশ।

(২১) পঞ্জ—ইলাহির এক পঞ্চমাংশ।

(২২) পাণ্ডাউ—জিলালির পঞ্চমাংশ।

(২৩) শমূনী বা অষ্ট সিধা—ইলাহির এক অষ্টমাংশ।

(২৪) কলা—ইলাহির এক অংমাংশ।

(২৫) জরাহ—ইলাহির এক দ্বাত্রিংশৎ ভাগ।

উপরোক্ত ২৫ দফা স্বুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে সাধারণতঃ কেবল জিলালি মোহর, দেহন এবং মন প্রচলিত হইত। অপর মুদ্রাগুলি বিশেষ আজ্ঞা ব্যতিরেকে নির্ম্মিত হইত না।

রৌপ্য মুদ্রা।

(১) রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রূপিয়া—ইহা সের সাহের রাজত্ব কালে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহার এক দিকে লিখিত হইত।

(আল্লাহো আকবর জল্লা জল্লালুহ) এবং অপর পৃষ্ঠে তারিখ থাকিত।

(২) জলালী—চৌকাকৃতি। আকবর সাহের সময় প্রথম মুদ্রিত হয়।

(৩) দুরব—জলালার অর্দ্ধেক।

(৪) চরণ—জলালার এক চতুর্থ।

(৫) পণ্ডাউ—জলালার এক পঞ্চম।

(৬) অষ্ট—জলালার এক অষ্টম।

(৭) দশা—জলালার এক দশম।

(৮) কলা—জলালার এক ষষ্ঠ।

(৯) সুকী—জলালার একবিংশ।

তাম্র মুদ্রা।

(১) দাম—৪০ দামে এক রূপেয়া।

(২) আধেলা—দামের অর্দ্ধেক।

(৩) পালাহ—দামের এক চতুর্থ।

(৪) দামরী—দামের এক অষ্টম।

উপরোক্ত মুদ্রা গুলির পরিচয় দিয়া অমূল্য গ্রন্থ আইনে আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল দিনার ও দরহাম নামক দুইটি পারস্য মুদ্রার পরিচয় দিয়াছেন। বুঝা যায় সমগ্র মোসলেম জগতে ঐ দুইটি মুদ্রার প্রচলন ছিল। বণিকদিগের দ্বারাই সে গুলি দেশ বিদেশে প্রচলিত হইত।

মহামতি সম্রাটকুলকীরিট আকবর সাহের সময় ঐ সকল মুদ্রা এবং পুর্ব্বতন সম্রাটদিগের দ্বারা প্রচলিত দীনার ও দরহামের জাল প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে ঐ সকল মুদ্রার চিহ্নও

থাকিবে না। এই আজ্ঞা পালনের জন্য কলিজ খাঁ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার জন্য কত লোকের অর্থ দণ্ড হইল, কত লোক তিরস্কৃত হইল এবং শেষে কত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবধি হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রা জাল বন্ধ হইল না, শেষে দেওয়ান কাফী এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন।*

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

নক্সা।

(১)

ভরণীকুমার কোন এক ধনীর জামাতা। তাঁহার পিতৃকুলে আপনার বলিবার বড় একটা কেহ ছিল না। তাই বিবাহের পর হইতেই তিনি শ্বশুর গৃহেই থাকিতেন। আর শ্বশুরেরও এক কন্যা ব্যতীত দ্বিতীয় সন্তানাদি ছিল না। সেই জন্য ভরণীকুমারকে 'ঘরজামাই' রাখিয়াছিলেন।

ভরণীকুমার উপর্য্যুপরি তিন বার এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল হইয়া অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস,—একালে ভদ্র সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে এম, এ কিম্বা বি, এল, পাশ হওয়া চাই। কিছু না হউক, নিতান্ত পক্ষে "গ্র্যাজুয়েট-ফাঁস" গলায় না পরিলে,—'কৃতবিদ্য' হওয়া একেবারে অসম্ভব।

সেই জন্য, ভরণীকুমার পড়া ছাড়িলেও তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে ছাড়িলেন না। 'অধমতারণ' ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতে পাঠাইলেন।

কয়েক বৎসর পরেই ভরণীকুমার ব্যারিষ্টার সাহেব হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাম হইল—B. C. Chatterjee, Bar-at-law. নাম পরিবর্ত্তনে অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় কিনা,—এ সংবাদ রাখি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, ঐ 'ব্যারিষ্টারী চাপরাশ' বুকে থাকিলে আদালতে প্রবেশ অধিকার পাওয়া যায় এবং ভরণীকুমারও সে অধিকার লাভ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। শ্বশুরের অন্ন ধ্বংসাইয়া তাঁহারই পয়সায়

---

* (তারিখে বাদাউনী।)

দুই বেলা ট্রামে চড়িয়া 'স্ফীত কণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে' হাইকোর্টে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

(২)

কিন্তু হায়! তৃপ্তি কোথায়? ভরণীকুমারের বাল্যকাল হইতে সাধ যে দেশের একটা মান্যগণ্য সর্ব্বপরিচিত লোক হইবে, তাহা কোথায়? অবশিষ্ট জীবনটা কি তবে এইরূপে শুধু হাইকোর্টে যাতায়াত করিয়াই সমাপ্ত করিতে হইবে? যদিও আদালতে কিছু করিতে পারিলেন না তথাপি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস,—তিনি জ্ঞানের প্রস্রবণ, বাগ্মীতার মনুমেণ্ট,বুদ্ধি বিবেচনার খনি,—এ হেন বুদ্ধি কি একেবারে বেকার থাকিয়া যাইবে? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ভরণী-কুমারের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলেন,—কোন্ পথ অনুসরণ করা 'আশু ফলপ্রদ' হইবে—চট্ করিয়া একটা 'নামজাদা' লোক হইব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন লেখক হইব।

বঙ্গীয়-সারস্বত-কুঞ্জের দ্বার অবারিত। বেওয়ারিশ ভাষায় সকলেই স্বীয় প্রতিভায় এক একটি অদ্ভুত সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যস্ত। কোন কোন লেখক এ ক্ষেত্রে লীলা করিতে করিতে চষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন। ছাপাইবার পয়সা থাকিলে লেখক হইবার এমন সুবিধার স্থান আর কোথাও নাই। বিশেষ, যিনি কমলার প্রিয়পাত্র—তিনি লেখক হইলেই যে 'মহারথী' হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ আধুনিক সমালোচনা 'সেলসার্টি-ফিকেট' কিম্বা 'বেতালা স্তব স্তুতির' নামান্তর মাত্র! কিন্তু ভরণীকুমার সাহিত্য জগতের কোন্ ক্ষেত্রে 'বিচরণ' করিবেন, সহসা তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। উপন্যাস-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে তাঁহার আদৌ সাহসে কুলাইল না। কারণ, কল্পনায় এমন কোন 'প্লট্' খুঁজিয়া পাইলেন না, যাহা এ ক্ষেত্রে নাই। এ ক্ষেত্র উচ্চদরের গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া "ডাকাত চুরি""হত্যায় খুন"প্রভৃতি নভেলে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

আর নাট্যক্ষেত্রও তথৈবচ। এ দেশে নাটকের ব্যুৎপত্তিই হচ্চে—'ন নাস্তি আটকো যস্মিন্'—যাহাতে কিছুই আটক নাই। এখানে রঙ্গালয়ের অভিনেতা হইতে আরম্ভ করিয়া "খোকার বাবা" পর্য্যন্ত সকলেই নাট্যকার;—নাটক পড়িবে কে? তবে সুবিধার মধ্যে এই, যে দুই একজন অভিনেতার নাটক প্রকৃত নাটক হইলেও 'আলোকপ্রাপ্ত সভ্যসমাজে' উহা পঠিত হয় না। কারণ তাঁহারা "অশ্লীল স্ত্রীলোকদের" সহিত অভিনয় করিয়া থাকেন। সুতরাং

তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের নাটকাদি যে অশ্লীল—তাহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ। এ হেন সুবিধা সত্ত্বেও ভরণীকুমার নাট্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে সাহসী হইলেন না। ভয় পাইলেন, পাছে তাঁহার নাটক 'অশ্লীল লোকদিগের' দ্বারা অভিনীত হইয়া অশ্লীল হইয়া যায়!

ভরণীকুমার—এইবার ছল্ ছল্ নেত্রে একবার কবিতা-কুঞ্জ নিরীক্ষণ করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে চেয়ার হইতে উল্টাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। মাটীতে পড়িয়া পড়িয়াই দেখিতে লাগিলেন,—অসংখ্য অসংখ্য অজাতশশ্রু, দুগ্ধপোষ্য নাবালক কবি এই কুঞ্জে অহঃরহ বিচরণ করিতেছে। শুধু বিচরণ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে। তাহার উপর লম্বা লম্বা চুল, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কবিতায় 'কি জানি কাহার জন্য' হাহাকার করিতেছে!

এইবার ভরণীকুমারের ছল্ ছল্ নয়নদ্বয় আরও ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। কিন্তু হুকুমে চক্ষের জল ফিরাইলেন। কোমর বাঁধিয়া লাফ্ দিয়া আবার চেয়ারে বসিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"যে দেশে ইংরাজী বিজ্ঞাপন হইতে অনুবাদ করিলেই গবেষণা হয়, সেখানে আবার লেখক হইবার ভাবনা কি? কিছু না পারি, গবেষণা করিব, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হইব।" এই সাহসে বুক বাঁধিয়া ভরণীকুমার মাতৃভাষার 'গৌরব বৃদ্ধি' করিবার জন্য সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন। একজন ব্যারিষ্টারকে মাতৃভাষা লিখিতে দেখিয়া চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। তাহার উপর আবার ভরণীকুমার একদিন দেশীয় কাগজওয়ালাদের একটা বড় রকম ভোজ দিলেন। ভোজের দিন কয়েক পরেই কোন এক দেশীয় কাগজের স্তম্ভে প্রকাশিত হইল:—

'ভারতের সৌভাগ্য ক্রমে ভরণীবাবুর মত লোক মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার মত হৃষ্টপুষ্ট লেখক শীঘ্রই যে একটা প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর রথী হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যিনি সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে আসিয়া এরূপে ভোজ দ্বারা অপরের উদর পূর্ণ করিতে পারেন, তিনি যে মহাপুরুষ, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিব।'

(৩)

খ্যাতিলুব্ধ ভরণীকুমার যখন এইরূপ অতৃপ্ত মনে সাহিত্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে 'স্বদেশী'র বিজয়শঙ্খ মেঘ মন্দ্রে বাঙ্গালার মন্দিরে

মন্দিরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভরণীকুমারের হাত হইতে অমনি কলম খসিল। সহসা তিনি খুব বড় রকম একটা স্বদেশহিতৈষী হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,—"নাম কিনিবার এইত মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। চেষ্টা করিলে, এমন কি নেতা পর্য্যন্ত হইতে পারা যায়।" এই ভাবিয়া তিনি পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, এমন কি রান্নাঘরে ইংরাজকে গালি দিয়া 'ওজস্বিনী ভাষায়' বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায়! শ্রোতা কই? এখানে যে সকলেই বক্তা! পাঠশালার বালক হইতে গরিব কেরাণী বেচারি পর্য্যন্ত সকলেই বক্তা;—বক্তৃতা তবে শুনিবে কে? তখন ভরণীকুমার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নিজেকে 'বড়' করিতে হইলে বড়কে গালি দেওয়া ব্যতীত গতি নাই। বিশেষ, যে দেশে ছোট বড় বিচার নাই—ছোট বড়কে গালি দিয়া থাকে, বড় ছোটকে গালি দিয়া থাকে,সে দেশের সনাতন প্রথা ব্যতিক্রম করিয়া তিনি নিজের "স্বদেশহিতৈষী" নাম কলঙ্কিত করিতে চাহিলেন না। দেশাচার পালন করা কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া তিনি দেশের নেতাদের গালি দিয়া লোক জমাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, এ পথ আশাপ্রদ। রীতিমত গালি দিতে পারিলে, তাঁহার নেতৃত্বপদ অবশ্যম্ভাবী। এদিকে তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া দেশের লোক চমৎকৃত হইল!

(৪)

দেখিতে দেখিতে ৩০শে আশ্বিন আসিল। আজ রাখী বন্ধন। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রহিয়াছে। রাজপথে নরমুণ্ডের সমুদ্র। বিশাল জনতার তরঙ্গ প্রতি মুহূর্ত্তেই জন সমুদ্রে মিশিতেছিল। 'বন্দেমাতরম্' অম্বরাগণের উচ্ছ্বাসে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে এক অপরূপ বিচিত্র দৃশ্য! যে দেখিয়াছে সেই ধন্য হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য কখন ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। যুবা বৃদ্ধ ভেদ নাই। সকলেই হাস্যমুখে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া সভামণ্ডপে সমবেত হইতেছিলেন।

এমন সময়ে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা দিল। কতকগুলি ষণ্ডা ছেলে একখানি ভাঙ্গা 'মটর গাড়ী' হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে লাল ফিতা জড়ান। আর চারিদিকে মস্ত মস্ত নিশান। গাড়ীর সর্ব্বত্রই 'বয়কট্' ও 'স্বাধীনতা' লেখা রহিয়াছে। তাহারা ভরণীকুমারের জয়ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ী লইয়া সভার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোট-পেণ্টুলন-পরিহিত ভরণীকুমার একলম্ফে গাড়ী হইতে নামিয়া এক টুলের উপর চড়িয়া বসিলেন। আর কতকগুলি ছোকরা বক্তা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া

গাঁ গাঁ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভরণীকুমারের বাকী চেলাগণ তড়্ তড়্ তালি পিটিতে লাগিল। তালি পিটিতে পিটিতে ভরণীকুমার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। স্বয়ং বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। এবার তালির উপর তালি পড়িতে লাগিল।

এই দেখিয়া জনকয়েক বৃদ্ধ নেতা রাখী হস্তে সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া ভরণীকুমারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ভরণীকুমার মনে মনে বলিলেন,—"তোমাদের দলে আর যাচ্চি না। যে কাজে নাম হবেনা,সে কাজে এ শর্ম্মা যাচ্চেন না—এতে দেশ উদ্ধারই হোক আর উচ্ছন্নই যাক্।" এই ভাবিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের ছুঁইবেন না। আমরা ভারতোদ্ধার ব্রতে ব্রতী। আপনাদের রাখী স্পর্শ করিয়া আমরা নিজেকে কলুষিত করিতে পারিব না।" উত্তরে বুড়োর দল হইতে এক ছোক্‌রা বলিয়া উঠিল,—"আজিকার কার্য্যে কেন উদাসীন হইতেছ? মনে রাখিও, অসংযত কোলাহল—আন্দোলন নহে।" এই কথা শুনিবামাত্র ভরণীকুমার ক্রোধোন্মত্ত হইলেন। স্বীয় শিষ্যবর্গকে ইঙ্গিত করিয়া একলম্ফে সম্মুখস্থিত এক পেয়ারা গাছে উঠিলেন। ইঙ্গিতমাত্রে নরকের কলরবে উক্ত মণ্ডপ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তখন চেয়ারে চেয়ারে, লগুড়ে লগুড়ে, পাদুকায় পাদুকায়, চরমে ও নরমে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষ মিটাইবার জন্য অবশেষে পুলিসকে আসিতে হইল। পুলিসকে আসিতে দেখিয়া ভরণীকুমারের বীর চেলাগণ "মার মার" শব্দে গৃহাভিমুখে ছুটিল। আর এ দিকে পেয়ারা "মহীরুহের" শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিত-ভরণীকুমার-মূর্ত্তি দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে রুমাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে—"মার মার! শত্রু মার।" রুমাল ঘুরিতেছে, পেছনের চুল নাই, সম্মুখের চুল বায়ুভরে কাঁপিতেছে—পদভরে যুগলশাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, কোট্ পেণ্টুলান-পরিহিত-দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন লাঙ্গুলবিহীন রামানুচর কদলী দেখিয়া নৃত্য করিতেছে। ভরণীকুমারের আর বিশ্রাম নাই—কেবল ডাকিতেছে—"মার—শত্রু মার—আমার শত্রু, তোমার শত্রু, তোমার স্ত্রীর শত্রু, ঝি, বামুন, চাকর সকলের শত্রু—মার শত্রু মার।" এমন সময়ে ইনেস্পেক্টর সঙ্গে পুলিশ সার্জ্জন সদল বলে বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দেখিয়া ভরণীকুমার ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলেন।

বলিলেন—"আমায় ধরিওনা। এখনও আমার মূর্চ্ছা যাওয়া হয় নাই। মূর্চ্ছা যাইতে দাও।" বীরশ্রেষ্ঠ ভরণীকুমার মূর্চ্ছা যাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন কি না জানিনা। তবে এই পর্য্যন্ত জানি, যে পরদিন 'সিদিশান' অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। এইরূপে সেদিন স্বাধীনতা সমর অবসান হইল।

(৫)

পরদিন মোকর্দ্দমা। ভরণীকুমার বিচারপতির সম্মুখে আনীত হইলেন। বিচারপতি তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমার অপরাধের কথা শুনিয়াছ?" প্রত্যুত্তরে ভরণীকুমার বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু, তামাসা করিতে গিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা মার্জ্জনা করুন প্রভো! আমি যে আপনাদের দাসানুদাস।"

উঃ।—আমাদের দাসানুদাস ভরণী, যাবৎ দিন আমাদের পদসেবা করিবে। তেমন সময়ে সে বক্তৃতা দিতে যায় না। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভরণী!

ভরণী।—তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি, এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

উঃ।—এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন ব্যারিষ্টার। কিন্তু তোমাদের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? আমরা তোমাদের লাথি মারিব, তোমরা হজম করিবে। তোমরা গালি দিবে, আমরা সহ্য করিব—এ সম্বন্ধ নহে।

এইবার ভরণীকুমার জোড়হাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"কেন? আমি তোমাদের আশ্রিত, প্রতিপালিত,—তোমাদের দাসানুদাস—তোমাদের কথার ভিখারী—তোমাদের খেলিবার পুতুল—ক্ষমা করিবে না কেন?" এই বলিয়া বিচারপতির চরণদ্বয় ধরিয়া ভরণীকুমার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিচারকর্ত্তার দয়া হইল। ভরণীকুমার 'সসম্মান' মুক্তি লাভ করিলেন। ইণ্ডিয়ান নেশানে ভরণীকুমারের 'এই নৈতিক সাহসে'র জয় জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু দেশীয় কাগজ ছাড়িল না। তাহারা সুর ধরিল,—

"তখনই ত বলেছি রাই,
কালো জলে যাস্‌নে রাই—
এখন কাঁদ্‌লে কি হবে রাই
বিনিগুণ পরখিয়ে।"

সত্য সত্যই দেশের কাজ দো-অাঁশলাই হয় না। আধা বাঙ্গালী—আধা ফিরিঙ্গী খাঁটি কাজ করিতে পারে না। তাই "সন্ধ্যা" গাহিল ;—

"তোরা বল গিয়ে নগরে,
ডুবেছে বাবু ফিরিঙ্গী চেলা
গোরা-কলঙ্ক-সাগরে।"

এতদ্ভিন্ন দুই একখানা গম্ভীর প্রকৃতির কাগজও এই উপলক্ষে একটু টীকা টিপ্পনী কাটিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ নাকি তার-স্বরে মেয়েলী শাস্ত্রের "সেই ত মল খসালি—তবে কেন লোকহাসলি।" —প্রবচনটী আওড়াইয়াছিলেন।

(৬)

ভূতপূর্ব্ব লেখক ও নেতা বর্ত্তমান রাজভক্ত ভরণীকুমারকে এইরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতে দেখিয়া গভর্ণমেন্টের দয়া হইল। তাঁহার জন্য অমনি 'মোয়া' প্রস্তুত হইল। ভরণীকুমার 'অনাহারী' ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। এইখানে ভরণীকুমার সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল খেলিয়াছিল। একদিন তাঁহার এজলাসে একটি মোকর্দ্দমা উঠিল যে এক ফিরিঙ্গীর পদাঘাতে এক কালা আদমীর মাথার খুলি ফাটিয়া যাওয়ায় তাহাকে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইয়াছে। ভরণীকুমারের বিচারে স্থির হইল,—লোক্‌টার মাথাটা 'ঘুণে' ধরা ছিল। সুতরাং অমন বিপদ-জনক লোকের মৃত্যুসত্বেও দুইমাস সশ্রম কারাবাস হওয়া উচিত। সাহেব নিরপরাধী।"

রায় বাহির হইতে না হইতেই ভূতপূর্ব্ব তেজস্বী ভরণীকুমার 'রায় বাহাদুর' হইয়া গেলেন।

পাঠক, তোমরা মুচিরাম গুড়কে 'রাজা বাহাদুর' হইতে দেখিয়া এক দিন হরি হরি বলিয়াছিলে। আজ এই ভরণামুচিকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইতে দেখিয়া তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।



রামায়ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কথিত আছে বাল্মীকি প্রথম অবস্থায় চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। ইহা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা জেলায় একটী রমণীয় স্থান—যমুনার দক্ষিণ তট হইতে বড় অধিক নহে। এস্থলে বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি দেবালয় আছে এবং ইহা উহাদের একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া সময়ে সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক যাত্রী এখানে দেবদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষাবস্থায় তিনি গঙ্গোপকুলোপবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। ইহা কানপুর হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই জন্য ইহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। এখানে বাল্মীকেশ্বর বলিয়া এক মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বাল্মীকি প্রচেতা অর্থাৎ বরুণের পুত্র; সেই জন্য তাঁহার অন্য একটী নাম প্রচেতা। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অক্ষম। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ করিবার অভিপ্রায়ে দেবজাত বলিয়া আপনার পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বাল্মীকি যৌবনাবস্থায় একজন দস্যু ও অত্যন্ত কুকর্ম্ম পরতন্ত্র ছিলেন। সর্ব্বদাই পশু পক্ষী হনন ও চৌর্য্যবৃত্তি তাঁহার অবলম্বন ছিল। এক দিবস সপ্তর্ষিগণকে আক্রমণ করাতে তাঁহারা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত করেন এবং 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু বাল্মীকি 'রাম' এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া 'মরা' 'মরা' বলিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে ঋষিরা তথায় আগমন করিয়া দেখেন যে, বল্মীকের মধ্যে বাল্মীকি অবস্থান করিতেছেন এবং তাহার দিব্য জ্ঞান জাত হইয়াছে। তজ্জন্যই তাহার 'রত্নাকর' নামের পরিবর্ত্তে 'বাল্মীকি' নামকরণ হইয়াছে। একথাটীর সত্যতা নিরূপণ পাঠকের হস্তে, এ বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না।

প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে বাল্মীকি আদিকবি। তিনি যে আদিকবি ছিলেন তাহা নিঃসঙ্কোচ চিত্তে স্বীকার করা যায়। তিনিই কবিতার জন্মদাতা। তৎসম্বন্ধে একটী উপন্যাস আছে। এক দিবস নারদ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করেন, যে বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রবল পরাক্রম মহীপতি কে? নারদঋষি রামকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান রাজা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বন গমন, সীতাহরণ, রাবণ বধ, সীতাউদ্ধার পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন এবং এক্ষণে অযোধ্যার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজা পালন করিতেছেন তাহাও আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। এই সকল কহিয়া নারদঋষি প্রস্থান করিলেন। তদ্দণ্ডে বাল্মীকি স্নানার্থ তমসা * নদীতে গমন করিয়া দেখিলেন এক ব্যাধ কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে বধ করিল অমনি ক্রোধভরে তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনুষ্টুপছন্দেএক কবিতা নির্গত হইল। † এই কবিতা হইতেই সংস্কৃত কবিতার সৃষ্টি হইল। বেদ রামায়ণের পূর্ব্বে লিখিত হইলেও তাহাতে ছন্দবিশিষ্ট কবিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং নিঃসংশয়চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, বাল্মীকি আদিকবি।

রামায়ণে লিখিত আছে যে উপযুক্ত কবিতা বাল্মীকির মুখ হইতে নির্গত হইবা মাত্রই ব্রহ্মা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাল্মীকিকে রামায়ণ প্রকটন করিতে আদেশ করিলেন। বাল্মীকিও ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে রামায়ণ রচনা করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবং বাল্মীকির উপর ব্রহ্মার সহানুভূতি আছে বলিয়া বাল্মীকি দৈবশক্তিধারী দেবানুগৃহীত ও দেবানুকূলিত প্রমাণ হইবে ও তাহাতে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে ও তাহা মহত্ত্ব পরিচায়ক এই কারণে বোধ হয় এই উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

---

* এই নদীকে ইংরাজিতে এক্ষণে টনসি (Tonse) বলে। ইহা বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া রেওয়া মধ্য দিয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

† মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগম শাশ্বতী সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধী কামমোহিতং।

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস।

জীবমাত্রেই আনন্দ চায়—ইহা জীবপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি। অর্থাৎ আনন্দ হইতে জীব জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া জীব আনন্দেই স্থিতি করে, প্রলয়কালে আনন্দের প্রতিই ধাবিত হয় এবং আনন্দেই প্রবেশ করে।" জগতের সর্ব্বত্রই আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। কারণ সকলই ব্রহ্মানন্দ। সুতরাং জীবের যে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই অংশ।

তবে একথা স্বীকার্য্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে আনন্দের তারতম্য আছে। প্রত্যেক জীবই প্রকৃতির তাড়নায় স্বীয় প্রকৃতির মনোমত আনন্দ অন্বেষণ করিতেছে। সেই জন্য, প্রকৃতির ইতর বিশেষ অনুসারে আনন্দের ইতর বিশেষ হইয়াছে। পশুপক্ষীর পক্ষে যাহা আনন্দ—মানবের নিকট তাহা হেয় এবং ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত। কারণ তাহাদের আনন্দ অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ। মনুষ্য যদি পাশব আনন্দেই তাহাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন করে, তাহা হইলে মানবে মর্কটে আর পার্থক্য কোথায়?

মনুষ্য ধর্ম্মে, কর্ম্মে, পাপে, পুণ্যে সকল কার্য্যেই আনন্দ অন্বেষণ করে। আনন্দমাত্রেই রসাত্মক। মানবের এই আনন্দবৃত্তি হইতেই হাস্যরসের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই মনুষ্যের নিজস্ব সম্পত্তি। এই হাস্যরসের অস্তিত্ব, মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাতেও দৃষ্টিগোচর হয় না। যে সুরুচিগ্রস্ত নীতিবীর সেই হাস্যরসটাকে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন, তাঁহার সহিত এ প্রবন্ধের সম্বন্ধ নাই। যে না হাসে, তাহার হৃদয় নাই, তাহার মুখ দেখিলেও পাপ,—তাহাকে নিঃসঙ্কোচে অমানুষ বলা যাইতে পারে। শাম্‌ফোর্ট বলিয়াছেন যে, মানুষের সেই দিনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃথা নষ্ট হয়, যেদিন মানুষ হাসে না। ব্যক্তিমাত্রেই রসিক না হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ বৃত্তির প্রভাবে প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর রসিকতা উপভোগ করিবার ক্ষমতা আছে। আনন্দরস উপভোগের জন্য পূর্ব্বকালে প্রায় অধিকাংশ রাজসভাতেই পারিষদবর্গের মধ্যে একটি দুইটি বাক্য-রসিক দেখা যাইত। এমন কি, আর্য্যসাহিত্যে হাস্যরস না থাকিলে তাৎকালিক আলঙ্কারিকেরা তাহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করিতেন না। সেই জন্য, ভবভূতির নাটক, কালিদাস ও শূদ্রকাদির নাটকের মত সাদরে

গৃহীত হইত না। শুধু আর্য্যসাহিত্য কেন? অধুনাতন প্রায় সকল সাহিত্যেই কোন নাটক নভেল নানা গুণপনা থাকা সত্ত্বেও যদি হাস্যরস হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে খোঁড়া হইয়া থাকিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বলিয়া উপেক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সাহিত্য হইতে হাস্যরসকে বাদ দিলে তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে হয়।

বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরস ত্রিধারায় প্রবাহিত। এই হাস্যরস-জীবনীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাল্যকাল, কৈশোরকাল, এবং যৌবনকাল।

বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত কবির আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়টাকে হাস্যরসের বাল্যকাল বলা যাইতে পারে। সেই সময়ে রঙ্গরস নিতান্ত ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। তাহাকে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিতে হইত। বলিতে কি, যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের গৃহেই সে প্রতিপালিত ও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল। ঝুমুর ও কবিওয়ালাদের ঘরে এখনও ইহার প্রতিপত্তি আছে। তবে ভদ্রসমাজে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এ বিলুপ্ত করিল কে—এখন তাহাই আলোচ্য।

যখন মহাত্মা রামমোহন সমাজ সংগ্রামে ও সাহিত্য সংস্কারে অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া এক বিন্দু বিশ্রাম অন্বেষণ করিতেছিলেন, যে পরিবর্ত্তন সময়ে (Transition periodএ) আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সহসা বিদেশীয় সভ্যতার আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া 'হাবুডুবু' খাইতেছিলেন, সেই সময় হইতেই বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের রীতিমত আমদানী সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু এ আমদানী করিল কে? ভারতচন্দ্রের যুগ হইতে যে স্রোত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, প্রতিভার অবতার রামমোহন যে স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া কাব্য লিখিতে ভীত হইয়াছিলেন—সে স্রোত কোন্ মহাত্মার আবির্ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল? সেই মহাত্মার নাম—ঈশ্বর গুপ্ত। যিনি এই পরাধীন অবসাদগ্রস্ত জাতির একটানা জীবন স্রোতকে আনন্দস্রোতে প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিত মহাত্মাই বটেন! সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রই বঙ্গীয়-পদ্য-সাহিত্যে ব্যঙ্গরসের তুবড়ীতে আগুন ছুটাইলেন। ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষ প্রসূত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, শত্রুতা

করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহারই গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুইজনে একটু হাসিবার জন্য। এক একটী চড়-চাপড় এক একটী বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই। কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে,

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জসী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো ;
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।

* * * *

আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না॥

ইতিমধ্যে বঙ্গীয়গদ্য-সাহিত্যের আসরে একজন হাস্য রসিক অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নাম—প্যারীচাঁদ ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি যেমন রসিক তেমনি ভাবুক। তাঁহার রসিকতা ও ভাবুকতা 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িবে কিন্তু বুঝিতে পারিলে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইবে। যে সময় পদ্যসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত এবং গদ্য সাহিত্যে প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক উত্তাল হাসির তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে আর দুইজন রহস্যপটু লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একজনের নাম—দীনবন্ধু এবং অপর একজনের নাম—কালীপ্রসন্ন সিংহ। ইহাদের দুই জনকেই প্রাগুক্ত লেখকদ্বয়ের অনুকারী শিষ্য বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর রচনা মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং টেকচাঁদের

সহিত হুতোমের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি এই রহস্যপটু লেখক চতুষ্টয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ ছিলনা? ছিল বৈ কি! প্রভেদ এই যে, "ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।" কিন্তু ব্যঙ্গরসে ঈশ্বর গুপ্তের কেহ সমকক্ষ ছিলেন না।

ঈশ্বর গুপ্ত যে রসে রসিক, প্যারিচাঁদও অনেকটা সেই রসে রসিক ছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গরস বিদ্বেষ প্রসূত। এই "নরঘাতিনী রসিকতা" বঙ্গসাহিত্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আমদানী করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা' বিদ্বেষ পরিপূর্ণ। যাহা হউক, মোটের উপর, ইহারা সকলেই একজাতীয় ব্যঙ্গপ্রণেতা ছিলেন। ইঁহাদের ব্যঙ্গ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, "আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এখনকার ব্যঙ্গ-প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র ছিল। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত। আগেকার রসিক লাঠি-য়ালের ন্যায় মোটা লাঠী লইয়া জোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন,তাহার মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখন যে সাহিত্য-সমাজে লাঠীয়াল আর নাই, এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠী ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠীর ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। পূর্ব্বোক্ত লেখক চতুষ্টয় এ জাতীয় লাঠীয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠী, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠীর আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।" তাঁহাদের রসিকতা হয়ত আধুনিক রুচিবাগীশ রসিকমণ্ডলীর নিকট অশ্লীলতাপূর্ণ ছিব্‌লামি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমি সাময়িক লোকের রুচি অনুসারেই ইহার আলোচনা করিতেছি। কারণ আধুনিক রুচির দাঁড়ি পাল্লায় প্রাচীন রুচির ওজন করিলে, লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়। অশ্লীলতা সাময়িক সমাজের ভদ্রনিয়মের ব্যভিচার মাত্র। কে বলিতে পারে, বর্ত্তমানে যে পুস্তক 'সৎগ্রন্থ' বলিয়া পরিচিত, ভবিষ্যতে তাহা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে?

এই সময় বঙ্গসাহিত্যে এক শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। এই শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গ সাহিত্যের হাস্যরস যৌবনে পদার্পণ করিল। এই সময়ে একজন

মহাপুরুষ বুঝিতে পারিলেন যে, "এখন ইংরাজ শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ বেশী।" এই কথা বুঝিতে পারিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের ব্যঙ্গপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে যত্নপর হইলেন। তাঁহার নাম—বঙ্কিমচন্দ্র। রসিকরাজ বঙ্কিমচন্দ্র "ডাক্তারের মত সরু লানসেট্‌খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ্ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দিতেন, কিছু জানিতে পারা যাইত না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যাইত ; দৃষ্টান্ত, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড় এবং লোকরহস্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে ; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।" তাই, রসিকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র, 'চন্দ্রশেখরে' অতি সন্তর্পণে বিষাদের বেড়ায় ঘেরিয়া হাস্য রসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হইতেই বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই রস প্রস্রবণ ক্রমে ক্রমে রঙ্গালয়, সভাসমিতি, সংবাদপত্র, গান ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া তর তর্ বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তদবধি উহা আর থামে নাই। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের এত ছড়াছড়ি হইবার কারণও ছিল। ইহার প্রধান কারণ,—যখন বাঙ্গালী-চরিত্রে সওত্ব অংশটাই সর্ব্বাপেক্ষা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গসমাজ যখন ভণ্ডামীতে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছিল, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালী যখন মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছিল ; সেই সময় জনকয়েক সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্যসেবী সমাজস্রোতে ভাসমান না হইয়া তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজকে বিদ্রূপের কষাঘাতে সুপথে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম —ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র এবং অমৃতলাল। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, সামাজিক ব্যাপারে তর্কযুক্তি অপেক্ষা উপহাসই অধিকতর কার্য্যকরী

হইয়াছে—দৃষ্টান্ত, জুবেনাল, ভলটেয়ার। দ্বিতীয় চার্লসের সময় বিলাতী সমাজের কাপট্য চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল, সেই কাপট্য উদ্‌ঘাটনের জন্য উইচার্লি, কন্‌গ্রিভ প্রভৃতির 'কমিডি' বিরচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। আমাদের সাহিত্যেও সেইরূপ ভণ্ডামির মস্তক চর্ব্বণার্থ উক্ত লেখকত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভণ্ড দেশ-হিতৈষীদের স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ 'ভারতোদ্ধার' সৃষ্টি করিলেন। আর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হিন্দু-গণকে লক্ষ্য করিয়া যোগেন্দ্র চন্দ্র 'মডেল ভগ্নী' এবং ভণ্ড বৈষ্ণবদের লক্ষ্য করিয়া 'নেড়া হরিদাস' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে অমৃত লাল রঙ্গরসের ত্রিবেণী সঙ্গম করিলেন। ইনি সাহিত্য-কুঞ্জে আবির্ভূত হইয়া দুই হস্তে ব্যঙ্গরস ও হাস্যরস সমভাবে ছড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রহসনগুলি পরিহাস-শক্তির যত পরিচয় দিয়াছে, এমন আর অন্য কোন পুস্তক দেয় নাই। এ ক্ষেত্র—তাঁহার সাম্রাজ্য। এখানে তিনি সম্রাট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হাস্যরসাবতার অমৃতলালের নিদারুণ অঙ্কুশ আমাদের দেশের অনেক ভণ্ডের স্থূলচর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের পাংশুল চিত্ত বিকল ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যের এই শুভমুহূর্ত্তে আর তিনজন রসিক লেখক তিন রকমের হাস্যরস আমদানী করিয়াছেন। প্রথম—দুর্গাচরণ রায়। ইঁহার 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' এক নূতন সৃষ্টি। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পাঠকবর্গকে শুধু হাসাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই সেই সঙ্গে নানা দেশের ইতিহাস ও নানাতত্ত্ব আমাদিগকে জ্ঞাত করাইয়াছে। ইঁহার হাস্যরস বিদ্বেষের শেল নহে—প্রীতির শিক্ষা। দ্বিতীয় লেখক—দ্বিজেন্দ্র লাল। তাঁহার রহস্য গীতও এক নূতন সৃষ্টি। এই সঙ্গীত গুলি চাটনির মত আপাত তরল বোধ হইলেও তাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যের উপাদান আছে। যেমন,—

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব—মোরা চাকর মোরা পর ;
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর ;
মোরা বেটা মোরা পাজী, যা বলিস্ তাই আছি রাজি,
রাজার মেয়ে ওগো প্যারি, যা বলিস্ তাই শোভা পায়।

এইটি পড়িয়া হাস্যের প্রথম চোট সামলাইয়া লইলে শেষে কেমন একটা বিষাদের ভাব জাগিয়া উঠে।

তৃতীয় লেখক—গিরিশচন্দ্র। সেক্সপীয়রের মত একমাত্র ইনিই বঙ্গসাহিত্যে

'ফলষ্টাফ' আমদানী করিয়াছেন। তাহার সাক্ষী—বরুণচাঁদ। বরুণ আপনি হাসে না; অপরকে হাসায়। স্বভাবসিদ্ধ অকপট সুরসিক মানব-চরিত্রের প্রতিকৃতিই বরুণচাঁদ।

উপসংহারে আমার এই বক্তব্য যে, আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রসিক সাহিত্যসেবীদেরই রসালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য এবং সংক্ষেপে তাহাই করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

চন্দ্রাবলী।

আজি মধুময়ী নিশি জ্যোৎস্না আকুলিত,
প্লাবিয়া গিয়াছে বিশ্ব আলোক ধারায়;
নাহি অন্ধকার ঝিল্লি মন্ত্র মুখরিত!
চন্দ্রাবলী এ রজনী বৃথা যে পোহায়!
সজ্জিত নিকুঞ্জ তব এ মধু নিশার,
ফুল্ল বিম্বাধর তব নব নীলাম্বরী,
বঁধুয়া বিহনে ব্যর্থ হবে কি তোমার;
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে লো সুন্দরি?
ভুল আপনায় সখি অনন্ত মিলনে,
ও প্রেম কি যায় কভু বিরহে বিদায়,
উথলিলে নদী সিন্ধু বাঁধে আলিঙ্গনে,
পিয় বঁধু রূপ মধু সরস তৃষায়!
তব কণ্ঠ বনমালে বাঁধা বনমালী,
মর প্রেমে বিশ্বপ্রেম ভুলিলে কি আলি?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।
